স্টিভেন ওয়াইনবার্গ

দি ফার্স্ট থ্রি মিনিটস

সৃষ্টিতাত্ত্বিক গবেষণার সাম্প্রতিক অগ্রগতির বিবরণসহ মহাবিশ্ব সৃষ্টিতত্ত্বের আধুনিক মতবাদ

সম্পাদনা ও অনুবাদ

মোঃ নূর সোলায়মান

”বেশি-বেশি বই পড়ুন

আলোকিত জীবন গড়ুন”

CONVERTED TO PDF

BY

--- RoNy

E-mail: tanvir_ahmad_rony@yahoo.com

(c) **Tanvir Ahmad rony**

Mechanical Engineering , Batch -2004

KUET

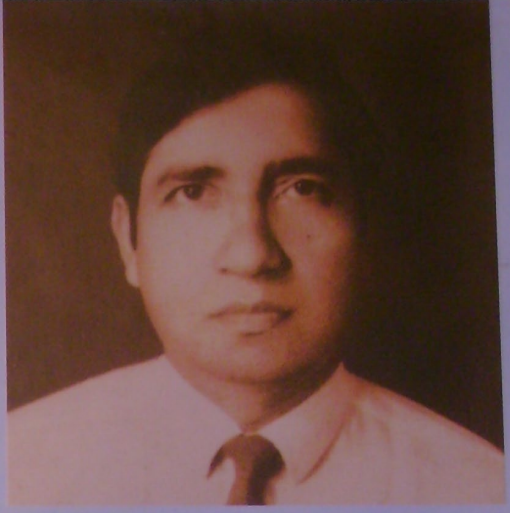

বিজ্ঞানের ছাত্র মোঃ নূর সোলায়মান। কৈশোরে বিজ্ঞানের প্রথম পাঠ থেকে আজ অব্দি তিনি বিজ্ঞানের মনোযোগী পাঠক। তিনি অনুসন্ধিৎসু ও জিজ্ঞাসু। তার অনুসন্ধিৎসু মন তাকে জীবন ও জগতের সৃষ্টির প্রতি আগ্রহী করে। তিনি সন্তরণে লিপ্ত হন সৃষ্টির অপার রহস্য সাগরে। ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি রহস্য নিয়ে প্রণীত অজস্র পুস্তক হয়ে ওঠে তার বিচরণ ক্ষেত্র।

পেশাগত উৎকর্ষতার জন্য প্রকৌশল বিদ্যার বিভিন্ন পুস্তক অধ্যয়নের পাশাপাশি তাকে আকৃষ্ট করে উচ্চতর পদার্থবিদ্যা। পদার্থবিদ্যার পথ ধরেই নভোপদার্থবিদ্যায় হাতে খড়ি। তার একাগ্র ও শ্রমসাধ্য অধ্যয়নের ফসল স্টিভেন ওয়াইনবার্গের 'দি ফার্স্ট থ্রি মিনিটস'-এর ভাষান্তর। তার রয়েছে তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা, লেখক হয়ে ওঠার জন্য যা অত্যন্ত জরুরী। যদিও লেখক হিসেবে নয়, বরং বিজ্ঞানের একজন একাগ্র পাঠক হিসেবে পরিচয় দিতেই তিনি স্বচ্ছন্দ বোধ করেন।

মরহুম আলী এমদাদ মিয়ার পুত্র মোঃ নূর সোলায়মান-এর জন্ম ভোলা জেলার বোরহানউদ্দিনে। ১৯৭৫ সনে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ প্রথম শ্রেণীতে স্নাতক ডিগ্রী লাভ করেন। বর্তমানে একজন পদস্থ সরকারী কর্মকর্তা। দুই কন্যা ও স্ত্রীকে নিয়ে তার পারিবারিক জীবন।

Cover Design : Selim Ahmed

A
Shamabesh Book
Astronomy

B. TK. 225
UK. £ 8.99
US. $ 12
Can. $ 17.99

ISBN 984-8243-09-7
9 791548 920288
1250 >
A Shamabesh Publication

মহাবিশ্বের উদ্ভবের কথা জানতে হলে অবশ্যই গাণিতিক ভাবে তা জানতে হবে অর্থাৎ একটি তাত্ত্বিক মডেলের আলোকে। কারণ, দশ থেকে বিশ বিলিয়ন বছর আগে মহাবিশ্বের উদ্ভবের ঘটনা বর্তমান কালের পর্যবেক্ষণ থেকে জানতে হলে দূর অতীতের সেই ঘটনার ছাপ উদ্ঘাটন করতে হবে পরোক্ষভাবে, পর্যবেক্ষণলব্ধ উপাত্তকে তত্ত্বের আলোকে বিশ্লেষণ করে। মহাবিশ্ব সৃষ্টির যে তত্ত্বটি সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য বলে প্রমাণিত হয়েছে প্রমিত মডেল বা স্ট্যান্ডার্ড মডেলরূপে, সেখানে একটি মহাবিস্ফোরণের মধ্য দিয়ে উদ্ভব ঘটেছে মহাবিশ্বের। ওয়াইনবার্গের 'দি ফার্স্ট থ্রি মিনিটস' বইয়ের ভিত্তি হচ্ছে এই মডেলটি।

স্টিভেন ওয়াইনবার্গ মহাবিস্ফোরণের যে বর্ণনা তুলে ধরেছেন তা বস্তুত শুরু হয়েছে বিস্ফোরণের ০.০১ সেকেন্ডের পর থেকে। তাঁর বইয়ের যে চমকপ্রদ গল্প তা চলেছে বিস্ফোরণের মুহূর্তের পর তিন মিনিট ছেচল্লিশ সেকেন্ড পর্যন্ত। গল্পটি শুরু হয় যখন মহাবিশ্বের তাপমাত্রা ছিল একশ' বিলিয়ন ডিগ্রী কেলভিন এবং সময় ছিল $১০^{-২}$ সেকেন্ড। সেই সময় ইলেকট্রন পজিট্রন যুগল ক্রমাগত সৃষ্টি হচ্ছিল বিকিরণ থেকে এবং এদের বিনাশ ঘটছিল বিকিরণে। তাপমাত্রা যখন ৩০ বিলিয়ন ডিগ্রী কেলভিনে নেমে এলো তখন অবস্থার পরিবর্তন ঘটলো, প্রোটন ও নিউট্রনের অনুপাত গেল বদলে। আমরা এই বইতে দেখব মহাবিশ্বের রূপান্তর সময়ের সঙ্গে অনুপাতিক নয়।

বইটির অনুবাদক একজন প্রকৌশলী। কিন্তু বিজ্ঞানের প্রতি গভীর আগ্রহ ও অনুসন্ধিৎসা বিশেষ করে জ্যোতির্পদার্থবিদ্যার বই পড়ার দীর্ঘ অভিজ্ঞতা তাকে দুঃসাহসী করেছে অনন্যসাধারণ এই বই ভাষান্তরিত করার কাজে। কিন্তু শুধু অনুসন্ধিৎসা ও আকর্ষণই একান্তভাবে কাজ করেনি- এই বইয়ের সার্থক অনুবাদে। দীর্ঘশ্রম, ব্যাপক পাঠাভ্যাস ও নিজেকে প্রস্তুত করার ঐকান্তিকতায় দীর্ঘসময় তিনি ব্যয় করেছেন মূল বইকে যথাযথভাবে বাংলা ভাষার পাঠকদের কাছে তুলে ধরতে। জ্যোতির্পদার্থ বিজ্ঞানে অনুরাগী অসংখ্য যে পাঠক তৈরী হচ্ছে বাংলাদেশে তাদের অনুবাদক একজন যথার্থ প্রতিনিধিও বটে। ফলে বইটি সৌখিন জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের কাছে সুখপাঠ্য হবে।

নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত আমেরিকান
প্রফেসর ও বিজ্ঞানী স্টিভেন ওয়াইনবার্গের

দি ফার্স্ট থ্রি মিনিটস

সৃষ্টিতাত্ত্বিক গবেষণায় সাম্প্রতিক অগ্রগতির বিস্ময়কর মহাবিশ্ব সৃষ্টিরহস্য আধুনিক মতবাদ

ভূমিকা
ড. আলী আসগর

সম্পাদনা ও অনুবাদ
মোঃ নূর সোলায়মান

SHANKALAN
MYMENSINGH

Shamabesh
Dhaka, Bangladesh
2000

প্রথম বাংলা সমাবেশ সংস্করণ জুলাই ২০০০
দি ফার্স্ট থ্রি মিনিটস : স্টিভেন ওয়াইনবার্গ
মূল ইংরেজী থেকে বাংলা অনুবাদ মোঃ নূর সোলায়মান
মূল ইংরেজী সংস্করণ স্বত্ব © স্টিভেন ওয়াইনবার্গ
বাংলা অনুবাদ স্বত্ব © মিসেস আইনুন নাহার
সর্ব স্বত্ব সংরক্ষিত
প্রথম প্রকাশ আন্দ্রে ডাচ্ লিঃ গ্রেট ব্রিটেন ১৯৭৭
পরিবর্ধিত ফ্লামিংগো সংস্করণ ১৯৯৩

প্রকাশক
সমাবেশ
২১, আজিজ মার্কেট (নিচতলা), শাহবাগ, ঢাকা।
ফোন : ৯৬৬২৭৬৬,
ই-মেইল: *pathaksb@ bdonline.com*

প্রচ্ছদ
সেলিম আহমেদ

টাইপ সেটিং
পাঠক সমাবেশ কম্পিউটার

মুদ্রণ
প্রত্যাশা, ঢাকা

এই বইয়ের কোন অংশ প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ছাড়া প্রকাশ করা বা ফটোকপি করা আইনত দন্ডনীয় অপরাধ বলে বিবেচিত হবে।

The First Three Minutes

Copyright © Steven Weinberg
First published in Great Britain
Andre Deutsch Ltd. 1977
Flamingo edition Published 1993,1983
First Bengali Version Published in Bangladesh by Shamabesh 2000
Copyright © Mrs. Aynun Nahar for Bengali Version
All rights reserved.

Shamabesh Book

Published in Bangladesh by Shamabesh.
21, Aziz Market, Ground Floor,
Shahbag, Dhaka- 1000
Phone :880-2-8620717, 9662766
E-mail: pathaksb@ bdonline.com

Bangladesh
ISBN 984-8243-09-7

Printed in Bangladesh by
Prottasha, Dhaka
Type Set : Pathak Shamabesh Computer

No part of this book may be reprinted, photographed , photocopied, recorded or reproduced in any form without the written consent of the publisher

This book is sold subject to the condition that it shall not, by way of trade or otherwise, be lent, resold, hired out, or otherwise circulated without publisher's prior consent in any form of binding or cover other than that in which it is published and without a similar condition including this condition being imposed on the subsequent purchaser.

মূল ইংরেজী ফ্রামিংগো ১৯৯৩ সংস্করণ- এর প্রচ্ছদ

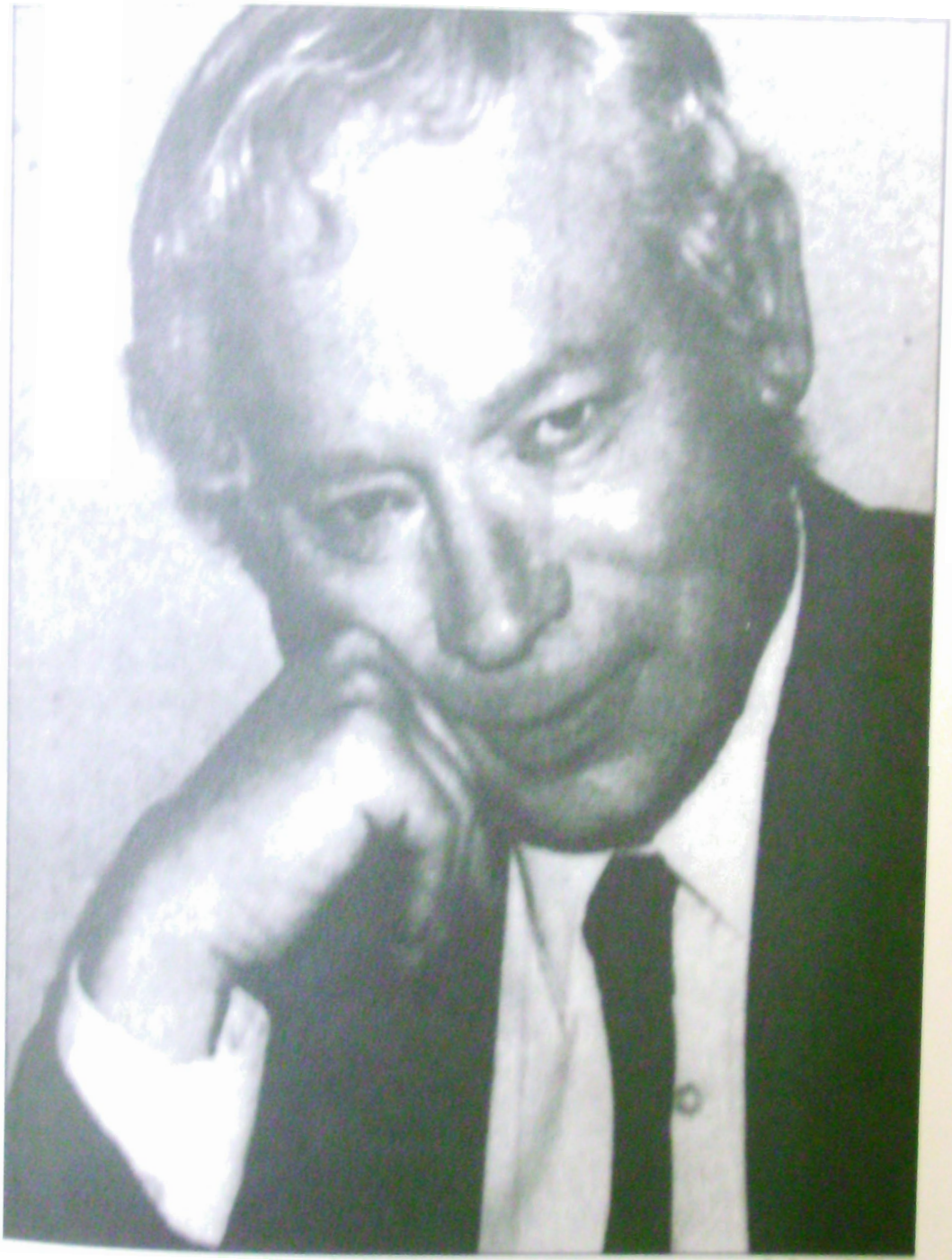

সূচীপত্র

১।	ভূমিকা	১১
২।	সম্পাদকীয়	১৬
৩।	প্রস্তাবনা	২৪
৪।	প্রারম্ভিকা: দৈত্য ও গাভী	২৮
৫।	মহাবিশ্বের প্রসারণ	২৪
৬।	মহাজাগতিক মাইক্রোওয়েভ পটভূমি বিকিরণ	৬১
৭।	একটি উত্তপ্ত মহাবিশ্বের উপাদানের তালিকা	৮৪
৮।	প্রথম তিন মিনিট	১০১
৯।	একটি ঐতিহাসিক বাঁক	১১৬
১০।	প্রথম সেকেন্ডের শতাংশ সময়ের ঘটনাবলী	১২৪
১১।	শেষ সংলাপ: আগামী দিনের সম্ভাবনা	১৩৭
১২।	সৃষ্টিতত্ত্বের অগ্রগতি: ১৯৭৭ সালের পর	১৪২
১৩।	শব্দকোষ	১৬০

অগাস্ট কমটি প্রায় দেড়শ বছর আগে মানবসভ্যতার কালিক রূপান্তরকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করেছিলেন। প্রথমটিকে তিনি বলেছেন ধর্মের যুগ, এর পরেরটি দর্শনের যুগ এবং সর্বশেষটি হলো ধনাত্মক জ্ঞান বা বিজ্ঞানের যুগ। যৌক্তিক দৃষ্টবাদের প্রবক্তা ও বিজ্ঞানে প্রগাঢ় বিশ্বাসী এই বিজ্ঞান দার্শনিক সমগ্র মানব সভ্যতাকে যেভাবে স্তরবিন্যাস করেছেন এর বিকাশের ধারায়, তা হয়তো অতিরঞ্জন মনে হতে পারে। কিন্তু তাঁর এই উক্তি মহাবিশ্বের সৃষ্টিতত্ত্বের ক্রমবিকাশ সম্পর্কে নিঃসন্দেহে প্রযোজ্য।

মহাবিশ্বের উদ্ভবের রহস্যোদ্ঘাটন ও এর প্রকৃতিকে জানার যে পন্থ তা যেমন রোমাঞ্চকর তেমনি গভীর ও জটিল। প্রাচীনতম কালেও মেঘমুক্ত রাতের নক্ষত্র ভরা আকাশের শোভা দেখে নিশ্চয়ই তখনকার মানুষ বিস্ময় প্রকাশ করেছে- কেমন করে সৃষ্টি হল এই বিশ্বজগৎ? কোথা থেকে আমাদের আবির্ভাব ঘটেছে? কিন্তু প্রকৃতি ও বিশ্বজগৎ সম্পর্কে যেকোন প্রশ্নই বিজ্ঞানের প্রশ্ন হয়ে উঠে না, এমনকি দার্শনিক প্রশ্নও, যতদিন না জ্ঞানের বিকাশ, উপলব্ধির বিস্তার, তথ্য ও যুক্তির অগ্রগতি ও বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা নিরীক্ষা ও হিসাব কষার দক্ষতা বিশেষ স্তরে উন্নীত হয়।

মহাবিশ্বের উদ্ভব সম্পর্কে প্রশ্ন উথাপন তাই প্রথম স্তরে ধর্মীয় অনুভূতি ও বিশ্বাসের অংশ ছিল। ভাষার অগ্রগতি, যুক্তিবিদ্যা ও অধিবিদ্যার অগ্রগতি মহাবিশ্বের উদ্ভব সম্পর্কে মানুষের অনুসন্ধিৎসাকে দর্শনের অন্তর্ভুক্ত করার পর্যায়ে নিয়ে আসে। মহাবিশ্ব ও আমাদের উদ্ভব নিয়ে সেই জিজ্ঞাসু দৃষ্টি, বিস্ময় ও অনুসন্ধিৎসা, ধর্মীয় বিশ্বাস ও দার্শনিক ভাবনার স্তর পার হয়ে অনুসন্ধানের দীর্ঘ পথ ধরে অগ্রসর হয়েছে। মহাকাশ হয়ে উঠেছে সেই চিত্রপট, যেখানে মানুষের কল্পনা, বুদ্ধিগত প্রেরণা, জ্ঞানের সাধনা, সৃজনশীলতা, পর্যবেক্ষণের দৃষ্টি, তত্ত্বসৃষ্টির দক্ষতা, খজ্ঞা ও উৎপ্রেক্ষার ছাপ আমরা দেখতে পাই। মহাবিশ্বের যে চিত্র আমরা সম্প্রতি লাভ করেছি সেখানে সম্মেলন ঘটেছে গণিত, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার, সেইসঙ্গে অভিনব সব পর্যবেক্ষণ যন্ত্রের উদ্ভাবন ও প্রযুক্তিগত অগ্রগতির। মহাকাশ পর্যবেক্ষণ, গণিতের প্রয়োগ ও তত্ত্ব সৃষ্টির ভিতর দিয়ে প্রকৃতির নিয়ম আবিষ্কৃত হয়েছে, যার আলোকে আবার পর্যবেক্ষণলব্ধ মহাকাশের নানা ঘটনা যাচাই করা সম্ভব হয়েছে। আমরা তাই দেখতে পাই যে গবেষণাগারের পরীক্ষা ও গাণিতিক তত্ত্বের আলোকে ক্রমাগত শুদ্ধতর ও গভীরতর ভাবে প্রকৃতির নিয়ম যেমন আবিষ্কৃত হয়েছে; আবিষ্কৃত প্রকৃতির নিয়ম ও মহাকাশ পর্যবেক্ষণলব্ধ তথ্য তেমনি দিয়েছে মহাবিশ্ব সম্পর্কে গভীরতর ও বর্দ্ধিত উপলব্ধি, উদ্ভাবিত তত্ত্বের আলোকে।

মহাবিশ্ব সম্পর্কে মানুষের অনুসন্ধিৎসা অতি প্রাচীন হলেও তা ছিল অস্পষ্ট, কল্পনাপ্রসূত ও প্রায়শ ভ্রান্ত। আধুনিক বিজ্ঞানের সূচনা ঘটার পরও দীর্ঘদিন মহাবিশ্বের উদ্ভব নিয়ে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব গ্রহণযোগ্যতা পেতে দীর্ঘ সময় নিয়েছে। মহাবিস্ফোরণের ভিতর দিয়ে মহাবিশ্বের উদ্ভব-এই তত্ত্ব, যাকে আমরা প্রমিত তত্ত্ব বলছি, তা বিশ্বাসযোগ্যতায় নিয়ে যেতে তাত্ত্বিক অগ্রগতি ও পরীক্ষালব্ধ তথ্যের সমন্বয় ঘটাতে হয়েছে বিজ্ঞানীদের। কণিকা ত্বরক যন্ত্রে মৌলিক কণিকার উপরে গবেষণা এদের উদ্ভব ও রূপান্তরের নিয়মগুলো উদ্ঘাটন করেছে। ফলে মহাবিশ্বের প্রাথমিক অবস্থায় কিভাবে বিকিরণ ও মৌলিক কণিকার মধ্যে রূপান্তরের খেলা চলেছে তা তাত্ত্বিকভাবে নির্ধারণ করা সম্ভব হয়েছে। বিভিন্ন তরঙ্গদৈর্ঘ্যের বিকিরণ দূরের নক্ষত্র ও গ্যালাক্সী সম্পর্কে তথ্য দিয়েছে।

গ্যালাক্সীগুলো যে পরস্পর থেকে সরে যাচ্ছে এবং যে গ্যালাক্সী যত দূরে তা তত দ্রুত অপসৃয়মান, এই তথ্যকে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা চমৎকারভাবে ব্যবহার করেছেন। বস্তুত দূরত্বের সঙ্গে অপসৃয়মানতার গতি যে আনুপাতিক এবং তরঙ্গদৈর্ঘ্যের বৃদ্ধি যে অপসৃয়মান গতির আনুপাতিক এই যুক্তির সিঁড়ি বেয়েই পরোক্ষভাবে মহাবিশ্বের বিস্তার জানা সম্ভব হয়েছে। যে আলোক তরঙ্গ দূরতম গ্যালাক্সী থেকে তথ্য বয়ে আছে, ক্লান্ত সেই তরঙ্গের কম্পন হয়ে যাচ্ছে কম। এই তরঙ্গ যতদূরের গ্যালাক্সী থেকে আসছে তত দূর অতীতের তথ্য বয়ে আনছে। অর্থাৎ আমরা এই মুহূর্তে দূরের গ্যালাক্সীতে কি ঘটছে তা জানতে পারছিনা, বরং অতীতে কি ঘটেছে সেখানে সেই খবরই শুধু উদ্ঘাটন করতে পারছি। ফলে মহাবিশ্বের রহস্য উদ্ঘাটনে স্থান কালের ব্যাপ্তির মধ্যে যে তথ্য লুকানো আছে একমাত্র তাত্ত্বিক মডেল সৃষ্টির মধ্য দিয়েই তা উদ্ধার করা সম্ভব।

'দি ফার্স্ট থ্রি মিনিটস' বইটির মূল লেখক স্টিভেন ওয়াইনবার্গ একজন নোবেল বিজয়ী পদার্থ বিজ্ঞানী, যিনি জনবোধ্য বিজ্ঞানের বই লেখার দূরুহ কাজটিও অসাধারণ সাফল্যের সঙ্গে করে চলেছেন। একজন তদ্‌গত গবেষকের পক্ষে জনপ্রিয় বিজ্ঞানের বইলেখার জন্য সময় খুঁজে পাওয়ার দৃষ্টান্ত দুর্লভ এবং তার চেয়েও দুর্লভ ঘটনা হলো সেই লেখার মধ্যে দিয়ে জনপ্রিয় হয়ে উঠা। ওয়াইনবার্গের মূল গবেষণার বিষয় অতিক্ষুদ্র জগৎ, যেখানে মৌলিক কণিকা ও মৌলিক বলগুলোর রহস্যোদ্ঘাটনে তিনি ব্যাপৃত। মহাবিশ্বের সৃষ্টিতত্ত্ব তাঁর প্রান্তিক গবেষণার বিষয় হলেও এ বিষয়ে তাঁর আকর্ষণ ও সৃজনশীল ভাবনা যে কত গভীর ও সুদূর প্রসারী তার স্বাক্ষর 'দি ফার্স্ট থ্রি মিনিটস' বইটি।

যা বিশাল ও বিপুল, যা সমগ্র বিশ্বকে ধারণ করে, সেখানে মহাকাল ও অনন্তস্থানের মধ্যে সহস্র কোটি গ্যালাক্সী অপসৃয়মান পরস্পর থেকে। এর এক একটিতে রয়েছে নিযুত কোটি নক্ষত্র। সনাতনী পদার্থবিজ্ঞান কখনই এই সমগ্রতা নিয়ে কথা বলে নি। নির্বাচিত বস্তু সম্পর্কে নিয়ন্ত্রিত পরীক্ষার মাধ্যমে ও তত্ত্ব সৃষ্টির ভিতর দিয়ে প্রকৃতির নিয়ম আবিষ্কারের যে পথ তা ধর্মীয় বা দার্শনিক ভাবনার মতন কখনই সমগ্র বিশ্বকে নিয়ে ঘটেনি। আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতার সাধারণ তত্ত্বেই প্রথমবারের মতন সমগ্র মহাবিশ্বকে ধারণ করেছে এর সমীকরণে। ফ্রিডম্যান, ডি সিটার, জর্জ লেমাইতার, জর্জ গ্যামো, এডিংটন, বন্ডি, চন্দ্রশেখর থেকে পরবর্তী সব

জ্যোতির্বিজ্ঞানী, যাঁরা মহাবিশ্ব নিয়ে গবেষণা করেছেন, সবাই আপেক্ষিকতার সাধারণ তত্ত্বের কাঠামোর মধ্যেই বিচরণ করেছেন।

বিগত তিন দশকে সবচেয়ে বিস্ময়কর যে ঘটনা ঘটেছে পদার্থবিজ্ঞানে তা হলো, বিপুল বিশ্ব নিয়ে যে জ্যোতির্পদার্থ বিজ্ঞান এবং অতিক্ষুদ্র কণিকা নিয়ে যে কোয়ান্টাম জগৎ তার মধ্যে সংযোগ ও সমন্বয়। স্টিভেন হকিং এ ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রেখেছেন।

মহাবিশ্বের উদ্ভবের কথা জানতে হলে অবশ্যই গাণিতিকভাবে তা জানতে হবে অর্থাৎ একটি তাত্ত্বিক মডেলের আলোকে। কারণ, দশ থেকে বিশ বিলিয়ন বছর আগে মহাবিশ্বের উদ্ভবের ঘটনা বর্তমান কালের পর্যবেক্ষণ থেকে জানতে হলে দূর অতীতের সেই ঘটনার ছাপ উদ্ঘাটন করতে হবে পরোক্ষভাবে, পর্যবেক্ষণলব্ধ উপাত্তকে তত্ত্বের আলোকে বিশ্লেষণ করে। মহাবিশ্ব সৃষ্টির যে তত্ত্বটি সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য বলে প্রমাণিত হয়েছে প্রমিত মডেল বা ষ্ট্যান্ডার্ড মডেলরূপে, সেখানে একটি মহাবিস্ফোরণের মধ্য দিয়ে উদ্ভব ঘটেছে মহাবিশ্বের। ওয়াইনবার্গের 'দি ফার্স্ট থ্রি মিনিটস' বইয়ের মূল ভিত্তি হচ্ছে এই মডেলটি।

প্রমিত এই মডেল পরমভাবে সঠিক কিনা তা প্রমাণ করার কোনো পথ নেই, তবে গ্রহণযোগ্যতার বিচারে এটিই শ্রেষ্ঠ। বস্তুত কোনো বৈজ্ঞানিক তত্ত্বই চিরন্তনতা বা অপরিবর্তনীয় নিশ্চয়তা দেয় না। কিন্তু যা আকর্ষণীয় এই প্রমিত মডেল সম্পর্কে তা হলো, ভবিষ্যতের কোন বিকল্প তত্ত্ব যদি প্রতিযোগী হয়ে উঠে এই মডেলের, তা হলেও তা যাচাই হতে হবে প্রমিত মডেলের প্রেক্ষিতে।

স্টিভেন ওয়াইনবার্গ মহাবিস্ফোরণের যে বর্ণনা তুলে ধরেছেন তা বস্তুত শুরু হয়েছে বিস্ফোরণের ০.০১ সেকেন্ডের পর থেকে। এর কারণ এর আগের যে সম্ভাব্য ঘটনা প্রবাহ তার কিছু উল্লেখ থাকলেও বস্তুত সেই অতিঘনীভূত দশার নিয়মাবলী পরীক্ষালব্ধ ভাবে জানা সম্ভব হয় নি এখনো।

তাঁর বইয়ের যে চমকপ্রদ গল্প তা চলেছে বিস্ফোরণের মুহূর্তের পর তিন মিনিট ছেচল্লিশ সেকেন্ড পর্যন্ত। গল্পটি শুরু হয় যখন মহাবিশ্বের তাপমাত্রা ছিল একশ বিলিয়ন ডিগ্রী কেলভিন এবং সময় ছিল $১০^{-২}$ সেকেন্ড। সেই সময় ইলেকট্রন পজিট্রন যুগল ক্রমাগত সৃষ্টি হচ্ছিল বিকিরণ থেকে এবং এদের বিনাশ ঘটছিল আবার বিকিরণে। তাপমাত্রা যখন ৩০ বিলিয়ন ডিগ্রী কেলভিনে নেমে এলো তখন অবস্থার পরিবর্তন ঘটল, প্রোটন ও নিউট্রনের অনুপাত গেল বদলে। আমরা এই বইতে দেখব মহাবিশ্বের রূপান্তর সময়ের সঙ্গে আনুপাতিক নয়।

ভগ্নাংশের হিসাবে এক বিলিয়ন বছরে এখন মহাবিশ্বের আয়তনের যে সম্প্রসারণ *ঘটবে, সৃষ্টির সূচনা মুহূর্তে সেকেন্ডে তার চেয়ে বেশি সম্প্রসারণ ঘটেছে।* সেই জন্যেই প্রথম তিন মিনিটের মহাবিশ্বে যে সব ঘটনা ঘটেছে তার কাহিনী এত চমকপ্রদ হয়ে ফুটে উঠেছে ওয়াইনবার্গের বর্ননার সূক্ষ্ম ও মৌলিক বৈশিষ্ট্যে।

বইটির অনুবাদক একজন প্রকৌশলী। কিন্তু বিজ্ঞানের প্রতি গভীর আগ্রহ ও অনুসন্ধিৎসা বিশেষ করে জ্যোতির্পদার্থবিদ্যার বই পড়ার দীর্ঘ অভিজ্ঞতা তাকে

দুঃসাহসী করেছে অনন্যসাধারণ এই বই ভাষান্তরিত করার কাজে। কিন্তু শুধু অনুসন্ধিসা ও আকর্ষণই-একান্তভাবে কাজ করেনি এই বইয়ের সার্থক অনুবাদে। দীর্ঘশ্রম, ব্যাপক পাঠাভ্যাস ও নিজেকে প্রস্তুত করার ঐকান্তিকতায় দীর্ঘসময় তিনি ব্যয় করেছেন মূল বইকে যথাযথ ভাবে বাংলাভাষার পাঠকদের কাছে তুলে ধরতে। আমার মনে হয়েছে জ্যোতির্পদার্থ বিজ্ঞানে অনুরাগী অসংখ্য যে পাঠক তৈরি হচ্ছে বাংলাদেশে অনুবাদক তাদের একজন যথার্থ প্রতিনিধিও বটে। ফলে, বইটি সৌখিন জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের কাছে সুখপাঠ্য হবে বলেই আমার ধারণা।

অনুবাদ গ্রন্থের প্রতি যথার্থ আগ্রহের অভাব আমাদের দেশে পরিলক্ষিত হয়। তবে একথা তো ঠিক যে আমাদের সমস্ত অভিব্যক্তিই এক ধরনের অনুবাদ। কোনো বিজ্ঞানী যখন তার আবিষ্কার অথবা তার আবিষ্কৃত নিয়ম বা প্রকৃতির নিয়মকে গাণিতিক ভাষায় বা সূত্রে প্রকাশ করেন, সেখানেও একটি অনুবাদের কাজ চলে। ভাষা মাত্রই আমাদের অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির অনুদিত রূপ, প্রতীক বা চিহ্নে। কোন ভাষার ঐশ্বর্য্য নির্ধারিত সেই ভাষায় কত তথ্য ও জ্ঞান বিধৃত হয়ে আছে তার উপরে।

বিজ্ঞানকে জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দেবার ক্ষেত্রে এবং বিজ্ঞানমনস্কতা ও সচেতনতা সৃষ্টির কাজে জনপ্রিয় বিজ্ঞান বইয়ের গুরুত্ব অপরিসীম। বিখ্যাত বিজ্ঞানীরা ছড়িয়ে আছেন বিভিন্ন দেশে। শুধু তাঁদের মাতৃভাষাই বিভিন্ন এবং তারা বিভিন্ন দেশের অধিবাসী বলেই নয়, যে গাণিতিক ও পারিভাষিক ভাষায় বিজ্ঞানের আবিষ্কারের কথা মৌলিক গ্রন্থে লেখা হয়, তাকে এক ধরনের অনুবাদ করেই মাত্র তা সাধারণ পাঠকের কাছে বোধগম্য করা সম্ভব। অনুবাদ গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা ও অপরিহার্যতা সব ভাষার ক্ষেত্রেই রয়েছে। কারণ কোনো দেশই স্বয়ং সম্পূর্ণ নয়, বিজ্ঞানের সব ক্ষেত্রে আপন ভাষায় মৌলিক গ্রন্থের সংখ্যায়। 'দি ফার্স্ট থ্রি মিনিটস' বইটির অনুবাদ সেই দিক থেকে বাংলা ভাষাকে অন্তত কিছুটা সমৃদ্ধ করবে নিঃসন্দেহে।

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়,
ঢাকা
জুলাই, ২০০০

ড. আলী আসগর

মহাবিশ্ব সৃষ্টির বিষয়ে মানুষের কৌতূহল চিরন্তন। জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অপরিসীম উন্নতি একদিকে সাধারণ্যে বিজ্ঞানমনস্ক মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি করেছে, অন্যদিকে জগৎ সৃষ্টির অজানা রহস্য উদ্ভাবনে বিজ্ঞানীদের যে আকাঙ্খা তাকেও করেছে তীব্রতর। সৃষ্টিলগ্নে মহাবিশ্বের তাপমাত্রা কি ছিল, শক্তিঘনত্ব কি ছিল, কি কি মৌলকণিকা ও বল বিদ্যমান এবং ক্রিয়াশীল ছিল বা মহাবিশ্বের আকার ও আয়তন কি ছিল- ইত্যাদি মৌলিক প্রশ্নের জবাব অন্বেষার চাইতে অধিকতর উত্তেজক ও কৌতূহলোদ্দীপক আর কি-ই বা হতে পারে। মহাবিশ্ব সৃষ্টির বিষয়ে প্রচলিত বিভিন্ন তত্ত্বের মধ্যে মহাবিস্ফোরণ তত্ত্বের (The Big Bang Theory) উপর প্রতিষ্ঠিত 'স্ট্যান্ডার্ড মডেলের' গ্রহণযোগ্যতা বর্তমানে বিজ্ঞানী ও নভো-বিজ্ঞানীদের কাছে সবচেয়ে বেশি। পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী আমেরিকান বিজ্ঞানী প্রফেসর স্টিভেন ওয়াইনবার্গের লেখা 'দি ফার্স্ট থ্রি মিনিটস' (The First Three Minutes) স্ট্যান্ডার্ড মডেলের উপর একটি অত্যন্ত চমৎকার বই। এ বই-এর গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায়ের নাম অনুযায়ী মূল বইয়ের নামকরণ করা হয়েছে, 'The First Three Minutes'। সৃষ্টিলগ্নের প্রথম তিন মিনিটের ঘটনাবলীকে নাটকীয়ভাবে একের পর এক উপস্থাপন করা হয়েছে চলচ্চিত্রের দৃশ্যের মতোই এ অধ্যায়ে।

প্রথমেই 'The First Three Minutes' বইয়ের রচয়িতা স্টিভেন ওয়াইনবার্গের (Steven Weinberg) সঙ্গে একটু পরিচিত হওয়া যাক। স্টিভেন ওয়াইনবার্গ ১৯৩৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক শহরে জন্ম গ্রহণ করেন। ১৯৫০ সালে তিনি কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ডিগ্রী লাভ করেন এবং কোপেনহেগেনের নরডিক ইনস্টিটিউটে এক বছর তত্ত্বগত পারমাণবিক পদার্থবিজ্ঞান অধ্যয়ন করেন। প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি ১৯৫৭ সালে ডক্টরেট ডিগ্রী অর্জন করেন। বার্কলের ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয় ও ম্যাসাসুচেট্স ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজিতে তিনি অধ্যাপনা করেন। পরে ১৯৭৩ সালে তিনি হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা শুরু করেন। মৌলিক কণিকার মিথষ্ক্রিয়ার বিষয়টি বুঝতে পারার ক্ষেত্রে অবদান রাখার কারণে ১৯৭৯ সালে স্টিভেন ওয়াইনবার্গ পাকিস্তানী পদার্থবিদ আবদুস সালাম ও আমেরিকান পদার্থবিদ শেলডন লি গ্লাসোর সঙ্গে পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। ষাটের দশকে এই তিন পদার্থবিদ এই তত্ত্ব উপস্থাপন করেন যে মহাবিস্ফোরণের মোটামুটি প্রথম $১০^{-১১}$ সেকেন্ড পর্যন্ত মহাবিশ্বের তাপমাত্রা যখন $৩X১০^{১৫K}$ এর বেশি ছিল, তখন তড়িৎ চুম্বক বল ও দুর্বল নিউক্লীয় বলের কোন পৃথক

সত্ত্বা ছিল না, তারা একীভূত অবস্থায় ছিল। এর পরই একটি দশা পরিবৃত্তি (Phase transition) ঘটে থাকবে।]

স্টিভেন ওয়াইনবার্গ বর্তমানে 'ইউনিভার্সিটি অব টেকসাসে' বিজ্ঞান ও নভোপদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক। ১৯৯১ সালে হোয়াইট হাউজে তাকে 'ন্যাশনাল মেডেল অব সায়েন্স' পুরস্কার প্রদান করা হয়। স্টিভেন ওয়াইনবার্গ ' রয়াল সোসাইটি অব লন্ডন' এবং 'ইউ.এস ন্যাশনাল একাডেমী অব সায়েন্স' এর সদস্য। তিনি অসংখ্য সম্মানজনক ডিগ্রী লাভ করেছেন। স্টিভেন ওয়াইনবার্গের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে- দি ডিসকভারি অফ সাবএটমিক পার্টিকেলস, এলিমেন্টারি পার্টিক্যালস এন্ড দি লজ অফ ফিজিকস (রিচার্ড ফেইনম্যানের সঙ্গে), গ্রাভিটেশন এন্ড কসমোলজি, ড্রিমস অফ এ ফাইনাল থিয়োরি ইত্যাদি।

এই গ্রন্থ সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা শুরু করার আগেই মহাবিশ্বের গঠন ও সৃষ্টি রহস্য সম্পর্কে মনীষিদের ধারণার বিবর্তনের ইতিহাসের প্রতি ক্ষণিকের জন্য দৃষ্টিপাত করা যাক। খৃষ্টপূর্ব প্রায় ৪০০০ সাল থেকেই বিশ্বাস করা হতো যে পৃথিবীর অবস্থান মহাবিশ্বের কেন্দ্রে। গ্রীক জ্যোতির্বিদ টলেমি এবং দার্শনিক এরিস্টোটল বিশ্বাস করতেন যে পৃথিবী স্থির এবং পৃথিবীকে কেন্দ্র করেই সূর্য, চন্দ্র, গ্রহসমূহ ও মহাবিশ্বের সকল বস্তু আবর্তিত হয়। এরিস্টোটলের গুরু প্লেটোও এমনটিই বিশ্বাস করতেন এবং আরো বিশ্বাস করতেন যে বিশ্ব গোলাকার। প্লেটো এবং এরিস্টোটলের শিষ্য হেরাকাইডস সর্বপ্রথম বললেন, সূর্য যদিও পৃথিবীর চারদিকে ঘুরে, শুক্র আর বুধ ঘুরে সূর্যের চারদিকে। খৃষ্টপূর্ব ২৭০ সালে এরিস্টোটলের আরেক শিষ্য গ্রীক জ্যোতির্বিদ এরিস্ট্রাকাস বললেন, 'সূর্য স্থির, পৃথিবী এবং অন্যান্য গ্রহ সূর্যের চারিদিকে ঘুরে'। তবে জ্ঞান বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এরিস্ট্রোটলের একচ্ছত্র একাধিপত্যের কারণে এরিস্ট্রাকাসের এই মতামত তখন সাধারণভাবে গ্রহণযোগ্য হয় নি এবং ১৫৪৩ সাল পর্যন্ত এই বিশ্বাসই বলবত রইল যে পৃথিবী মহাবিশ্বের কেন্দ্রে অবস্থিত।

১৯১৪ সালে পোল্যান্ডের জ্যোতির্বিদ (ও ধর্মযাজক) নিকোলাস কোপারনিকাস এই তত্ত্ব উপস্থাপন করেন যে সূর্য স্থির এবং তা মহাবিশ্বের কেন্দ্রে অবস্থিত। সূর্যকে কেন্দ্র করে পৃথিবী এবং অন্যান্য গ্রহগুলো ঘূর্ণায়মান। জার্মান জ্যোতির্বিদ জোহান কেপলার কোপারনিকাসের সৌরকেন্দ্রীক প্রস্তাব সমর্থন করেন এবং তিনি আবিষ্কার করেন যে গ্রহসমূহ ডিম্বাকার (Elliptical) কক্ষপথে সূর্যকে কেন্দ্র করে পরিভ্রমণ করে। গ্যালিলিও গ্যালিলি-ও এরিস্টোটলের পৃথিবী কেন্দ্রীক মহাবিশ্বের তত্ত্ব সম্পূর্ণ প্রত্যাখান করেন এবং কোপারনিকাসের সৌরকেন্দ্রীক মহাবিশ্বের প্রস্তাব সমর্থন করেন। বস্তুত ১৬০৭ সালে টেলিস্কোপ আবিষ্কারের পর কেপলারের প্রস্তাবের পক্ষে পর্যবেক্ষণগত দৃঢ় ভিত্তি ও সমর্থন পাওয়া গেল এবং ১৬০৯ সালে টলেমী ও এরিস্টোটলের পৃথিবী কেন্দ্রীক মহাবিশ্ব ধারণার অনিবার্য পতন ঘটলো।

স্যার আইজাক নিউটনই প্রথম অনুধাবন করেন যে, একটি সসীম (Finite) স্থানে নক্ষত্রগুলো যদি সুসম ভাবে বণ্টিত থাকে তবে মহাকর্ষ বলের প্রভাবে বা টানে তা কোন একক কেন্দ্র বা বিন্দুতে একে অপরের উপর পতিত হবে এবং একটি বিশাল পিন্ড সৃষ্টি করে নিজস্ব মহাকর্ষ বলের প্রভাবে তা ভেঙে পড়বে। অপর পক্ষে একটি

অসীম স্থানে নক্ষত্রসমূহ যদি মোটামুটি সুসমভাবে বণ্টিত থাকে, তাহলে এমনটি ঘটবে না। কেননা অসীম (Infinite) স্থানের কোন নির্দিষ্ট কেন্দ্র থাকে না। তবে এক্ষেত্রে মহাকর্ষ বলের প্রভাবে নক্ষত্রসমূহ অসীম সংখ্যক পিন্ড (Lump) তৈরি করে পুরো মহাবিশ্বে ছড়িয়ে থাকতে পারে। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, নিউটনের বিশ্বাস ছিল, মহাবিশ্ব অসীম হলেও স্থির (Static), যাতে নক্ষত্রসমূহ সুসমভাবে বণ্টিত রয়েছে অথবা নক্ষত্রসমূহ স্থানীয়ভাবে অসীম সংখ্যক পিন্ড গঠন করে টিকে রয়েছে।

এই তত্ত্বের বিপক্ষে প্রথম প্রশ্ন তুললেন তারই সমসাময়িক এডমুন্ড হ্যালি। তার প্রশ্ন হলো মহাবিশ্বে নক্ষত্রসমূহ যদি সুসমভাবে বণ্টিত থাকে তাহলে রাতের আকাশ অন্ধকার দেখায় কেন। সে ক্ষেত্রে দিনের বেলা সূর্য থাকলে আকাশ যেমন উজ্জ্বল দেখায়, রাতের বেলায়ও পুরো আকাশ তেমন উজ্জ্বল দেখতে পাওয়া উচিত। জার্মান পদার্থবিদ হেনরিখ অলবারস (Heinrich Olbers) একই আপত্তি আরো জোরালোভাবে উত্থাপন করলেন। নিউটনের তত্ত্ব ও দৃষ্টিগ্রাহ্য ফলাফলের (রাতের আকাশ অন্ধকার) আপাত বিরোধ তখন 'অলবারস প্যারাডক্স' হিসেবে স্বীকৃতি পেলো। তবে অলবারস নিজেই এই প্রশ্নের বা প্যারাডক্সের জবাব দিলেন এভাবে, 'The answer to this paradox was that space is not transparent.' বিস্ময়কর যে, এই প্রশ্নের সঠিক জবাব এলো আমেরিকান কবি ও লেখক এডগার এলান পো (Edgar Allan Poe) থেকে। পো প্রস্তাব করেন যে, আলোর একটি সীমিত গতি রয়েছে এবং মহাবিশ্বের বয়স অসীম নয়। সবচেয়ে দূরবর্তী নক্ষত্র বা উৎস থেকে আলো এসে এখনও পৃথিবীতে পৌছায়নি। এই সমাধানকে উইলিয়াম টমসন (William Thomson), লর্ড কেলভিন (Lord Kelvin) স্বতন্ত্রভাবে একটি দৃঢ় বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর দাঁড় করান।

প্রকৃতির চারটি বলের মধ্যে মহাকর্ষ বল যদিও সবচেয়ে দুর্বল তবু মহাবিশ্বের গঠনকে বৃহৎ মানদন্ডে বুঝতে চাইলে মহাকর্ষ বলের প্রয়োগ ও ব্যাখ্যা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে। বস্তুত মহাজাগতিক বস্তুসমূহের গতি, অবস্থান, অক্ষ ইত্যাদি নির্ণয় ও ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে নিউটনের চিরন্তন মহাকর্ষ বলের প্রয়োগ জ্যোতির্বিদদের নিকট প্রশ্নাতীত মানদন্ড হিসেবে টিকে রইল। কেননা তখনকার সময়ে জ্ঞাত সকল গ্রহের পর্যবেক্ষণকৃত গতি ও অবস্থান মহাকর্ষ বলের প্রয়োগ দ্বারা নির্ভুলভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব ছিল। ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হলো শুধু সূর্যের নিকটতম গ্রহ বুধের (Mercury) কক্ষপথের ব্যাপক সরণের ক্ষেত্রে।

১৯০৬ এবং ১৯১৬ সালের মধ্যে আলবার্ট আইনস্টাইন মহাকর্ষ বলের একটি নতুন তত্ত্ব উদ্ভাবন করেন, যা আপেক্ষিকতার সাধারণ তত্ত্ব নামে (General Theory of Relativity) পরিচিত। এই তত্ত্ব বুধ গ্রহের কক্ষপথের ব্যাপক সরণের বিচ্যুতির রহস্য উন্মোচন করে এবং এমন অনেকগুলো ভবিষ্যদ্বাণী করে যা পরবর্তীতে পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা দ্বারা নির্ভুল বলে প্রমাণিত হয়। আপেক্ষিকতার সাধারণ তত্ত্বে মহাকর্ষ বলকে চারমাত্রিক স্থান-কাল সন্ততির বক্রতার প্রভাব হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়। আরো একটু সহজ করে একে এভাবে বলা যায় যে, আমরা এমন একটা জগতে আছি যার স্থান-কালের (আপেক্ষিকতার সাধারণ তত্ত্ব অনুযায়ী, স্থানকে কাল থেকে পৃথক করে ভাবার কোন অবকাশ নেই) চারমাত্রিক জ্যামিতির গড়ন বা টপোগ্রাফী

অনুসারে প্রত্যেকটি বস্তু প্রত্যেকের দিকে ঝুকতে বাধ্য। বস্তু যে স্থানে থাকে তার একটা বক্রতা সৃষ্টির ধর্ম বা বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এমনকি আলোকেও স্থান-কালের এই বাকানোর ধর্ম মেনে চলতে হয়। এর কারণ হলো বিশাল ভর বিশিষ্ট কোন বস্তু তার মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র দ্বারা এর নিকটবর্তী স্থান-কালে বক্রতা সৃষ্টি করে। তাই স্থান-কালের বৈশিষ্ট্য বা জ্যামিতি নির্ধারিত হয় ভর ও শক্তির বন্টন দ্বারা।

আইনস্টাইনের মূল ক্ষেত্র সমীকরণসমূহের উপর ভিত্তি করে (অর্থাৎ মহাজাগতিক ধ্রুবক পদ বাদ দিয়ে) ১৯২২ সালে রাশিয়ান গণিতবিদ আলেকজান্ডার ফ্রিডম্যান সমসত্ত্ব ও দিক নিরপেক্ষ মহাবিশ্বের এক মডেল উপস্থাপন করেন। তার উপস্থাপিত মডেল অনুযায়ী মহাবিশ্বের সম্ভাব্য তিনটি রূপ রয়েছে। এক : মহাবিশ্ব ধীরভাবে প্রসারমাণ এবং এক সময় তা বন্ধ হবে। আবার সংকোচন শুরু হবে এবং মহাবিশ্বের সমাপ্তি ঘটবে। এক্ষেত্রে মহাবিশ্ব হলো সসীম। দুই : মহাবিশ্ব দ্রুত প্রসারমান, প্রসারণ কখনো বন্ধ হবে না এবং মহাবিশ্ব অসীম। তিন : মহাবিশ্বের প্রসারণের গতি খুব দ্রুত নয়, ধীরও নয়- এ দুটোর মাঝামাঝি প্রান্তিক মানের এবং মহাবিশ্ব অসীম। এখানে উল্লেখ্য যে তখনকার প্রচলিত বিশ্বাসকে ধারণ করতে গিয়ে আইনস্টাইন তার মূল সমীকরণে সংশোধনী আনেন এবং (মূল সমীকরণে) মহাজাগতিক ধ্রুবক পদ অন্তর্ভুক্ত করেন। এর ফলে আইনস্টাইনের মহাবিশ্ব হয়ে উঠে সমসত্ত্ব, দিক নিরপেক্ষ এবং দৃশ্যজনকভাবে স্থির (Static)। তবে আইনস্টাইনের মূল ক্ষেত্র সমীকরণে মহাজাগতিক ধ্রুবক পদ অন্তর্ভুক্ত রেখেও মহাবিশ্বের এমন অনেক মডেল উপস্থাপন করা সম্ভব, যে সব ক্ষেত্রে মহাবিশ্ব হতে পারে গতিশীল (Dynamic) বা প্রসারমান।

আইনস্টাইনের সংশোধিত তত্ত্বের ভিত্তিতে (অর্থাৎ ক্ষেত্র সমীকরণে মহাজাগতিক ধ্রুবক অন্তর্ভুক্ত রেখে) ওলন্দাজ জ্যোতির্বিদ ডব্লিউ.ডি সিটার ১৯১৭ সালে মহাবিশ্বের একটি মডেল উপস্থাপন করেন। এতেও মহাবিশ্বকে স্থির (Static) দেখানো হয়, তবে এ তত্ত্ব এই ভবিষ্যদ্বাণী করে যে দূরবর্তী গ্যালাক্সীসমূহের রয়েছে তাদের দূরত্বের অনুপাতে লালসরণ। অর্থাৎ দূরত্বের আনুপাতিক বেগে তারা দূরে সরে যাচ্ছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর যখন লালসরণ পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হলো, তখন ডি সিটার মডেল তাৎক্ষণিক খ্যাতি ও গ্রহণযোগ্যতা পেল। ১৯২৯ সালে এডুইন হাবল আবিষ্কার করেন, দূরবর্তী গ্যালাক্সীসমূহ আমাদের কাছ থেকে তাদের দূরত্বের আনুপাতিক বেগে দূরে সরে যাচ্ছে।

এখানে বিশেষ গুরুত্ব সহকারে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বেলজিয়ামের গণিতজ্ঞ ও জ্যোতিপদার্থ বিজ্ঞানী (এবং ধর্মযাজক) এবে জর্জ লেমাইতার (Abbe Georges Lemaitre) সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ভাবে ১৯২৭ সালে আইনস্টাইনের ক্ষেত্র সমীকরণ থেকে এমন একটি সমীকরণ উদ্ভাবন করেন, যা ফ্রিডম্যানের সমীকরণের সম্পূর্ণ অনুরূপ এবং তিনিই প্রথম প্রস্তাব করেন যে অত্যন্ত ঘনীভূত ও সংহত অবস্থা থেকে বর্তমান মহাবিশ্বের উদ্ভব হয়েছে। এজন্য কখনো কখনো জর্জ লেমাইতারকে মহাবিস্ফোরণ তত্ত্বের জনক (The Father of The Big Bang) বলা হয়।

১৯৪৬ সালে জর্জ গ্যামো মহাজাগতিক বস্তুসমূহের পরিমাণ নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা ভাবনা করছিলেন। তিনি অনুধাবন করেন যে, মহাবিশ্বকে শুরুর দিকে এতটা ঘন ও উত্তপ্ত হতে হবে যাতে পারমাণবিক বিক্রিয়ার বিস্ফোরণ ঘটতে পারে। আদি মহাবিশ্বে

সংঘঠিত কতগুলো বিক্রিয়ার পরম্পরা তিনি প্রস্তাব করেন যা পরিমাপকৃত মহাজাগতিক বস্তুসমূহের পরিমাণকে ব্যাখ্যা করতে পারে। জর্জ গ্যামো তার এক ছাত্র র‍্যালফ আলফারকে সঙ্গে নিয়ে ১৯৪৮ সালে তার এই ধারণার উপর প্রথম প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এই প্রবন্ধটি প্রথম ছাপার সময়ে জর্জ গ্যামো পরমাণু বিজ্ঞানী হ্যানস ব্যাথের নাম তার অজ্ঞাতসারেই লেখক হিসেবে জুড়ে দিলেন। গ্যামো ভাবলেন মহাবিশ্ব উদ্ভবের বর্ণনা সম্পর্কিত কোন প্রবন্ধে লেখক হিসেবে গ্রীক বর্ণমালার প্রথম তিনটি অক্ষর বিশিষ্ট নাম (α, β, δ) থাকা খুবই মানানসই হবে। পরবর্তীতে আলফার এবং র‍্যালফ হেরম্যান বিস্তারিত গণনার মাধ্যমে দেখান যে, গ্যামোর তত্ত্বে ভুল রয়েছে। কেননা শুধু প্রোটন বা নিউট্রন একের পর এক যুক্ত হয়ে ভারী কণিকার নিউক্লিয়াস গঠন করতে পারে না। ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের হেরম্যান বন্ডি, টমাস গোল্ড এবং ফ্রেড হয়েল জর্জ গ্যামোর ' বিগ ব্যাং' তত্ত্ব সম্পূর্ণ প্রত্যাখান করেন এবং এই তত্ত্বের বিকল্প হিসেবে তারা 'Steady State Universe' তত্ত্ব উপস্থাপন করেন। এই তত্ত্বের মূল কথা হলো মহাবিশ্ব একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ে হঠাৎ কোন বিস্ফোরণ থেকে শুরু হয়নি। অর্থাৎ এর বয়স হলো অসীম এবং এর কোন শেষও নেই। মহাবিশ্ব প্রসারমান এবং এর প্রসারণের সংগে অবিরাম বস্তু সৃষ্টির প্রক্রিয়া এমনভাবে চলছে, যাতে মহাবিশ্বের গড় ঘনত্ব অপরিবর্তিত থাকে।

এখানে পরিহাসের বিষয়টি হলো, জর্জ গ্যামোর প্রস্তাব প্রত্যাখান করলেও ফ্রেড হয়েলই 'Big Bang' পদটি প্রথম ব্যবহার করেন। ১৯৫০ সালে বিবিসির সঙ্গে এক বেতার সাক্ষাতকারে বেশ অবজ্ঞার সাথে এই পদটি ব্যবহার করে তিনি মন্তব্য করেন, 'This big bang idea seemed to me to be unsatisfactory even before examination showed that it leads to serious difficulties. For when we look at our own Galaxy, there is not the smallest sign that such an explosion ever occurred.'

অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত পরিসরে মহাবিশ্বের সৃষ্টি রহস্যের অতীত ইতিহাস আলোচনা করতে গিয়ে অনুল্লিখিত রয়ে গেল অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা এবং অনেক অনেক দার্শনিক, বিজ্ঞানী, জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও মনীষীর নাম যাদের নিরলস পরিশ্রম, অপরিসীম নিষ্ঠা, অধ্যাবসায় ও ধ্যানমগ্ন ঋষির বিনিদ্র রজনীর নীরব সাধনার ফসলরূপে জ্যোতির্বিদ্যা আজকের এই পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে।

মহাবিশ্বের সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে আধুনিক যে ধারণায় বিজ্ঞানীরা সম্প্রতি উপনীত হয়েছেন তা আকস্মিকভাবে ঘটেনি, যদিও এক একটি বড় আবিষ্কার এক একটি বড় অগ্রগতির ধারা রূপে কাজ করেছে। উদ্ভাবন ও আবিষ্কারের সেই অবিচ্ছিন্ন দীর্ঘ পথের একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র এখানে তুলে ধরার প্রয়োজন বোধ করেছি। স্টিভেন ওয়াইনবার্গ যে পাঠকদের কথা ভেবে মূল বইটি রচনা করেছেন বর্তমান অনুবাদ গ্রন্থের পাঠক স্বভাবতই ভিন্ন হবেন তাদের অভিজ্ঞতায় ও ইতিহাস চেতনায়, এমনটিই স্বাভাবিক। এটাও একটি কারণ জ্যোতির্বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশের ইতিহাস কিছুটা এখানে তুলে ধরার, যা মূল বইয়ের লেখকের কাছে হয়তো প্রয়োজনীয় মনে হয় নি।

'দি ফার্স্ট থ্রি মিনিটস' গ্রন্থটি ১৯৭৭ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। বইটি প্রথম প্রকাশনার পর প্রায় ২৩ বছর অতিবাহিত হয়েছে। এই দীর্ঘ সময়ে কসমোলজি বা মহাবিশ্ব সৃষ্টিতত্ত্বের উপর অনেক বই প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও রেকর্ড সৃষ্টিকারী বেস্ট সেলার বই হলো স্টিফেন হকিং এর ' এ ব্রিফ হিস্টরি অব টাইম' (কালের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস)। বর্তমান সময়ের আইনস্টাইন বলে কথিত স্টিফেন হকিং তার বইয়ের শুরুতেই লিখেছেন, 'I decided to try and write a popular book about space and time after I gave the Loeb lectures at Harvard in 1982. There were already a considerable number of books about the early universe and black holes, ranging from the very good, such as Steven Weinberg's books, The First Three Minutes , to the very bad, which I will not identify'. আলোড়ন সৃষ্টিকারী 'দি ফার্স্ট থ্রি মিনিটস' বইটির জন্য স্টিফেন ওয়াইনবার্গ অনেকগুলো পুরস্কার লাভ করেন। বস্তুত এই গ্রন্থটির প্রকাশনা ওয়াইনবার্গের জন্য বিরল সম্মান ও অনন্য গৌরব বয়ে এনেছে।

যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন বিখ্যাত পত্রিকা ও ম্যাগাজিনে এই বইটি সম্পর্কে অনেক উচ্ছসিত প্রশংসা সূচক মন্তব্য ও অভিমত প্রকাশ করা হয়।

যুক্তরাষ্ট্রের দি নিউ সায়েন্টিষ্ট পত্রিকায় বলা হয়, ' At the very top of the division for brilliance and ludicity'.

নিউইয়র্ক রিভিউ অব বুকস -এ এই গ্রন্থ সম্পর্কে মন্তব্য করা হয়, 'Science writing at its best.'

এই বই সম্পর্কে আইজাক অসিমভের বক্তব্য হলো, 'The book is the first I have seen to put the details, both historical and conceptual, of the origin of the universe within the grasp of the general reader. As such, it is a tremendous service to us all.' পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী টি,ডি,লি (T.D.Lee) এই বই সম্পর্কে বলেন, 'A most remarkable achievement ... presented with clarity ... and great scientific accuracy'.

দি নিউ ইয়র্কার পত্রিকার জেরিমি বার্নস্টেইন (Jeremy Bernstein) এই বই সম্পর্কে এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, 'Weinberg builds such a convincing case ... that one comes away from his book feeling not only that the idea of an original cosmic explosion is not crazy, but that any other theory appears scientifically irrational.'

এলান বুলক (Alan Bullock) এর মন্তব্য হলো, 'For sheer intellectual excitement I have come across nothing to equal The First Three Minutes'.

প্রথমেই লেখক অতি সংক্ষেপে বইটি লেখার প্রেক্ষাপট বর্ণনা করেন। ওয়াইনবার্গ বিভিন্ন সময়ে যদিও সৃষ্টিতত্ত্ব নিয়ে কিছুটা গবেষণা করেছেন তবুও মৌলিক কণিকার

উপর গবেষণাই ছিল তার প্রধান কর্মক্ষেত্র। তাই এই ধরনের একটি বই লেখার ব্যাপারে প্রথমে তিনি তেমন আগ্রহী ছিলেন না। কিন্তু তার এক বন্ধুর উৎসাহ ও অনুপ্রেরণায় এই বিষয়ে একটি বই লেখার ব্যাপারে তিনি কিছুটা উদ্বুদ্ধ হন। পরে তিনি লক্ষ্য করেন যে এই বিষয়ে একটি বই লেখার ভাবনা চিন্তা থেকে তিনি নিজেকে বিরত রাখতে পারছেন না। তাঁর নিজের মনেই প্রশ্ন জাগে, বিশ্ব সৃষ্টির প্রারম্ভিক মুহূর্তের সমস্যা বা ঘটনাবলীর চেয়ে অধিকতর চিত্তাকর্ষক আর কি ই বা হতে পারে।

কোন ধরনের পাঠকদের উদ্দেশ্যে এ বইটি লিখেছেন সে বিষয়টি লেখক শুরুতেই স্পষ্ট করেছেন। যারা অংকশাস্ত্র বা পদার্থবিজ্ঞানে পারদর্শী নন, অথচ কিছু বিস্তারিত যুক্তিতর্কের মধ্য দিয়ে কঠিন পরিশ্রমের মাধ্যমে কিছু দুর্বোধ্য প্রশ্নের উত্তর বের করতে চান- তাদের জন্যই এই বই লেখা। এই বইয়ের পাঠকদের আগে থেকেই পদার্থবিজ্ঞান বা জ্যোতির্বিদ্যার প্রাথমিক জ্ঞান থাকতে হবে- এমন কোন অনুমান বা ধারণার ভিত্তিতে তিনি বইটি লেখেন নি। কারণ যখনই কোন বৈজ্ঞানিক শব্দ বা পদ তিনি প্রথম ব্যবহার করেছেন তখনই বা পরবর্তীতে Glossary of Terms -এ অত্যন্ত সহজ ও সাবলীলভাবে ঐ পদটিকে সজ্ঞায়িত করেছেন, যাতে পাঠক খুব সহজে বক্তব্যের গভীরে প্রবেশ করতে পারেন। অপরদিকে একথাও তিনি অকপটে স্বীকার করেছেন যে তিনি একটি সহজ বই লেখার চেষ্টা করেন নি।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে 'বিগ ব্যাং' বা 'মহাবিস্ফোরণ তত্ত্বের' ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত স্ট্যান্ডার্ড মডেলের উপরে 'প্রথম তিন মিনিট' বইটি লেখা হয়েছে। ভূমিকায় ওয়াইনবার্গ একটি সার সংক্ষেপ উপস্থাপন করেন। এর সুবিধা হলো এই যে, খুব ব্যস্ত পাঠকও ৫/৬ পৃষ্ঠার একটি অধ্যায় পাঠ করেই 'মহাবিস্ফোরণ তত্ত্ব' সম্পর্কে একটি সম্যক ধারণা লাভ করতে সক্ষম হবেন। সাধারণভাবে বলা যায় মহাবিস্ফোরণ তত্ত্ব মূলত যে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণলব্ধ তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত তাহলো, এক : ১৯২৯ সালে এডুইন হাবল পর্যবেক্ষণ করেন যে ব্যাপক পটভূমিতে মহাবিশ্ব প্রসারমাণ, দুই: মহাবিশ্বের সর্বত্র যে 3° K তাপমাত্রার মাইক্রোওয়েভ পটভূমি বিকিরণ বিদ্যমান রয়েছে ১৯৬৫ সালে পেনজিয়ার্স ও উইলসন কর্তৃক তার আবিষ্কার, তিন :.মহাবিশ্বে মোট বস্তুর প্রায় এক চতুর্থাংশ হাইড্রোজেন ও তিন চতুর্থাংশ হিলিয়ামের উপস্থিতি পর্যবেক্ষণ। মহাবিস্ফোরণ তত্ত্বের সমর্থনে আরো একাধিক পর্যবেক্ষণগত ও গবেষণালব্ধ প্রমাণ রয়েছে। প্রসারমান মহাবিশ্ব ও মাইক্রোওয়েভ পটভূমি বিকিরণ এই দুটো বিষয় সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে এই বইয়ে দুটো অধ্যায় লেখা হয়েছে এবং এই বইয়ের বড় অংশ জুড়ে রয়েছে এ দুটো অধ্যায়। তাত্ত্বিকদের প্রায় সুনির্দিষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী থাকা সত্ত্বেও ৩° কেলভিন তাপমাত্রার মাইক্রোওয়েভ বিকিরণ (একে মহাবিস্ফোরণের ফসিল বা অবশেষ বলা যেতে পারে) আবিষ্কার করার মতো একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা কেন একটি দুর্ঘটনার মাধ্যমে ঘটলো বা এই আবিষ্কারে কেন এতো দীর্ঘ সময় লাগলো - সেই বিষয়টি অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও বিশদভাবে আলোচনা করেছেন, 'A Historical Diversion' অধ্যায়ে। এই বইয়ের নামকরণ থেকেই এটা স্পষ্ট যে বইটি আদি মহাবিশ্ব সম্পর্কে। তবে এই বইয়ের শেষের দিকে 'Epilogue : The Prospect Ahead' শিরোনামের একটি অধ্যায়ে ওয়াইনবার্গ মহাবিশ্বের সম্ভাব্য শেষ বা চূড়ান্ত পরিণতি কি হতে পারে তার একটি যৌক্তিক ও চমকপ্রদ বর্ণনা উপস্থাপন করেছেন।

মহাবিস্ফোরণ তত্ত্বের ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা ও সাফল্য থাকা সত্ত্বেও ওয়াইনবার্গ প্রথমেই অকপটে স্বীকার করেছেন যে, মহাবিশ্বের উৎপত্তি সম্পর্কে স্ট্যান্ডার্ড মডেলে যে চিত্র অংকন করা হয়েছে তা সর্বাধিক সন্তোষজনক নয়। বিশেষ করে মহাবিশ্ব সৃষ্টিলগ্নের প্রথম সেকেন্ডের এক শতাংশ সময়ের ঘটনাবলী সম্পর্কে একটি অস্বস্তিকর অস্পষ্টতা এখানেও থেকেই যাচ্ছে। এই তত্ত্বের অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ সীমাবদ্ধতা হলো, প্রতিটি পারমাণবিক কণিকার বিপরীতে একশত কোটি ফোটন কণিকা রয়েছে এই অনুমানকে গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা। ওয়াইনবার্গ তার ভূমিকাতে এই বিষয়টিও স্পষ্ট করে বলেছেন।

'দি ফার্স্ট থ্রি মিনিটস' অধ্যায়ের শেষের দিকের একটি অনুচ্ছেদ আমি এখানে হুবহু তুলে দেয়ার লোভ সংবরণ করতে পারছিনা। 'প্রথম তিন মিনিটের হিসাবের এই বিবরণী পড়ে পাঠক হয়তো ভাবতে পারেন যে, তিনি এর মধ্যে একটি বৈজ্ঞানিক অতিবিশ্বাস খুঁজে পাচ্ছেন। হয়তো তিনি সঠিক। তবে আমি বিশ্বাস করি না যে, সর্বতোভাবে একটি খোলা মন রাখলেই সব সময় সবচেয়ে বেশি বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি অর্জন সম্ভব হয়। একজনের সন্দেহের বিষয়টি প্রায়ই ভুলে যাওয়া প্রয়োজন এবং কারো অনুমানসমূহ (Assumptions) যেখানেই নিয়ে যাক না কেন তার পরিণতিটা কি, তা লক্ষ্য করা উচিত। গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাটি হলো , তত্ত্বগত সংস্কার (Theoritical Prejudices) থেকে মুক্ত না হওয়া ; কিন্তু সঠিক তত্ত্বগত সংস্কারগুলো গ্রহণ করা। সব সময়েই যে কোন তত্ত্বগত পূর্বকল্পনা (Theoritical Preconception) কোথায় নিয়ে যাচ্ছে- তা দিয়েই এটাকে যাচাই করতে হয়। আদি মহাবিশ্বের স্ট্যান্ডার্ড মডেল কিছু সাফল্য অর্জন করেছে এবং এটি ভবিষ্যত গবেষণা কর্মসূচীর জন্য একটি সুসঙ্গত তত্ত্বগত কাঠামো প্রদান করে। এটা বুঝায়না যে এটি সত্য ; কিন্তু এটা বুঝায় যে, একে গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করতে হবে।'

তবে এই গুরুত্বের কথা আরো স্পষ্ট করে অন্যভাবে ওয়াইনবার্গ উচ্চারণ করেছেন বইয়ের প্রথম অধ্যায়ে এভাবে, 'তবে পদার্থবিদ্যার বা নভোপদার্থবিদ্যার তত্ত্বগত ধারণাসমূহের পরিণতি স্ট্যান্ডার্ড মডেলের প্রেক্ষাপটে যাচাই ও সমাধান করাকে বর্তমানে মর্যাদাপূর্ণ কাজ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণের কর্মসূচীসমূহের যৌক্তিকতা নিরূপণ করার জন্যও স্ট্যান্ডার্ড মডেলকে তত্ত্বগত ভিত্তি হিসেবে ব্যবহার করা একটি সাধারণ রীতি হয়ে দাড়িয়েছে। স্ট্যান্ডার্ড মডেল এভাবে এমন একটি অনিবার্য অভিন্ন ভাষা যোগান দেয়- যা তাত্ত্বিক ও পর্যবেক্ষকদের পরস্পরের কর্মকান্ড সম্পর্কে সঠিক মূল্যায়নে সাহায্য করে। স্ট্যান্ডার্ড মডেল যদি কোন দিন একটি অপেক্ষাকৃত উন্নত তত্ত্ব দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয় তাহলে সম্ভবত: তা হবে স্ট্যান্ডার্ড মডেলের প্রেষণা থেকে পাওয়া পর্যবেক্ষণ ও গণনাসমূহের কারণে।'

'An Introduction to modern Astrophysics' এর গ্রন্থকারদ্বয় ব্রাডলি ডব্লিউ. ক্যারল (Bradley W.Carroll) এবং ড্যাল এ. অসটলি (Dale A. Ostlie) উক্ত গ্রন্থের ভূমিকাতে লেখেন, 'We started to write this book six years ago, in what now seems like the Technological Stone Age'. মাত্র ছয় বছরের ব্যবধান যদি Technological Stone Age হিসেবে বিবেচিত হতে পারে তবে ২৩ বছরের ব্যবধান 'Technological Ice Age' হিসেবে বিবেচিত হওয়া উচিত।

কেননা, 'The First Three Minutes' - বইটি প্রথমে প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৭৭ সালে এবং এর পর প্রায় ২৩ বছর সময় অতিবাহিত হতে চলেছে। তাই সঙ্গত কারণেই প্রশ্ন জাগতে পারে প্রথম প্রকাশনার পর এই দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হওয়ার প্রেক্ষিতে এই বইখানির গুরুত্ব কতটুকু?

১৯৯৩ সালে প্রকাশিত তৃতীয় সংস্করণে ওয়াইনবার্গ, 'Afterword : Cosmology since 1977' শিরোনামের একটি নতুন অধ্যায় জুড়ে দেন এবং ১৯৭৭ থেকে ১৯৯২ পর্যন্ত এই ১৫ বছরে মহাবিশ্বের আকৃতিগত কি পরিবর্তন হয়েছে এবং জ্যোতির্বিদ্যার তত্ত্ব ও পর্যবেক্ষণগত কি কি অগ্রগতি সাধিত হয়েছে তার একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র উপস্থাপন করেছেন। সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হলো যে এখন পর্যন্ত অন্য কোন উন্নততর তত্ত্ব বা মডেল দ্বারা মহাবিস্ফোরণ তত্ত্ব বা স্ট্যান্ডার্ড মডেল প্রতিস্থাপিত হয়নি। সর্বোপরি স্ট্যান্ডার্ড মডেলের গ্রহণযোগ্যতা সাম্প্রতিক কালে এতো ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে যে মহাবিশ্ব সৃষ্টি রহস্যের বিজ্ঞানসম্মত তত্ত্ব হিসেবে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের এমনকি আমাদের দেশেরও মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের পাঠ্যক্রমে এটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তবে একথা আমাদের সর্বদা স্মরণ রাখতেই হবে যে বিজ্ঞানের কোন তত্ত্বকেই পরম বলে ধরা হয় না।

'দি ফার্স্ট থ্রি মিনিটস' বইটি পাঠ করার সময় আমি যে আনন্দ ও উত্তেজনা অনুভব করেছি, তা বাঙালী পাঠকদের সাথে ভাগাভাগি করার লক্ষ্যে মূল বইয়ের অনুবাদ জুড়ে দেওয়া হলো।

ঢাকা,
জুলাই,২০০০ইং

মোঃ নূর সোলায়মান

প্রস্তাবনা
Preface

আভার গ্রাজুয়েট সায়েন্স সেন্টারকে নিবেদন করে ১৯৭৩ সালের নভেম্বর মাসে হার্ভার্ডে আমি এক বক্তৃতামালায় অংশ নিয়েছিলাম। আমাদের এক বন্ধু ডেনিয়েল বেল-এর কাছ থেকে 'বেসিক বুকস'- এর প্রকাশক এবং সভাপতি এরউইন গ্লিক্স ঐ অনুষ্ঠানে আমার দেয়া বক্তৃতার বিষয়টি জানতে পারেন এবং এই বক্তৃতাকে একটি বইয়ে রূপ দেবার জন্য আমাকে তাগিদ দেন। এর ফলেই ঐ বক্তৃতার বিষয়বস্তু এ বই হিসেবে প্রকাশিত হল।

এই পরিকল্পনার বিষয়ে আমি প্রথমে খুব উৎসাহী ছিলাম না। যদিও সৃষ্টিতত্ত্ব বিষয়ে আমি মাঝে-মধ্যে সামান্য কিছু গবেষণা করেছি, তবুও পদার্থবিদ্যার মৌলিক কণিকার তত্ত্বের উপরই আমার গবেষণা অনেক বেশি সংশ্লিষ্ট ছিল। মৌলিক কণিকার পদার্থবিদ্যা বিগত কয়েক বছরে খুবই আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে এবং বিভিন্ন ম্যাগাজিনের জন্য নন-টেকনিক্যাল প্রবন্ধ লিখার কাজে বেশি ব্যস্ত থাকার কারণে আমাকে তা থেকে (মৌলিক কণিকার পদার্থবিদ্যা থেকে) দূরে থাকতে হয়েছে। সার্বক্ষণিকভাবে আমার স্বাভাবিক বিচরণক্ষেত্র 'The Physical Review'-তে ফিরে আসতে আমি এ সময় খুবই আগ্রহী ছিলাম।

অবশ্য আমি লক্ষ্য করলাম যে আদি মহাবিশ্বের উপরে একটি বই লিখার চিন্তা-ভাবনা আমি বন্ধ করতে পারছি না। সৃষ্টির সূচনা লগ্নের সমস্যা নিয়ে ভাবনার চেয়ে চিত্তাকর্ষক আর কি-ই বা হতে পারে। এছাড়া আদি মহাবিশ্বের, বিশেষত, প্রথম সেকেন্ডের শতাংশ সময়ে, সৃষ্টিতত্ত্বের সমস্যার সঙ্গে মৌলিক কণিকাতত্ত্বের সমস্যাসমূহও যুক্ত রয়েছে। সর্বোপরি আদি মহাবিশ্ব সম্পর্কে লিখার এটা হলো একটা ভাল সময়। শুধু বিগত দশকে আদি মহাবিশ্বের ঘটনাবলীর একটি বিস্তারিত তত্ত্ব 'স্ট্যান্ডার্ড মডেল' হিসেবে ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। প্রথম সেকেন্ড বা প্রথম মিনিট বা প্রথম বছরের শেষে মহাবিশ্বের অবস্থা ঠিক কেমন ছিল তা বলতে পারা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। একটি নির্দিষ্ট সময়ে (বা মুহূর্তে) মহাবিশ্বের তাপমাত্রা,ঘনত্ব ও রাসায়নিক উপাদানসমূহের মান সংখ্যাসূচক (Numerical) গণনার মাধ্যমে নির্ণয় করতে পারাও যে কোন পদার্থবিদের নিকট আনন্দের বিষয়। এটা ঠিক যে এসব মান সম্পর্কে আমরা সম্পূর্ণ নিশ্চিত নই। তবে এটা উত্তেজনাকর যে আমরা এখন বেশ আস্থার সঙ্গেই এসব বিষয় সম্পর্কে কথা বলতে ও মন্তব্য করতে সক্ষম। আর এই উত্তেজনাটুকুই আমি পাঠকের নিকট পৌছে দিতে চেয়েছি।

কোন ধরনের পাঠকের উদ্দেশ্যে এই বইটি লিখা হয়েছে, সে সম্পর্কে আমার আরো কিছু বক্তব্য রয়েছে। আমি সে সব পাঠকদের জন্যই এই বইটি লিখেছি, যারা অংকশাস্ত্র বা পদার্থবিদ্যায় পারদর্শী নয়, অথচ কিছু বিস্তারিত যুক্তিতর্কের মধ্য দিয়ে, কঠিন পরিশ্রমের মাধ্যমে কিছু দুর্বোধ্য প্রশ্নের উত্তর বের করতে চান।

এই বইয়ে যদিও আমাকে অত্যন্ত জটিল বেশ কিছু বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব উপস্থাপন করতে হয়েছে, তবু পাটিগণিতের বাইরে কোন উচ্চতর গণিত এতে ব্যবহার করা হয় নি। এই বইয়ের পাঠকদের আগে থেকেই পদার্থবিদ্যার বা জ্যোতির্বিদ্যার সামান্য বা কিছু জ্ঞান থাকতে হবে এমন ধারণার ভিত্তিতেও বইটি লেখা হয় নি। কোন বৈজ্ঞানিক শব্দ বা পদ যখন প্রথম ব্যবহার করা হয়েছে তখন তাকে সংজ্ঞায়িত করার সময়ে আমি সতর্ক থাকতে চেষ্টা করেছি। অধিকন্তু আমি পদার্থবিদ্যা ও জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ক শব্দ বা পদসমূহের একটি ব্যাখ্যা সম্বলিত তালিকা সংযোজন করেছি। যেখানে সম্ভব সেখানে অধিকতর সুবিধাজনক বৈজ্ঞানিকসংখ্যা $১০^{৩৩}$ লেখার বদলে আমি বরং ইংরেজীতে 'এ ওয়ান হানড্রেড থাউজেন্ড মিলিয়ন' লিখেছি।

তবে এতে এটা বুঝায় না যে আমি একটি সহজ বই লিখার চেষ্টা করেছি। কোন আইনজীবী সাধারণ মানুষের জন্য যখন কোন বই লিখেন তখন তিনি ধরে নেন যে সাধারণ মানুষ 'ফ্রেঞ্চ ল' বা 'উত্তরাধিকার আইন' সম্পর্কে কিছু জানেন না এবং তিনি তার উচ্চাবস্থান থেকে নেমে সাধারণ মানুষের কাছাকাছি আসেন না।

আমি পাঠককে একজন চটপটে ও অভিজ্ঞ এটর্নী হিসেবে বিবেচনা করি যিনি আমার ভাষায় কথা বলেন না, তবে তিনি তার মনস্থির করার আগে কিছু বিশ্বাসযোগ্য যুক্তিতর্ক শুনতে চান।

যে সব গণনার ভিত্তিতে এই বইয়ের যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করা হয়েছে, পাঠকদের যে অংশ তার কিছুটা বুঝতে আগ্রহী তাদের জন্য আমি একটি 'Mathematical Supplement' তৈরী করেছি যা এই বইয়ের শেষ দিকে সংযোজন করা হয়েছে। আন্ডার গ্রাজুয়েট লেভেল পর্যন্ত পদার্থবিদ্যা বা অংকশাস্ত্র পড়াশুনা করেছেন- এমন যে কোন পাঠক ' ম্যাথম্যাটিক্যাল সাপ্লিমেন্ট'[১] অংশ বুঝতে পারবেন। সৌভাগ্যক্রমে সৃষ্টিতত্ত্বে ব্যবহৃত সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ গণনাসমূহ বেশ সহজ। আপেক্ষিকতার সাধারণ তত্ত্ব বা নিউক্লীয় পদার্থ বিজ্ঞানের সূক্ষ্ম গণনাগুলো খুব কম ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়। যে সব পাঠক এই বিষয়ের আরো গভীরে যেতে চান তাদের জন্য 'Suggestions for Further Reading'[২] শিরোনামে সহায়ক বইয়ের একটি তালিকা দেয়া হয়েছে।

এই বইয়ে আমি কি কি বিষয় আলোচনা করেছি তা স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন। এটা এমন কোন বই নয়, যাতে মহাবিশ্ব সৃষ্টিতত্ত্বের সকল দিক আলোচনা করা হয়েছে। এই বইয়ে মহাবিশ্ব সৃষ্টিতত্ত্বের একটি 'ধ্রুপদী' (ক্লাসিক) অংশ রয়েছে যা প্রধানত বৃহৎ মানদন্ডের কাঠামোয় বর্তমান মহাবিশ্বকে আলোচনা করে। যেমন কুন্ডলিত নীহারিকাসমূহের গ্যালাক্সী বর্হিভূত প্রকৃতি সম্পর্কিত বিতর্ক, দূরবর্তী গ্যালাক্সীসমূহের লালসরণের আবিষ্কার, লালসরণের উপর গ্যালাক্সীসমূহের দূরত্বের নির্ভরশীলতা

১ ও ২ঃ কলেবর সীমিত রাখার লক্ষ্যে এই বইয়ে 'ম্যাথম্যাটিক্যাল সাপ্লিমেন্ট' ও 'Suggestions for Further Reading' শিরোনামে সহায়ক বইয়ের তালিকা অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি।

এবং আইনস্টাইন, ডি সিটার, লেমাইতার ও ফ্রিডম্যানের আপেক্ষিকতার সাধারণ তত্ত্বভিত্তিক মহাবিশ্ব সৃষ্টিতাত্ত্বিক মডেল এবং এ ধরনের আরো বিষয় সম্পর্কে এই বইয়ে আলোচনা করা হয়েছে। মহাবিশ্ব সৃষ্টিতত্ত্বের এই অংশটুকু বেশ কয়েকটি প্রসিদ্ধ গ্রন্থে অত্যন্ত সুন্দর ভাবে আলোচনা করা হয়েছে এবং এই বইয়ে আমি এসবের আর কোন বিস্তারিত বর্ণনা দেই নি। এই বইটিতে আদি মহাবিশ্ব সংশ্লিষ্ট এবং বিশেষ করে ১৯৬৫ সালে মহাজাগতিক মাইক্রোওয়েভ পটভূমি বিকিরণ আবিষ্কারের প্রেক্ষিতে আদি মহাবিশ্ব সম্পর্কে আমাদের মধ্যে যে নবতর উপলব্ধি সৃষ্টি হয়েছে তা নিয়ে আলোচনা করেছি।

আদি মহাবিশ্ব সম্পর্কে আমাদের বর্তমান দৃষ্টিভঙ্গীর ক্ষেত্রে মহাবিশ্বের প্রসারণ তত্ত্ব অবশ্যই একটি অপরিহার্য উপাদান (Ingredients)। তাই আমি বাধ্য হয়ে মহাবিশ্ব সৃষ্টিতত্ত্বের অধিকতর ধ্রুপদী দিকগুলো সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত ভূমিকা দ্বিতীয় অধ্যায়ে উপস্থাপন করেছি। আমি বিশ্বাস করি, এমন কি মহাবিশ্ব সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ অপরিচিত এবং আদি মহাবিশ্ব তত্ত্বের সাম্প্রতিক অগ্রগতি অনুধাবনে সক্ষম নন এমন পাঠকদের জন্য এই অধ্যায় একটি দৃঢ় ভিত্তি তৈরি করবে। এই বই-এর বাকী অংশে (দ্বিতীয় অধ্যায়ের পরের অংশে) আদি মহাবিশ্ব তত্ত্বের সাম্প্রতিক অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তবে যেসব পাঠক মহাবিশ্ব সৃষ্টিতত্ত্বের আরো আদি অংশসমূহ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চান, তারা 'Suggestions for Further Reading' শিরোনামে তালিকাভুক্ত বইগুলো পাঠ করতে পারেন।

অন্যদিকে আমি মহাবিশ্ব সৃষ্টিতত্ত্বের সাম্প্রতিক অগ্রগতির কোন সঙ্গতিপূর্ণ ঐতিহাসিক বিবরণী তুলে ধরতে পারি নি। বিশেষ করে মহাজাগতিক পটভূমি বিকিরণ শনাক্ত করার জন্য ১৯৬৫ সালের অনেক আগে থেকে কোনো অনুসন্ধান কেন পরিচালনা করা হয় নি- সেই চিত্তাকর্ষক প্রশ্নটি ষষ্ঠ অধ্যায়ে আলোচনার মাধ্যমে আমি নিজেকেই কিছুটা অবহিত করার প্রয়াস চালিয়েছি। একথা এজন্য বলছি না যে, আমি এই বইকে মহাবিশ্বের সৃষ্টিতাত্ত্বিক অগ্রগতির একটি সুনির্দিষ্ট ইতিহাস হিসেবে গণ্য করি। মহাবিশ্ব সৃষ্টিতত্ত্বের বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির বিস্তারিত ইতিহাস লেখার জন্য যে শ্রম, মমতা ও অভিনিবেশ প্রয়োজন, সে সম্পর্কে আমার যথেষ্ট শ্রদ্ধা রয়েছে। বিজ্ঞানের কোন প্রকৃত ঐতিহাসিক যদি এই বইকে প্রারম্ভিক বিন্দু হিসেবে ধরে নিয়ে বিগত ত্রিশ বছরের সৃষ্টিতাত্ত্বিক গবেষণার একটি বিস্তারিত ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেন, তবে আমি খুশী হবো।

এই বই প্রকাশনার জন্য পাণ্ডুলিপি তৈরীতে মূল্যবান পরামর্শ দেয়ার জন্য 'বেসিক বুকস'-এর এরউইন গ্লিক্স (Erwin Glikes) এবং ফ্যারেল ফিলিপস (Farrel Phillips)- এর কাছে আমি গভীরভাবে কৃতজ্ঞ। এই বই লিখতে গিয়ে পদার্থবিদ্যা ও নভোপদার্থবিদ্যার সহকর্মীদের কাছ থেকে আমি যে আন্তরিক পরামর্শ পেয়েছি তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। র‍্যালফ আলফার (Ralph Alpher), বার্নার্ড বার্ক (Bernard Burke), রবার্ট ডিক (Robert Dick), জর্জ ফিল্ড (George Field), গ্যারি ফেইনবার্গ (Gary Feinberg), উইলিয়াম ফাউলার (William Fowler), রবার্ট হেরম্যান (Robert Herman) ফ্রেড হয়েল (Fred Hoyle), জিম পিবল্স (Jim Peebles), আর্নো পেনজিয়াস (Arno Penzias), বিল প্রেস (Bill Press),

এড পারসেল (Ed Purcell) ও রবার্ট ওয়াগোনার (Robert Wagoner) -এই বইয়ের বিভিন্ন অংশ কষ্ট করে পাঠ করেছেন এবং অংশ বিশেষে তাদের মতামত দিয়েছেন। এজন্য তাঁদেরকে আমি বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাই। বিশেষভাবে আলোচ্য বিভিন্ন বিষয়ের উপর আইজাক অসিমভ (Isaac Asimov), আই. বার্নাড কোহেন (I. Bernad Cohen), মার্থা লিলার (Martha Liller) ও ফিলিপ মরিসন (Philip Morrison) তথ্য দিয়েছেন, এজন্য এঁরা আমার কাছে ধন্যবাদার্হ। নিগেল ক্যালডার (Nigel Calder) প্রথম খসড়ার পুরো বইটি পড়ে তিনি তাঁর উপলব্ধিজাত পরামর্শ ও মতামত দিয়েছেন। আমি তাঁর নিকট এজন্য বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। আমি আশা করতে পারি না যে, এই বই ভুল ও অস্পষ্টতা থেকে এখনো সম্পূর্ণ মুক্ত। তবে আমি নিশ্চিত যে সৌভাগ্যক্রমে এসব আন্তরিক সহযোগিতা পাওয়া না গেলে এই বিষয়ে যতটুকু স্পষ্ট ও নির্ভুল আলোচনা করা হয়েছে, তা সম্ভব হতো না।

ক্যামব্রীজ, ম্যাসসুচেট্স

স্টিভেন ওয়াইনবার্গ

প্রারম্ভিকা ঃ দৈত্য এবং গাভী

Introduction: The Giant and the Cow

আইসল্যান্ডের এক বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব স্নোরি ষ্টারলেসন (Snorri Sturleson)। ১২২০ সালের দিকে তিনি সংকলন করলেন নর্সদের এক পৌরাণিক কাহিনী। সংকলনের নাম দিলেন 'Younger Edda', ব্যাখ্যা করলেন জগৎ সৃষ্টির রহস্য। বললেন, কিছুই ছিলনা আদিতে, ছিলনা কোন পৃথিবী, কোন ঘাস বা মাথার উপরে কোন আকাশ- ছিল শুধু বিশাল শূন্যতা। শূন্যতার উত্তর ও দক্ষিণ জুড়ে বিস্তৃত ছিল বরফ আর আগুন, নিফলহেইম আর মাসপেলহেইম। মাসপেলহেইমের তাপ গলিয়ে দিল নিফলহেইমের কিছু বরফকে। আর সেই তরল জলকণা থেকে জন্ম নিল বিশাল দৈত্য ইয়ামের। কি খেতো সে ইয়ামের? অধুমলা নামের একটা গাভীও হয়তো ছিল। সেই বা কি খেতো? হয়তো বা কিছু লবণও ছিল। এবং আরো কত কি।

আমি অবশ্যই কোন ধর্মীয় অনুভূতিকে আহত করছি না। এমন কি সুদূর উত্তরের ভাইকিংদের ধর্মীয় অনুভূতিকেও না। তবে এটা বলে রাখা ভাল যে আমার মতে বিশ্ব সৃষ্টি-রহস্যের এটা কোন সন্তোষজনক চিত্র নয়। এমনকি শোনা কথার যুক্তিপ্রমাণাদির বিষয়ে যে সকল আপত্তি রয়েছে, সেগুলো বাদ দিলেও বলতেই হয় এ কাহিনী যত প্রশ্নের জবাব দেয় তত প্রশ্নই জাগিয়ে তোলে। আদি অবস্থার প্রত্যেকটি জবাবই সৃষ্টি করে একটি করে নতুন জটিলতা।

এড্ডার কাহিনী নিয়ে আমরা যে কেবল কৌতুক করতে পারি তা নয়। আমরা যে মহাবিশ্বের সৃষ্টি ও বিবর্তন নিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করতে সক্ষম তাও নয়। আদি মহাবিশ্বের ঘটনাবলী জানার জন্য আমাদের রয়েছে তীব্র ও দুর্বার আকাঙ্ক্ষা। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে শুরু হয় আধুনিক বিজ্ঞানের জয়যাত্রা। এ জয়যাত্রার সঙ্গে সঙ্গে পদার্থবিদ ও জ্যোতির্বিদগণ মহাবিশ্বের উৎপত্তিবিষয়ক সমস্যার দিকেও বার বার ফিরে এসেছেন।

তবে এ ধরনের গবেষণায় সব সময়ই একটু অশ্রদ্ধার ছায়া জড়িয়ে থাকতো। আমার মনে আছে ছাত্রাবস্থায় ১৯৫০ সালের দিকে আমি যখন গবেষণা শুরু করলাম, তখন ব্যাপকভাবে মনে করা হতো যে আদি মহাবিশ্ব সম্পর্কে গবেষণা এমন কোনো বিষয় নয় যাতে একজন বিজ্ঞানী সম্পূর্ণভাবে নিজেকে নিয়োজিত করতে পারে। এই বিবেচনা যে অযৌক্তিক ছিল তাও নয়। পদার্থবিদ্যা ও জ্যোতির্বিদ্যার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পর্যাপ্ত পর্যবেক্ষণগত এবং তত্ত্বগত ভিত্তি ছিল না- যার উপর আদি মহাবিশ্বের ইতিহাস গঠন করা যায়।

কেবল বিগত দশকে এসবের পরিবর্তন ঘটেছে। আদি মহাবিশ্বের একটি তত্ত্ব এতো ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে যে নভোপদার্থবিদগণ প্রায়ই একে 'স্ট্যান্ডার্ড মডেল' নামে অভিহিত করেন। এটা হলো মোটামুটি সেই তত্ত্ব যা কখনো কখনো 'মহাবিস্ফোরণ তত্ত্ব' হিসেবে পরিচিত। এই তত্ত্বে রয়েছে একটি মহাবিশ্বের অনেক বেশি সুনির্দিষ্ট উপাদানের তালিকা। আদি মহাবিশ্বের এই তত্ত্বই হলো এই বইয়ের বিষয়বস্তু।

স্ট্যান্ডার্ড মডেলের আলোকে বর্তমানে বোধগম্য আদি মহাবিশ্বের ইতিহাসের একটি 'সার সংক্ষেপ' দিয়ে শুরু করলে আমরা কোথায় যাচ্ছি তা বুঝতে সহজ হবে। এটা হবে শুধু একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী। পরের অধ্যায়গুলোতে এই ইতিহাসের বিস্তারিত বর্ণনা থাকবে এবং আমরা কেন এসব বিশ্বাস করবো তারও ব্যাখ্যা থাকবে।

শুরুতে একটি বিস্ফোরণ ঘটেছিল। আমরা আমাদের পৃথিবীতে যে ধরনের বিস্ফোরণের সঙ্গে পরিচিত, যেমন বিস্ফোরণটি কোন একটি নির্দিষ্ট কেন্দ্র থেকে শুরু হয়ে ছড়িয়ে পড়ে এবং পরিধির বেশি বেশি বায়ুকে গ্রাস করে- তেমন কোন বিস্ফোরণ নয়। বরং এটা হলো এমন এক বিস্ফোরণ যা সর্বত্র একই সময়ে ঘটে ও বিস্ফোরণের শুরুতেই সকল স্থান পূর্ণ হয়ে যায় এবং প্রত্যেকটি বস্তু কণিকা প্রচন্ড বেগে অন্য কণিকা থেকে দূরে ছুটে যায়। এ ক্ষেত্রে সমগ্র স্থান বলতে একটি অসীম মহাবিশ্বের সকল স্থান অথবা এমন একটি সসীম মহাবিশ্বের সকল স্থানকে বুঝায়- যা একটি গোলকের পৃষ্ঠতলের মতো নিজের উপরই বঙ্কিম হয়ে আসে। ঐ সময়ের মহাবিশ্ব অসীম অথবা সসীম- এই দুটো সম্ভাবনার মধ্যে কোনটি অধিকতর গ্রহণযোগ্য তা সহজবোধ্য নয়। তবে তা আমাদের পথে বিঘ্ন হয়ে দাঁড়াবে না। আদি মহাবিশ্বে স্থান সসীম অথবা অসীম ছিল- সেই প্রশ্ন মোটেই গুরুত্বপূর্ণ নয়।

সবচেয়ে আদি যে মুহূর্ত সম্পর্কে আমরা বেশ আস্থার সঙ্গে কথা বলতে পারি তা হলো, প্রায় প্রথম এক সেকেন্ডের প্রথম শতাংশ সময়ের পরবর্তী মুহূর্ত। ঐ মুহূর্তে মহাবিশ্বের তাপমাত্রা ছিল প্রায় দশহাজার কোটি ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ($১০^{১১}$ C)। এই তাপমাত্রা সবচেয়ে উত্তপ্ত নক্ষত্রের কেন্দ্রের তাপমাত্রার চেয়েও অনেক বেশি। বস্তুত এই তাপমাত্রা এতই বেশি যে ঐ তাপমাত্রায় সাধারণ বস্তুর বা অণুর, এমন কি পরমাণুর নিউক্লিয়াসের উপাদানসমূহ পর্যন্ত একত্রে থাকতে পারে নি। বরং এই বিস্ফোরণের সময় যে সকল পদার্থ পরস্পর থেকে প্রচন্ড বেগে দূরে ছুটে যাচ্ছিল, তা হলো তথাকথিত মৌলিক কণিকাসমূহ এবং এসব মৌলিক কণিকা হলো আধুনিক উচ্চ শক্তির পারমাণবিক পদার্থবিদ্যার বিষয়বস্তু।

এই বইয়ে বার বার আমরা এসব কণিকার মুখোমুখী হবো। আদি মহাবিশ্বে যে সব কণিকা সবচেয়ে বেশি পরিমাণে বিদ্যমান ছিল সেগুলোর নাম উল্লেখ করাই এখনকার জন্য যথেষ্ট হবে। তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে ঐ সব কণিকা সম্পর্কে আমরা আরো বিস্তারিত আলোচনা করবো। বিপুল সংখ্যায় বিদ্যমান ছিল এমন এক ধরনের কণিকা হলো ইলেকট্রন। ইলেকট্রন হলো ঋণাত্মক আধান বিশিষ্ট কণিকা। বিদ্যুৎ প্রবাহের সময় তারের মধ্য দিয়ে ইলেকট্রন প্রবাহিত হয় এবং বর্তমান মহাবিশ্বে সকল অণু ও পরমাণুর বাইরের অংশ ইলেকট্রন দ্বারা গঠিত। আদি মহাবিশ্বে বিপুল সংখ্যায় বিদ্যমান ছিল এমন আরেকটি কণিকা হলো পজিট্রন। পজিট্রন হলো ধনাত্মক আধান

বিশিষ্ট কণিকা। এর ভর হলো সুনির্দিষ্টভাবে ইলেকট্রনের ভরের সমান। বর্তমান মহাবিশ্বে শুধু উচ্চশক্তির গবেষণাসমূহে কোন কোন প্রকারের তেজস্ক্রিয়ায় এবং মহাজাগতিক রশ্মি ও সুপারনোভার মতো প্রচন্ড জ্যোতিঃশাস্ত্রীয় পরিঘটনায় পজিট্রন কণিকা পাওয়া যায়। কিন্তু আদি মহাবিশ্বে ইলেকট্রন কণিকার প্রায় সুনির্দিষ্ট সমান সংখ্যক পজিট্রন কণিকা বিদ্যমান ছিল। ইলেকট্রন ও পজিট্রন কণিকা ছাড়াও ইলেকট্রন বা পজিট্রনের মোটামুটি সমান সংখ্যক বিভিন্ন প্রকার নিউট্রিনো কণিকা ছিল। নিউট্রিনো হলো ভর বা বৈদ্যুতিক আধান বিহীন এক প্রকার কল্পিত কণিকা। সবশেষে মহাবিশ্ব আলোয় পূর্ণ হলো। আলো-কে কণিকা থেকে পৃথক কিছু বলে গণ্য করার দরকার নেই। কেননা কোয়ান্টাম তত্ত্ব থেকে আমরা জানতে পারি যে, শূন্য ভর ও শূন্য বৈদ্যুতিক আধান বিশিষ্ট ফোটন নামক কণিকা দ্বারা আলো গঠিত। (একটি বৈদ্যুতিক বাল্বের ফিলামেন্টে একটি পরমাণু যখন উচ্চতর শক্তিস্তর থেকে নিম্নতর শক্তিস্তরে নেমে আসে, তখন প্রত্যেকবার একটি ফোটন নির্গত হয়। একটি বৈদ্যুতিক বাল্ব থেকে অনেকগুলো ফোটন যখন নির্গত হতে থাকে তখন তা একত্রিত হয়ে অবিরাম আলোর ফোয়ারা সৃষ্টি করে। তবে একটি ফটোইলেকট্রিক সেল প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র ফোটনকে এক এক করে গণনা করতে পারে।) আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্যের উপর নির্ভর করে প্রত্যেকটি ফোটন একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ শক্তি ও ভরবেগ বহন করে। আদি মহাবিশ্ব যে আলো দ্বারা পূর্ণ ছিল, তাকে আমরা এভাবে বর্ণনা করতে পারিঃ ঐ আলোর ফোটনসমূহের গড় শক্তি ছিল প্রায় ইলেকট্রন বা পজিট্রন বা নিউট্রিনো- এর শক্তির সমান।

ইলেকট্রন, পজিট্রন, নিউট্রিনো, ফোটন- এসব কণিকা তখন অব্যাহতভাবে শুধু শক্তি থেকে সৃষ্টি হচ্ছিল এবং স্বল্প সময় টিকে থাকার পর আবার বিনাশিত হচ্ছিল। সুতরাং এসব কণিকার সংখ্যা কোন পূর্বাদেশ দ্বারা নির্ধারিত না হয়ে এর বদলে সৃষ্টি ও বিনাশের ভারসাম্যের প্রক্রিয়ায় তা নির্ধারিত হচ্ছিল। এই ভারসাম্য থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি যে দশ হাজার কোটি ডিগ্রী কেলভিন তাপমাত্রায় মহাজাগতিক স্যুপের (Soup) ঘনত্ব ছিল পানির ঘনত্বের তুলনায় প্রায় ৪০০ কোটি গুণ বেশি। এর সঙ্গে ভারী কণিকা প্রোটন ও নিউট্রন এর সামান্য দূষণও ছিল। এই ভারী কণিকাসমূহই বর্তমান মহাবিশ্বে পরমাণুর নিউক্লিয়াস গঠন করে। (প্রোটন হলো ধনাত্মক আধান বিশিষ্ট, নিউট্রন প্রোটনের তুলনায় সামান্য ভারী এবং বৈদ্যুতিক আধান নিরপেক্ষ)। প্রতি একশ'কোটি ইলেকট্রন বা পজিট্রন বা নিউট্রিনো বা ফোটন-এর বিপরীতে ছিল মোটামুটি একটি প্রোটন এবং একটি নিউট্রন। প্রতিটি পারমাণবিক কণিকার বিপরীতে যে একশ' কোটি ফোটন কণিকা অনুমান করা হয়েছে- তা হলো একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পরিমাণ (Crucial Quantity)। পর্যবেক্ষণ থেকে এই পরিমাণ বা অনুপাত গ্রহণ করা হয়েছে- যাতে মহাবিশ্বের স্ট্যান্ডার্ড মডেলের সমাধান করা যায়। তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচিত মহাজাগতিক পটভূমি বিকিরণের আবিষ্কার হলো সত্যিকার অর্থে এই সংখ্যা বা অনুপাতের একটি পরিমাপ।

বিস্ফোরণ অব্যাহত থাকার প্রেক্ষাপটে প্রায় এক সেকেন্ডের দশভাগের একভাগ সময় পর তাপমাত্রা তিন হাজার কোটি ডিগ্রী কেলভিনে নেমে আসে। প্রায় এক সেকেন্ড পর এই তাপমাত্রা এক হাজার কোটি ডিগ্রী কেলভিনে এবং প্রায় চৌদ্দ সেকেন্ড পর

তিনশত কোটি ডিগ্রী কেলভিনে নেমে এলো। এই তাপমাত্রা এতোটা কম ছিল যে ইলেকট্রন ও পজিট্রন যত অধিক হারে বিনাশিত হচ্ছিল, ফোটন ও নিউট্রিনো থেকে সেই হারে তাদের পুনর্জন্ম হচ্ছিল না। বস্তু কণিকার এই বিনাশী প্রক্রিয়ায় যে তাপ মুক্ত হলো, তা মহাবিশ্ব শীতল হওয়ার গতিকে সাময়িকভাবে মন্থর করলো। তবু মহাবিশ্বের তাপমাত্রা কমতেই থাকলো, এবং তিন মিনিটের শেষে এই তাপমাত্রা একশত কোটি ডিগ্রী কেলভিনে পৌঁছলো। এই তাপমাত্রা এতই কম যে, এতে প্রোটন ও নিউট্রনসমূহ জটিল নিউক্লিয়াস গঠন শুরু করতে সক্ষম হলো। প্রথমে তৈরী হলো হেভী হাইড্রোজেনের (বা ডিউটেরিয়াম) নিউক্লিয়াস- যাতে রয়েছে একটি প্রোটন ও একটি নিউট্রন। মহাবিশ্বের ঘনত্ব তখনও ছিল অত্যন্ত বেশি (পানির ঘনত্বের চেয়ে সামান্য কম) এবং এসব হালকা নিউক্লিয়াস দ্রুত একত্রিত হয়ে সবচেয়ে হালকা হিলিয়ামের নিউক্লিয়াস গঠন করতে সক্ষম হলো, যাতে রয়েছে দুটো প্রোটন ও দুটো নিউট্রন।

প্রথম তিন মিনিটের পর মহাবিশ্বের প্রধান উপাদান ছিল আলোক, নিউট্রিনো এবং এন্টি- নিউট্রিনো। তখন পর্যন্ত সামান্য পরিমাণ পারমাণবিক কণিকা বিদ্যমান ছিল যা প্রায় ৭৩ শতাংশ হাইড্রোজেন নিউক্লিয়াস ও ২৭ শতাংশ হিলিয়াম নিউক্লিয়াস গঠন করে টিকে রইলো এবং ইলেকট্রন-পজিট্রন পূর্ণ বিলয় যুগের (Era of electron positron annihilation) পর থেকে প্রোটনের সমান সংখ্যক ইলেকট্রন অবশেষ হিসেবে টিকে রইলো। মহাবিশ্বের পদার্থ পরস্পর থেকে আরো দূরে ছুটে যেতে লাগলো এবং মহাবিশ্বের তাপমাত্রা ও ঘনত্ব অব্যাহত ভাবে কমতে থাকলো। কয়েক শ বছর পরে মহাবিশ্ব এতো শীতল হলো যে ইলেকট্রনসমূহ নিউক্লিয়াসের সাথে মিলিত হয়ে হাইড্রোজেন ও হিলিয়ামের পরমাণু গঠন করতে সক্ষম হলো। উল্লিখিত গ্যাস (হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম) মহাকর্ষের প্রভাবে পিন্ড (Clump) তৈরি করলো এবং এই পিন্ডসমূহ ঘনীভূত হয়ে বর্তমান মহাবিশ্বের গ্যালাক্সী এবং নক্ষত্র গঠন করলো। তবে শুধু প্রথম তিন মিনিটে সৃষ্ট উপকরণ দিয়েই নক্ষত্রসমূহ তাদের জীবন শুরু করে।

স্ট্যান্ডার্ড মডেলের যে চিত্র উপরে অংকন করা হয়েছে তা মহাবিশ্বের উৎপত্তি সম্পর্কে কল্পনীয় সবচেয়ে সন্তোষজনক তত্ত্ব নয়। ইয়ংগার এড্ভা গল্পের মতো মহাবিশ্বের প্রারম্ভিক সেকেন্ডের এক শতাংশ সময়ের ঘটনাবলী সম্পর্কে এতেও একটি অস্বস্তিকর অস্পষ্টতা থেকেই যায়। বিশেষ করে সৃষ্টির আদি লগ্নে প্রতিটি পারমাণবিক কণিকার বিপরীতে একশত কোটি ফোটন কণিকা বিদ্যমান ছিল-এমনটি অনুমান করার মত অপ্রীতিকর আবশ্যকতাও রয়েছে। তত্ত্বে আমরা অধিকতর যৌক্তিক অপরিহার্যতা শ্রেয়তর প্রত্যাশা করি।

যেমন, একটি বিকল্প তত্ত্ব হিসেবে তথাকথিত স্থিতাবস্থার মডেল দর্শনগত দিক থেকে অনেক বেশি আকর্ষণীয় বলে মনে হয়। চল্লিশের দশকের শেষ দিকে হেরম্যান বন্ডি (Herman Bondi), থমাস গোল্ড (Thomas Gold) এবং (কিছুটা ভিন্ন সূত্রে) ফ্রেড হয়েল (Fred Hoyle) স্থিতাবস্থা তত্ত্বে এই প্রস্তাব করেন যে, মহাবিশ্ব বর্তমানে যেমন রয়েছে সব সময়ে ঠিক তেমনই ছিল। মহাবিশ্বের প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে অব্যাহতভাবে নতুন বস্তু সৃষ্টি হয়ে গ্যালাক্সীসমূহের মধ্যকার শূন্যস্থান পূর্ণ করে।

মহাবিশ্ব এরকম কেন, এর সম্ভাব্য সকল প্রশ্নের জবাব হলো : একমাত্র এরকম ক্ষেত্রেই মহাবিশ্ব অপরিবর্তনীয় থাকতে পারে। আদি মহাবিশ্ব সমস্যার নিরসন হলো, আদি মহাবিশ্ব বলে আর কিছু রইলো না।

তাহলে কিভাবে আমরা স্ট্যান্ডার্ড মডেলে পৌছলাম এবং কিভাবে এটা স্থিতাবস্থা মডেলের মতো অন্যান্য মডেলের স্থান দখল করলো ? আধুনিক নভোপদার্থবিদ্যার অনিবার্য বস্তুনিষ্ঠতার একটি সম্মানজনক দিক হলো এই যে, দর্শনগত অগ্রাধিকারের অবস্থান পরিবর্তন বা নভোপদার্থবিদ্যা বিষয়ক আদর্শের প্রভাবে নয়; বরং পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা নীরিক্ষাভিত্তিক উপাত্তের চাপেই এই ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

পরের দুই অধ্যায়ে জ্যোতির্শাস্ত্রীয় পর্যবেক্ষণ থেকে পাওয়া দুটো বিরাট যোগসূত্র সম্পর্কে আলাচনা করা হবে। এই দুটো যোগসূত্রই আমাদেরকে স্ট্যান্ডার্ড মডেলের দিকে নিয়ে গেছে। এই যোগসূত্রগুলো হলো দূরবর্তী গ্যালাক্সীসমূহ দূরে সরে যাচ্ছে এবং মহাবিশ্ব দুর্বল ও স্থির (মাইক্রোওয়েভ) বেতার তরঙ্গে পূর্ণ -এই তথ্য দুটোর আবিষ্কার। বিজ্ঞানের ঐতিহাসিকদের জন্য এটা হলো একটি সমৃদ্ধ কাহিনী- যা ভ্রান্ত যাত্রা, হারানো সুযোগ, তত্ত্বগত অনুমান ও ব্যক্তিত্বের পরিহাস দ্বারা পরিপূর্ণ।

পর্যবেক্ষণকৃত সৃষ্টিতত্ত্বের এই জরীপ অনুসরণ করে আদি মহাবিশ্বের বাস্তব অবস্থার একটি সঙ্গতিপূর্ণ দৃশ্য তৈরি করার জন্য আমি টুকরো টুকরো উপাত্তসমূহকে একত্রিত করার প্রচেষ্টা চালাবো। এটা আমাদেরকে পেছনের দিকে এমন এক অবস্থায় নিয়ে যাবে যে আমরা প্রথম তিন মিনিটের ঘটনাবলীর একটি বিস্তারিত বর্ণনা পাবো। এ বর্ণনাকে সিনেমার মত উপস্থাপন করাই মনে হয় যথার্থ হবে। দৃশ্যের পর দৃশ্যে আমরা দেখতে পাবো যে মহাবিশ্ব প্রসারিত, শীতল এবং গঠিত হচ্ছে। প্রথম এক সেকেন্ডের প্রথম এক শতাংশ সময়ে সংঘঠিত ঘটনাবলী - যা এখনও রহস্যাবৃত, সে বিষয়ে এবং এই আদি মুহূর্তের আগে কি ঘটেছিল, সেদিকে দৃষ্টিপাত করার জন্যও আমরা চেষ্টা চালাবো।

স্ট্যান্ডার্ড মডেল সম্পর্কে আমরা কি আসলেই নিশ্চিত হতে পারি? নতুন আবিষ্কার কি একে ছুড়ে ফেলে দেবে না? বা নতুন কোন সৃষ্টিতত্ত্ব কি বর্তমান স্ট্যান্ডার্ড মডেলকে প্রতিস্থাপন করবে না? অথবা এমন কি স্থিতাবস্থা মডেলেরও কি পুনরুজ্জীবন ঘটতে পারে না? হয়তো তাও সম্ভব। প্রথম তিন মিনিট নিয়ে লিখতে গিয়ে এর অবাস্তবতা সম্পর্কে আমার যে সংশয় রয়েছে তা আমি অস্বীকার করতে পারি না। কেননা আমরা যা বলছি সে সম্পর্কে আমরা যে সত্যিই জানি তেমন নয়। স্ট্যান্ডার্ড মডেল শেষ পর্যন্ত যদি প্রতিস্থাপিতও হয় তবু সৃষ্টিতত্ত্বের ইতিহাসে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে। তবে পদার্থবিদ্যার বা নভোপদার্থবিদ্যার তত্ত্বগত ধারণাসমূহের পরিণতি স্ট্যান্ডার্ড মডেলের প্রেক্ষাপটে যাচাই ও সমাধান করাকে বর্তমানে একটি মর্যাদাপূর্ণ কাজ বলে বিবেচনা করা হয় (যদিও মাত্র বিগত এক দশক বা ঐ সময় ধরে এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে)। জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণের কর্মসুচীসমূহের যৌক্তিকতা নিরুপণ করার জন্য স্ট্যান্ডার্ড মডেলকে তত্ত্বগত ভিত্তি হিসেবে ব্যবহার করাও এখন একটি সাধারণ রীতি (Common practice) হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্ট্যান্ডার্ড মডেল এভাবে এমন একটি অনিবার্য অভিন্ন ভাষা যোগান দেয়- যা তাত্ত্বিক ও পর্যবেক্ষকদের পরস্পরের কর্মকান্ড সম্পর্কে সঠিক মূল্যায়নে সাহায্য

করে। স্ট্যান্ডার্ড মডেল যদি কোন দিন একটি অপেক্ষাকৃত উন্নত তত্ত্ব দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়, তাহলে সম্ভবত তা হবে স্ট্যান্ডার্ড মডেলের প্রেষণা (Motivation) থেকে পাওয়া পর্যবেক্ষণ ও গণনাসমূহের কারণে।

সর্বশেষ অধ্যায়ে মহাবিশ্বের ভবিষ্যত সম্পর্কে আমি সামান্য কিছু আলোচনা করবো। শীতলতর , শূন্যতর এবং নিষ্প্রোভতর হতে হতে মহাবিশ্বের প্রসারণ অনন্তকাল ধরে চলতে পারে। বিকল্পরূপে মহাবিশ্ব আবার সংকুচিত হতে পারে এবং গ্যালাক্সীসমূহ ও নক্ষত্রসমূহ, পরমাণু ও পারমাণবিক নিউক্লিয়াসসমূহ তাদের গঠনকারী উপাদানে ভেঙ্গে পড়তে পারে। প্রথম তিন মিনিটের ঘটনাবলী অনুধাবন করতে আমরা এখন যে সব সমস্যার সম্মুখীন হই, একেবারে শেষের তিন মিনিটের ঘটনাবলীর গতি সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করতে চাইলে আবার ঠিক সে সব সমস্যার উদ্ভব হবে।

মহাবিশ্বের প্রসারণ
The Expansion of the Universe

রাতের আকাশে দৃষ্টিপাত করলে দৃঢ় ধারণার উদ্রেক হয় যে মহাশূন্য নিশ্চল। বস্তুত মেঘমালা চাঁদের চার পাশে ঘুরপাক খায় এবং আকাশ ধ্রুবতারাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। দীর্ঘ সময় ধরে চাঁদের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। তা ছাড়া চাঁদ এবং গ্রহসমূহ তারকালোকের প্রেক্ষাপটে গতিশীল বলে প্রতিভাত হয়। কিন্তু আমরা জানি যে এগুলো একটা স্থানিক ঘটনা মাত্র, যার উৎপত্তি ঘটে আমাদের সৌরজগতের অভ্যন্তরীণ গতি থেকে। গ্রহসমূহের সীমানার ওপারে তারাগুলোকে নিশ্চল মনে হয়।

অবশ্যই নক্ষত্রগুলো ছুটে চলেছে- তাদের গতি প্রতি সেকেন্ডে কয়েক শ' কিলোমিটার পর্যন্ত। অতএব এক বছরে দ্রুতগতির একটি নক্ষত্র এক হাজার কোটি কিলোমিটার বা ঐ রকম কোন দূরত্ব অতিক্রম করতে পারে। আমাদের সবচেয়ে নিকটবর্তী নক্ষত্রের দূরত্ব থেকে এই দূরত্ব এক হাজার গুণ কম। তাই আকাশে তাদের (নক্ষত্রের) আপাত অবস্থানের পরিবর্তন ঘটে অত্যন্ত শ্লথ গতিতে। (যেমন বার্নার্ডের নক্ষত্র হিসেবে পরিচিত তুলনামূলক দ্রুতগতির নক্ষত্রটি প্রায় ৫৬ মিলিয়ন মিলিয়ন কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। আমাদের দৃষ্টি রেখার আড়াআড়ি এটি প্রায় প্রতি সেকেন্ডে ৮৯ কিঃমিঃ বেগে প্রতি বছর ২.৮ হাজার মিলিয়ন কিঃমিঃ দূরে সরে যায় এবং তার পরিণতিতে এক বছরে এর আপাত অবস্থানের কৌণিক পরিবর্তন হয় মাত্র ০.০০২৯ ডিগ্রী।) অধিকতর দূরবর্তী আকাশে নিকটবর্তী নক্ষত্রসমূহের আপাত অবস্থানের এই সরণকে নভোপদার্থবিদগণ 'সঠিক গতি' হিসেবে অভিহিত করে থাকেন। নক্ষত্রসমূহের আপাত অবস্থানের সরণ এতো ধীর গতিতে ঘটে যে তাদের 'সঠিক গতি' গভীর ধৈর্য নিয়ে পর্যবেক্ষণ করেও শনাক্ত করা যায় না।

তাহলে আমরা এখানে দেখি যে নিশ্চলতার এই ধারণাটি একটি বিভ্রম। যে সব পর্যবেক্ষণ আমরা এখানে আলোচনা করবো তাতে দেখা যাবে যে, মহাবিশ্ব এমন একটি প্রচন্ড বিস্ফোরিত অবস্থায় রয়েছে যেখানে গ্যালাক্সীগুলো প্রায় আলোর গতির কাছাকাছি গতিতে একে অপরের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। গ্যালাক্সী হলো অসংখ্য নক্ষত্রের এক একটি দ্বীপ (Island)। তাছাড়া বিস্ফোরিত অবস্থা থেকে হিসাব করে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, দূর অতীতের কোন এক সময়ে সবগুলো গ্যালাক্সী অবশ্যই খুব কাছাকাছি ছিল এবং বস্তুতপক্ষে এত কাছাকাছি ছিল যে গ্যালাক্সীসমূহ তো নয়ই, এমনকি নক্ষত্রসমূহ বা অণুসমূহ বা পরমাণুর

নিউক্লিয়াসেরও পৃথক সত্তা ছিল না। এই যুগকেই আমরা বলি আদি মহাবিশ্ব (The Early Universe) এবং এটিই আমাদের আলোচ্য বিষয়।

মহাবিশ্বের প্রসারণ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান সম্পূর্ণরূপে যে বাস্তবতার উপর নির্ভরশীল তা হলো, জ্যোতির্বিদরা তাদের দৃষ্টিরেখা বরাবর একটি আলোকিত বস্তুর গতি যত নির্ভুলভাবে পরিমাপ করতে পারেন,দৃষ্টি রেখার উপর অংকিত লম্বের দিকে চলমান বস্তুর গতি ততটা নির্ভুলভাবে নিরুপণ করতে পারেন না। এ ক্ষেত্রে যে কোন প্রকারের তরঙ্গায়িত গতির সুপরিচিত বৈশিষ্ট্য বা ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত একটি কৌশল- ব্যবহার করা হয় যা ডপলার প্রক্রিয়া নামে পরিচিত। স্থির উৎস থেকে আগত শব্দ বা আলোর কম্পাংক যখন আমরা পর্যবেক্ষণ করি তখন দেখি যে উৎসে সৃষ্ট তরঙ্গ শীর্ষসমূহের অন্তর্বর্তীকালীন সময় ও গ্রাহক যন্ত্রে আগত তরঙ্গ শীর্ষসমূহের অন্তর্বর্তীকালীন সময় সমান। অপর দিকে উৎসটি যদি আমাদের কাছ থেকে দূরে সরে যেতে থাকে, তাহলে উৎসে সৃষ্ট তরঙ্গ শীর্ষসমূহের অন্তর্বর্তীকালীন সময়ের চেয়ে গ্রাহক যন্ত্রে আগত তরঙ্গ শীর্ষসমূহের অন্তর্বর্তী সময় কিছুটা বৃদ্ধি পাবে। কেননা প্রতিটি তরঙ্গশীর্ষকে পূর্বের তরঙ্গ শীর্ষের তুলনায় অর্থাৎ স্থির উৎসের তুলনায় কিছুটা বেশি দূরত্ব অতিক্রম করতে হয়। তরঙ্গের গতি দিয়ে তরঙ্গদৈর্ঘ্যকে ভাগ করলে তরঙ্গ শীর্ষগুলোর অন্তর্বর্তী সময় পাওয়া যায়। তাই আমাদের অবস্থান সাপেক্ষে দূরে সরে যেতে থাকা একটি উৎস থেকে সৃষ্ট তরঙ্গসমূহের তরঙ্গদৈর্ঘ্য স্থির উৎসের তুলনায় কিছুটা বৃদ্ধি পাবে। (সুনির্দিষ্টভাবে বলা যায়, তরঙ্গদৈর্ঘ্যের যে ভগ্নাংশ বৃদ্ধি পায় তা তরঙ্গের উৎসের গতিকে তরঙ্গের গতি দ্বারা ভাগ করলে পাওয়া যায়।) একই ভাবে আমাদের অবস্থানের দিকে আসতে থাকা একটি উৎস থেকে সৃষ্ট তরঙ্গসমূহের তরঙ্গদৈর্ঘ্য স্থির উৎসের তুলনায় কিছুটা হ্রাস পাবে। কেননা উৎসের সৃষ্ট তরঙ্গ শীর্ষসমূহের অন্তর্বর্তীকালীন সময়ের চেয়ে গ্রাহক যন্ত্রে আগত তরঙ্গ শীর্ষসমূহের অন্তর্বর্তীসময় কিছুটা হ্রাস পায় এবং প্রতিটি তরঙ্গ শীর্ষ-কে স্থির উৎসের তুলনায় কিছুটা কম দূরত্ব অতিক্রম করতে হয়। ব্যাপারটা ঠিক এমন ঃ একজন ভ্রাম্যমান পর্যটক-সেলসম্যানকে ভ্রমণের সময়ে প্রতি সপ্তাহে নিয়মিতভাবে একটি করে চিঠি বাড়িতে পোষ্ট করতে হয়। যখন সে বাড়ি থেকে দূরে যেতে থাকে তখন প্রত্যেক ক্রমাগত পত্রকে (Successive Letter) আগের চিঠির তুলনায় কিছু বেশি দূরত্ব ভ্রমণ করতে হয়। ফলে তাকে বাড়িতে পৌছতে আগেরটির তুলনায় কিছু সময় বেশি লাগে। আবার ঐ সেলসম্যান যখন বাড়ির দিকে যাত্রা শুরু করে, তখন প্রত্যেক ক্রমাগত চিঠিকে আগের সপ্তাহের চিঠির তুলনায় কিছু কম দূরত্ব অতিক্রম করতে হয়। তাই প্রতি সপ্তাহে একবারের চেয়ে বেশি চিঠি আসতে থাকবে।

আজকাল শব্দ তরঙ্গে ডপলার প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করা বেশ সহজ। রাস্তায় দ্রুত চলমান কোন গাড়ি যখন আমাদের দিকে আসতে থাকে, তখন এর হর্ণের শব্দ আমাদের কাছ থেকে দূরে চলে যেতে থাকা গাড়ির হর্ণের শব্দের তুলনায় তীব্র হয়। শব্দ তীব্র হওয়ার মানে শব্দ তরঙ্গের তরঙ্গদৈর্ঘ্য কম হওয়া। ১৮৪২ সালে প্রাগের রিয়েলস্যুলেতে (Realschule) গণিতের অধ্যাপক জোহান ক্রিষ্টিয়ান ডপলার (Johann Christian Doppler) আলো ও শব্দ তরঙ্গের ক্ষেত্রে এই প্রক্রিয়া (Effect) সর্বপ্রথম পর্যবেক্ষণ করেন। ডাচ আবহাওয়াবিদ ক্রিষ্টোফার

হেইনরিখ ডিয়েটরিখ ও বাইস-ব্যালট (Christopher Heinrich Dietrich and Buys-Ballot) ১৯৪৫ সালে একটি পরীক্ষার মাধ্যমে শব্দ তরঙ্গের ক্ষেত্রে ডপলার প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করেন। রেলসড়কে চলমান একটি খোলা গাড়িতে স্থাপিত ট্র্যামপেটের অর্কেষ্টা থেকে সৃষ্ট শব্দকে তিনি চলমান শব্দের উৎস হিসেবে ব্যবহার করেন। ট্র্যামপেটের শব্দ সৃষ্টি হতে থাকা এই গাড়িটি উটরেখট (Utrecht)-এর কাছাকাছি হল্যান্ডের গ্রামের একটি রেললাইন দিয়ে চলছিল।

ডপলার ভেবেছিলেন যে এই প্রক্রিয়া (ডপলার প্রক্রিয়া) হয়তো বা নক্ষত্রের বিভিন্ন রঙের বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে পারবে। যে সব নক্ষত্র পৃথিবী থেকে দূরে সরে যাচ্ছে সেগুলো থেকে আগত আলো দীর্ঘতর তরঙ্গদৈর্ঘ্যের দিকে সরে যাবে এবং যেহেতু দৃশ্যমান আলোর গড় তরঙ্গদৈর্ঘ্য থেকে লাল আলোর দীর্ঘতর তরঙ্গদৈর্ঘ্য রয়েছে তাই এই ধরনের নক্ষত্রগুলো গড়ের চেয়ে অধিকতর লাল দেখাবে। একই ভাবে যে সকল নক্ষত্র পৃথিবীর দিকে আসছে, সেগুলো থেকে আগত আলো ক্ষুদ্রতর তরঙ্গদৈর্ঘ্যের দিকে সরে যাবে। ফলে এসব নক্ষত্রকে গড়ের চেয়ে বেশি নীল দেখাবে। কিন্তু বাইস-ব্যালট এবং অন্যরা অল্প সময়ের মধ্যেই দেখালেন যে একটি নক্ষত্রের রং এর বিষয়টি অনিবার্যভাবেই ডপলার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যায় না। যদিও এটা সত্য যে দূরে সরে যেতে থাকা একটি নক্ষত্র থেকে আগত নীল আলো লালের দিকে সরে যায়, কিন্তু একই সঙ্গে নক্ষত্রের সাধারণ অদৃশ্য অতিবেগুনি রশ্মির একাংশ দৃশ্যমান রশ্মির নীল অংশে সরে যায়। ফলে নক্ষত্রের সার্বিক রং খুব কম ক্ষেত্রেই পরিবর্তিত হয়। নক্ষত্রের রং বিভিন্ন হবার প্রধান কারণ হলো তাদের পৃষ্ঠের তাপমাত্রার বিভিন্নতা।

যা হোক ১৮৬৮ সালে ডপলার প্রক্রিয়াকে যখন স্বতন্ত্র বা একক আলোকরশ্মি (Individual Spectral Lines) পর্যবেক্ষণে ব্যবহার করা হলো তখন থেকে ডপলার প্রক্রিয়া জ্যোতির্বিদ্যায় অপরিসীম গুরুত্ব পেতে লাগলো। এর আগে ১৮১৪-১৫ সালে মিউনিখের চশমা বিক্রেতা জোসেফ ফ্রাউন হোফার (Joséph Frauenhofer) আবিষ্কার করেছিলেন যে, সূর্য থেকে আগত আলো-কে যখন একটি সরু ছিদ্রপথে (Slit) প্রবেশ করিয়ে তারপর তা একটি কাচের প্রিজমের মধ্যদিয়ে অতিক্রম করানো হয়, তখন দেখা যায় যে, রঙের বর্ণালী (Spectrum of Colours) শত শত কালো রেখা দ্বারা দাগাংকিত এবং এদের প্রত্যেকটির বিম্ব (Image) আলো প্রথমে যে সরু ছিদ্রপথ দিয়ে প্রবেশ করেছিল সেই ছিদ্রপথের ছিদ্রের মতো হয়। [এমন কি আরো আগে ১৮০২ সালে উইলিয়াম হাইড ওয়ালষ্টন (William Hyde Wollaston) দ্বারা এই সব রেখা পরিলক্ষিত হয়; তবে তখন সতর্কভাবে পরীক্ষাটি করা হয় নি।] কালো রেখাগুলো সবসময়েই একই রঙে পাওয়া যেতো এবং প্রত্যেকটি রেখা আলোর একটি সুনির্দিষ্ট তরঙ্গদৈর্ঘ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল। চাঁদ এবং উজ্জ্বলতর নক্ষত্রের বর্ণালীর নির্দিষ্ট স্থানগুলোতে ফ্রাউয়েনহোফারও একই ধরনের কালো বর্ণালী রেখা (Dark Spectral Lines) দেখতে পান। শীঘ্রই এটা উপলব্ধি করা গেল যে আলো যখন একটি নক্ষত্রের ভিতরের উত্তপ্ত পৃষ্ঠ থেকে (নক্ষত্রের) বাইরের শীতলতর পৃষ্ঠ অতিক্রম করে, তখন কয়েকটি নির্দিষ্ট তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো নির্বাচিত পরিমাণে বিশোষিত হয় এবং এই কারণেই কালো রেখাগুলো সৃষ্টি হয়। প্রত্যেকটি রেখা এক একটি নির্দিষ্ট রাসায়নিক পদার্থ দ্বারা

বিশোষিত হয়। ফলে এটা নির্ধারণ করা সম্ভব হয় যে, সূর্যের উপাদানসমূহ হলোঃ সোডিয়াম, লোহা, ম্যাগনেসিয়াম, ক্যালসিয়াম এবং ক্রোমিয়াম- যা পৃথিবীতে পাওয়া যায়। [এখন আমরা জানিঃ কালো রেখাগুলোর ঠিক সেই তরঙ্গদৈর্ঘ্য রয়েছে যে তরঙ্গদৈর্ঘ্যে একটি ফোটন এমন সুনির্দিষ্ট শক্তিতে থাকবে যাতে এটা (ফোটন) নিম্নতর শক্তিস্তর থেকে এর একটি উত্তেজিত স্তরে উন্নীত হতে পারে।]

১৮৬৮ সালে স্যার উইলিয়াম হগিনস (Sir William Huggins) দেখাতে সক্ষম হলেন যে, কয়েকটি উজ্জ্বলতর নক্ষত্রের বর্ণালীর কালো রেখাসমূহ সূর্যের মধ্যে তাদের স্বাভাবিক অবস্থানের তুলনায় সামান্য লাল বা নীলের দিকে সরে যায়। তিনি নির্ভুলভাবে একে 'ডপলার সরণ' হিসেবে ব্যাখ্যা করেন, যা পৃথিবী থেকে নক্ষত্রগুলো সরে যাওয়া বা পৃথিবীর দিকে নক্ষত্রগুলো আসতে থাকার কারণেই ঘটে থাকে। যেমন ক্যাপেলা নক্ষত্রের (Capella) বর্ণালীর প্রত্যেকটি কালো রেখার তরঙ্গদৈর্ঘ্য সূর্যের বর্ণালীর প্রত্যেক কালো রেখার তরঙ্গদৈর্ঘ্য থেকে ০.০১ শতাংশ দীর্ঘতর। লালের দিকের এই সরণ এটাই নির্দেশ করে যে, ক্যাপেলা (নক্ষত্র) আমাদের কাছ থেকে আলোর গতির ০.০১ শতাংশ গতিতে অর্থাৎ প্রতি সেকেন্ডে ৩০ কিঃ মিঃ গতিতে দূরে সরে যাচ্ছে। পরবর্তী দশকগুলোতে সৌরজগতের প্রধান বস্তুসমূহ, জোড়া-তারা এবং শনির বলয়ের গতি পরিমাপে 'ডপলার প্রক্রিয়া' ব্যবহার করা হয়েছে।

ডপলার সরণ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে মহাজাগতিক বস্তুর গতি পরিমাপের কৌশলটি সত্যিই নিখুঁত। কারণ বর্ণালীর প্রত্যেকটি রেখার তরঙ্গদৈর্ঘ্য অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে এই পদ্ধতিতে পরিমাপ করা যায়। প্রায়ই দেখা যায় যে, তরঙ্গদৈর্ঘ্যের মান বিভিন্ন ছকে সুনির্দিষ্ট আটটি সংখ্যা পর্যন্ত দেয়া হয়ে থাকে। আলোর উৎসের দূরত্ব থেকেও যা অধিক গুরুত্বপূর্ণ তা হলো রাতের আকাশের বিকিরণের বিপরীতে উৎসের বর্ণালী রেখার পর্যাপ্ত আলো থাকার উপরেই এই কৌশলের নির্ভুলতা নির্ভরশীল।

এই অধ্যায়ের শুরুতে বিভিন্ন নক্ষত্রের যে গতি আমরা উল্লেখ করেছি তা এই ডপলার প্রক্রিয়া ব্যবহারের মাধ্যমেই নিরুপণ করা হয়েছে। নিকটবর্তী নক্ষত্রগুলোর পাশাপাশি দূরত্ব কত তা নিরুপণেও ডপলার প্রক্রিয়া আমাদেরকে সাহায্য করে। যদি আমরা একটি নক্ষত্রের গতির দিক সম্পর্কে কিছুটা অনুমান (Guess) করতে পারি, তাহলে ডপলার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আমরা আমাদের দৃষ্টিরেখা বরাবর এবং দৃষ্টিরেখার লম্ব বরাবর (অর্থাৎ আড়াআড়ি) ঐ নক্ষত্রের গতি বের করতে পারি। তাই ব্রহ্মাণ্ডীয় গোলকের (Celestial sphere) মধ্যে নক্ষত্রটির আপাত গতি পরিমাপের মাধ্যমে আমাদের অবস্থান থেকে এর দূরত্ব নিরূপণ করতে পারি। দৃশ্যমান নক্ষত্রের চেয়ে অনেক বেশি দূরের বস্তুর বর্ণালী পর্যবেক্ষণে জ্যোতির্বিদরা যখন ডপলার প্রক্রিয়া ব্যবহার করতে শুরু করলেন, তখন এটা (ডপলার প্রক্রিয়া) মহাবিশ্ব সৃষ্টিতত্ত্বে গুরুত্ব পেতে লাগলো। ঐ সকল মহাজাগতিক বস্তুর আবিষ্কার সম্পর্কে আমাকে কিছুটা বলতে হবে। তারপর আমি ডপলার প্রক্রিয়ায় ফিরে আসব।

রাতের আকাশের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেই আমরা এই অধ্যায় শুরু করেছিলাম। চাঁদ, গ্রহরাজী ও নক্ষত্ররাজী ছাড়াও আরো দুটো দৃশ্যমান বস্তু রয়েছে, যা মহাবিশ্ব সৃষ্টিতত্ত্বে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। আমি সম্ভবত পূর্বেই তা উল্লেখ করেছি।

এদের মধ্যে একটি এমন দর্শনীয় ও দীপ্তিময় যে একে কখনো কখনো এমন কি শহরের কুয়াশাচ্ছন্ন রাতের আকাশেও দেখতে পাওয়া যায়। এ হলো ব্রহ্মাণ্ডীয় গোলকের (খ গোলক) মধ্যে একটি বিরাট বৃত্তে সারিবদ্ধ আলোর বলয় বা বন্ধনী। প্রাচীন কাল থেকে এটা ছায়াপথ বা আকাশগঙ্গা (Millky Way) নামে পরিচিত। ১৭৫০ সালে টমাস রাইট (Thomas Wright) নামে একজন যন্ত্রপাতি নির্মাতা 'মূলতত্ত্ব বা বিশ্বজগৎ সম্পর্কে নতুন ধারণা' (Original Theory or New Hypothesis of the Universe) নামে একটি উল্লেখযোগ্য বই প্রকাশ করেন। এই বইয়ে তিনি প্রস্তাব করেন যে নক্ষত্রগুলো একটি নির্দিষ্ট পুরুত্বের সমতল ছাদের (Flat Slab) মতো শান পাথর (Grindstone) -এর উপর অবস্থান করে। তবে এই নক্ষত্রগুলো ছাদের সমতলে সকল দিকে ও বিরাট দূরত্বে বিস্তৃত রয়েছে। আমাদের সৌরজগতও এই সমতলে বা ছাদের মধ্যে রয়েছে। তাই যখন আমরা বাইরে ছাদের সমতলের দিকে তাকাই তখন অন্য যে কোন দিকের তুলনায় অনেক বেশি আলো দেখতে পাই। একেই আমরা ছায়াপথ (বা আকাশ গঙ্গা) হিসেবে দেখি।

রাইট এর তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর দীর্ঘ সময় পার হয়ে গেছে। এখন মনে করা হয় যে অনেক নক্ষত্রের সমন্বয়ে গঠিত ছায়াপথ (Milky Way) একটি সমতল চাকতি বা থালার (Flat Disc) মতো। এই চাকতির ব্যাস হলো ৮০,০০০ আলোকবর্ষ এবং এর পুরুত্ব (Thickness) হলো ৬০০০ আলোকবর্ষ। এই চাকতিতে রয়েছে অনেক নক্ষত্রের সমন্বয়ে গঠিত গোলাকার বলয় (Spherical Halo of Stars)। এই বলয়ের ব্যাসার্ধ প্রায় এক লক্ষ আলোকবর্ষ। ছায়াপথের মোট ভর সাধারণত প্রায় দশ হাজার কোটি সূর্যের ভরের সমান বলে হিসাব করা হয়। কিন্তু কোন কোন জ্যোতির্বিদ মনে করেন যে বর্ধিত বলয়ে (In an Extended Halo) এই ভর আরো বেশি হতে পারে। সৌরজগত এই চাকতির (ছায়াপথের) কেন্দ্র থেকে প্রায় ৩০,০০০ আলোকবর্ষ দূরে এবং চাকতির কেন্দ্র থেকে কিছুটা উত্তর দিকে অবস্থিত। এই চাকতিটি প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ২৫০ কি.মি. বেগে ঘূর্ণায়মান এবং এর রয়েছে বিশাল কুন্ডলিত বা পেচানো (Spiral) বাহু। একে যদি আমরা বাইরে থেকে দেখতে পেতাম তবে সব কিছু মিলিয়ে তা হত এক অতি চমৎকার দৃশ্য ! পুরো ব্যবস্থাটিকে (System) সাধারণত এখন বলা হয় ছায়াপথ বা আরো বৃহত্তর দৃষ্টিকোণ থেকে একে 'আমাদের ছায়াপথ' (Our Galaxy) বলা যায়।

ছায়াপথ ব্যতিরেকে রাতের আকাশের অন্যান্য সৃষ্টিতাত্ত্বিক আকর্ষণীয় বস্তুগুলো অনেকটাই অস্পষ্ট। এন্ড্রোমিডা নক্ষত্রমন্ডলে অস্পষ্ট জোড়া দেওয়া (A Hazy Patch) একটি অংশ রয়েছে। এটা সহজে দেখা যায় না। তবে কোথায় তাকাতে হবে তা জানা থাকলে রাতের পরিষ্কার আকাশে একে দেখতে পাওয়া যায়। পারস্যের জ্যোতির্বিদ আবদুর রহমান আল-সুফী (Abdurrahman Al-Sufi) কর্তৃক খৃষ্টপূর্ব ৯৬৪ সালে সংকলিত 'বুক অব ফিক্সড ষ্টারস' শীর্ষক বইয়ে এই বস্তুর প্রথম উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। তিনি একে ছোট মেঘ (Little Cloud) হিসেবে বর্ণনা করেন। টেলিস্কোপ সহজলভ্য হওয়ার পর থেকে আরো অনেক অনেক বর্ধিত বস্তু আবিষ্কৃত হতে থাকে এবং সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে জ্যোতির্বিদরা ধূমকেতু নামক সত্যিকার আকর্ষণীয় বস্তু সন্ধান করতে গিয়ে এগুলো দেখতে পান। ধূমকেতু আবিষ্কারের লক্ষ্যে নয়, বরং সকল বস্তুর একটি সুবিধাজনক তালিকা প্রণয়নের

উদ্দেশ্যে চার্লস মেসিয়ার (Charles Messier) ১৭৮১ সালে নীহারিকা (Nebulae) এবং তারকাগুচ্ছের (Star Clusters) একটি বিখ্যাত তালিকা (ক্যাটালগ) প্রকাশ করেন। জ্যোতির্বিদরা এখনও এই তালিকা উল্লেখিত ১০৩টি বস্তুকে নির্দেশ করার জন্য মেসিয়ার সংখ্যা উল্লেখ করেন- যেমন এন্ড্রোমিডা (Andromeda) নীহারিকা হলো M_{31}, ক্রাব (Crab) নীহারিকা হলো M_1 ইত্যাদি।

এমন কি মেসিয়ার-এর সময়ে এটা স্পষ্ট ছিল যে, এই বর্ধিত বস্তুগুলোর সব কয়টি একই রকমের নয়। কতগুলো স্পষ্টতই প্লিয়াইডস (Pleiades, M_{42}) এর মতো নক্ষত্রের গুচ্ছ। অন্যগুলো অনিয়মিত, উষ্ণ ও উজ্জ্বল গ্যাসের মেঘ যা প্রায়ই রঙিন এবং এক বা একাধিক নক্ষত্রের সাথে যুক্ত, অরিয়ন (Orion) অঞ্চলের বিরাট নীহারিকা M_{42}- এর মতো। এখন আমরা জানি যে, আমাদের নিজস্ব ছায়াপথেই এই দুই ধরনের বস্তু রয়েছে এবং তাদের সম্পর্কে এখানে আর বেশি আলোচনার প্রয়োজন নেই। যা হোক মেসিয়ার তালিকার এক তৃতীয়াংশ বস্তু ছিল অনেকটা নিয়মিত ডিম্বাকৃতির শ্বেত নীহারিকা। তাদের মধ্যে সর্বাধিক দীপ্যমান ছিল এন্ড্রোমিডা নীহারিকা, M_{31}। যখন টেলিস্কোপ আরও উন্নত হলো, এদের মত আরো হাজার হাজার নীহারিকা দেখা গেল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে M_{31}, M_{33} সহ কিছু কিছু নীহারিকার কুন্ডলিত বাহু শনাক্ত হলো। যা হোক, অষ্টাদশ এবং উনবিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে উন্নত মানের টেলিস্কোপ ব্যবহার করেও এটা নিশ্চিত করা সম্ভব হলো না যে, দৃশ্যমান কুন্ডলিত বা ডিম্বাকার বাহুগুলো নক্ষত্র দ্বারা গঠিত নীহারিকা কি না। তাদের প্রকৃতি সম্পর্কে সংশয় থেকেই গেল।

সম্ভবত ইমানুয়েল কান্ট (Immanuel Kant) প্রথম প্রস্তাব করেন যে, নীহারিকাগুলোর কিছু সংখ্যক আমাদের ছায়াপথের মতই। ছায়াপথ সংক্রান্ত রাইট-এর তত্ত্ব ব্যবহার করে ১৭৫৫ সালে কান্ট তার 'বিশ্বজনীন প্রকৃতি ইতিহাস এবং মহাকাশের তত্ত্ব' (Universal Natural History and Theory of the Heavens) নামক বইয়ে প্রস্তাব করেন যে, নীহারিকাসমূহ (বা তাদের প্রজাতির বস্তুসমূহ) হলো বস্তুত আমাদের নিজস্ব ছায়াপথের মতো প্রায় একই আকার ও আয়তনের গোলাকার চাকতি। তাদেরকে উপবৃত্তাকার দেখায়, কেননা তাদের দিকে তির্যকভাবে তাকাতে হয় এবং অবশ্যই তাদেরকে অস্পষ্ট দেখায়; কারণ তারা বহু দূরে অবস্থিত।

মহাবিশ্ব যে আমাদের ছায়াপথের মতো নীহারিকা দ্বারা পূর্ণ এই ধারণা উনিশ শতক শুরুর পূর্ব পর্যন্ত সর্বজনীনভাবে কোন ক্রমেই গ্রহণযোগ্য ছিল না। যা হোক, উন্মুক্ত সম্ভাবনা হিসেবে এই ধারণা বিদ্যমান রইল যে, দৃশ্যমান উপবৃত্তাকার এবং কুন্ডলাকৃতির নীহারিকাগুলো হয়তো বা মেসিয়ার তালিকার বস্তুর মতো শুধু আমাদের নিজস্ব ছায়াপথের মেঘ হিসেবে প্রমাণিত হবে। বিভ্রান্তির একটি বড় উৎস ছিল, কোন কোন কুন্ডলিত নীহারিকায় বিস্ফোরণশীল নক্ষত্র পর্যবেক্ষণ। যদি এসব নীহারিকা সত্যিই স্বতন্ত্র (Independent) ছায়াপথ হয়ে থাকে, তা হলে তা আমাদের কাছ থেকে এতো বেশি দূরে যে এদের মধ্যকার নক্ষত্রসমূহকে পৃথকভাবে দেখা যাবে না। বিস্ফোরণগুলো বিস্ময়কর রকমের শক্তিশালী ও উজ্জ্বল হলেই বিশাল দূরত্ব থেকে তাদেরকে দেখা সম্ভব হয়। এই প্রসঙ্গে আমি উনবিংশ শতাব্দীর একটি

বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের উদাহরণ উদ্ধৃত না করে পারছি না। ১৮৯৩ সালে জ্যোতির্বিদ্যার ইংরেজ ঐতিহাসিক এজনেস মেরি কার্ক (Agnes Mary Clerke) মন্তব্য করেন ঃ

> যে সব নীহারিকা থেকে অবিরাম বর্ণালী নিঃসৃত হচ্ছে, তাদের মধ্যে অধিকতর উল্লেখযোগ্য হলো, এন্ড্রোমিডা মন্ডলের সুপরিচিত নীহারিকা এবং সারমেয় যুগল (Canes Venatici) মন্ডলের বিশাল কুন্ডলাকৃতির নীহারিকা। সাধারণ নিয়মেই এসব নীহারিকা থেকে নিঃসৃত বর্ণালী থেকে বুঝা যায় যে, একই রকমের তারকা-গুচ্ছ (Star-Cluster) অতিরিক্ত দূরত্বের কারণে কুয়াশাচ্ছন্ন বা অস্পষ্ট দেখায়। যা হোক এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা খুবই হঠকারী হবে যে, এগুলো বাস্তবিকই সূর্যের মতো বস্তুর সমাহার। তবে ঐ দুটো নীহারিকায় পঁচিশ বছর পরপর তারকার বিস্ফোরণ এ ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের সম্ভাবনাকে ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করেছে। বাস্তবে এটা নিশ্চিত যে নীহারিকা যত দূরে অবস্থিত, তারা বা নক্ষত্রগুলোও তত দূরেই অবস্থিত। মিঃ প্রকটর -এর যুক্তি অনুযায়ী, নীহারিকাগুলো যদি তারা বা নক্ষত্র দিয়ে গঠিত হয়ে থাকে, তবে অতুলনীয় বিস্তৃত এই নক্ষত্রের আলো দৃশ্যমান হওয়ার জন্য এত অতি উচ্চমাত্রার হবে যা আমাদের কল্পনাকেও হার মানাবে।

এখন আমরা জানি যে, এসব নাক্ষত্রিক বিস্ফোরণ সত্যিকারেই এত উচ্চমানের ছিল যা ভাবতে আমাদের কল্পনাশক্তিও হার মানে। এগুলো ছিল 'সুপারনোভা' (Supernova) বিস্ফোরণ যখন একটি নক্ষত্রের ঔজ্জ্বল্য একটি পুরো গ্যালাক্সীর ঔজ্জ্বল্যের মানে বা পর্যায়ে পৌঁছে। কিন্তু ১৮৯৩ সালের পূর্বে তা জানা যায় নি।

নীহারিকাগুলো কত দূরত্বে অবস্থিত তা একটি নির্ভরযোগ্য পদ্ধতির মাধ্যমে নির্ধারণ ব্যতিরেকে কুন্ডলাকার এবং ডিম্বাকার নীহারিকাগুলোর বৈশিষ্ট্য বা প্রকৃতি কেমন - সেই বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছা সম্ভব হলো না। পরিশেষে লসএঞ্জেলস-এর নিকটবর্তী মাউন্ট উইলসন পাহাড়ে ১০০ ইঞ্চি ব্যাসের একটি টেলিস্কোপ স্থাপনের কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর এমন একটি পরিমাপ যন্ত্র আবিষ্কৃত হলো। এডুইন হাবল (Edwin Hubble) ১৯২৩ সালে প্রথম এই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে সক্ষম হলেন যে, স্বতন্ত্র নক্ষত্র সমন্বয়ে এন্ড্রোমিডা নীহারিকা গঠিত। আমাদের নিজস্ব ছায়াপথে এক শ্রেণীর তারা রয়েছে, যে সব তারার উজ্জ্বলতা একটি পর্যায়ক্রমে বাড়ে কমে অর্থাৎ এদের বিষমতা নিয়মিত। এগুলো শেফালী বিষম তারা (Cepheid Variable) নামে সুপরিচিত। এডুইন হাবল দেখলেন এন্ড্রোমিডা নীহারিকার কুন্ডলিত বাহুতে ঠিক তেমন ধরনের পর্যায়ক্রমিক বিষমতা সম্পন্ন কয়েকটি উজ্জ্বল বিষম তারা রয়েছে। যে কারণে এই বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল তা হলো এই যে, পূর্ববর্তী দশকে হার্ভার্ড কলেজ মানমন্দিরের হেনরিয়েটা সোয়ান লেভিট (Henrietta Swan Leavitt) ও হারলো শাপলি (Harlow Shapley) তাদের নিবন্ধে দেখান যে, শেফালী বিষম তারাদের পরম প্রভা ও পর্যায় কালের মধ্যে একটি নিখুঁত সম্পর্ক রয়েছে। [পরম প্রভা হলো একটি জ্যোতিঃশাস্ত্রীয় বস্তু (Astronomical Body) থেকে সবদিকে বিকীর্ণ মোট শক্তি। আপাত প্রভা হলো আমাদের টেলিস্কোপের আয়নার প্রতি বর্গ সেন্টিমিটার পরিমাণ স্থানে গৃহীত বিকিরণ শক্তি। একটি জ্যোতিঃশাস্ত্রীয় বস্তুর উজ্জ্বলতার মান পরম প্রভার চাইতে আপাত প্রভার উপরে বেশি নির্ভর করে। আপাত প্রভা অবশ্যই শুধু পরম প্রভার উপর নির্ভর করে না, দূরত্বের উপরেও নির্ভর করে। এভাবে একটি জ্যোতিঃশাস্ত্রীয় বস্তুর পরম প্রভা ও আপাত প্রভা জেনে আমরা এর দূরত্ব বের করতে পারি।] এন্ড্রোমিডা নীহারিকার বিষমতাগুলোর আপাত প্রভা পর্যবেক্ষণ করে এবং তাদের পর্যায়কাল থেকে পরম প্রভা বের করে হাবল ঐ নক্ষত্রগুলো তথা এন্ড্রোমিডা নীহারিকার দূরত্ব নিরূপণ করতে পারলেন। এক্ষেত্রে যে সহজ বিধিটি প্রয়োগ করা

হয় তা হলো আপাত প্রভা পরম প্রভার আনুপাতিক, কিন্তু আপাত প্রভা দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক। তার সিদ্ধান্ত ছিল যে, এন্ড্রোমিডা (নীহারিকা) নয় লক্ষ আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত। এই দূরত্ব আমাদের নিজস্ব ছায়াপথের দূরতম নক্ষত্রটির চেয়ে দশগুণ বেশি। পরবর্তীতে ওয়ালটার বাডে (Walter Baade) এবং অন্যরা পর্যায়কাল-প্রভা সম্পর্ক একাধিকবার পুনর্মাপনের মাধ্যমে এন্ড্রোমিডা নীহারিকার দূরত্ব নিরূপণ করেন। তাতে দেখা যায় যে এন্ড্রোমিডা নীহারিকার আলোকবর্ষ। কিন্তু ১৯২৩ সালে গৃহীত সিদ্ধান্তটি ছিল সুস্পষ্ট এবং সঠিক। সেই সিদ্ধান্তটি হলো, মহাবিশ্ব আমাদের নিজস্ব ছায়াপথের মতো এন্ড্রোমিডা নীহারিকা ও আরো হাজার হাজার নীহারিকা দ্বারা পূর্ণ এবং এই নীহারিকাগুলো সব দিকে ও বিশাল দূরত্বে বিস্তৃত রয়েছে।

পরবর্তী পৃষ্ঠার চিত্রে উজ্জ্বল গ্যালাক্সীসমূহকে তাদের বর্ণালীসহ পাঁচটি স্তবকে দেখানো হয়েছে। গ্যালাক্সীগুলোর বর্ণালী হলো লম্বা, আনুভূমিক সাদা দাগাংকিত এবং এগুলোর কয়েকটি খাট, কালো খাড়া রেখা দ্বারা দাগাংকিত। গ্যালাক্সী থেকে একটি নির্দিষ্ট তরঙ্গদৈর্ঘ্যে আগত আলো প্রত্যেকটি অবস্থানের বর্ণালীকে নির্দেশ করে। গ্যালাক্সীর অভ্যন্তরস্থ তারকাসমূহের আবহাওয়া মন্ডলের বিশোষণের কারণে এই কালো, খাড়া রেখাগুলো সৃষ্টি হয়। প্রত্যেকটি বর্ণালীর নীচের তীরসমূহ সুনির্দিষ্ট দুটি বিশোষণ রেখার (ক্যালসিয়ামের জন্য H এবং K রেখা) সরণ নির্দেশ করে। একে যদি ডপলার প্রক্রিয়ার ফলাফল হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়, তবে এসব বিশোষণ রেখার লালসরণ এই ইংগিত প্রদান করে যে, ভার্গো স্তবক প্রতি সেকেন্ডে ১২০০ কি.মি. বেগে এবং 'হাইড্রা' স্তবক প্রতি সেকেন্ডে ৬১,০০০ কি.মি. বেগে দূরে ছুটে যাচ্ছে। লালসরণকে দূরত্বের আনুপাতিক হিসেবে বিবেচনা করা হলে আমরা এই ইঙ্গিত পাই যে এসব গ্যালাক্সী ক্রমাগতভাবে অধিকতর দূরত্বে অবস্থান করছে। (এখানে হাবল ধ্রুবকের মান প্রতি মিলিয়ন আলোকবর্ষ দূরত্বের জন্য প্রতি সেকেন্ডে ১৫.৩ কিলোমিটার ধরে চিত্রে উল্লিখিত গ্যালাক্সীসমূহের দূরত্ব নির্ণয় করা হয়েছে।) লালসরণ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গ্যালাক্সীসমূহকে ক্রমান্বয়ে যে ক্ষুদ্রতর ও নিস্প্রভতর দেখায় তা লালসরণের উপযুক্ত ব্যাখ্যার যথার্থতাকে নিশ্চিত করে। হেল (Hale) মানমন্দির থেকে এসব ছবি তোলা হয়েছে।

নীহারিকাগুলো আমাদের ছায়াপথের বাইরে অবস্থিত কিনা সে বিষয়ে কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছার আগেই জ্যোতির্বিদরা নীহারিকাগুলোর বর্ণালী থেকে রেখা (লাইন) শনাক্ত করতে সক্ষম হন-ওগুলো ছিল সুপরিচিত পারমাণবিক বর্ণালীর রেখার মতো। যা হোক ১৯১০-২০ সালে লোয়েল মানমন্দিরের ভ্যাস্টো মেলভিন স্লিফার (Vesto Melvin Slipher) আবিষ্কার করেন যে, অনেক নীহারিকার আলো বা বর্ণালীর রেখা সামান্য কিছুটা লাল বা নীলের দিকে সরে যায়। তৎক্ষণাৎ এই সরণকে ডপলার প্রক্রিয়া হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয় এবং বলা হয়, এটা এই ইংগিত দেয় যে, নীহারিকাসমূহ পৃথিবীর কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে বা পৃথিবীর দিকে সরে আসছে। যেমন এন্ড্রোমিডা নীহারিকাকে প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ৩০০ কি.মি. বেগে পৃথিবীর দিকে সরে আসতে দেখা গেল। আবার অধিকতর দূরত্বের ভার্গো (Virgo) মন্ডলের নীহারিকাগুচ্ছকে প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ১০০০ কি.মি. বেগে পৃথিবী থেকে দূরে সরে যেতে দেখা গেল।

CLUSTER NEBULA IN	DISTANCE IN LIGHT YEARS	RED SHIFTS
VIRGO	78,000,000	H+K 1200 km/sec
URSA MAJOR	1,000,000,000	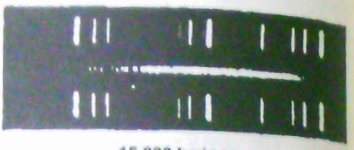 15,000 km/sec
CORONA BOREALIS	1,400,000,000	22,000 km/sec
BOOTES	2,500,000,000	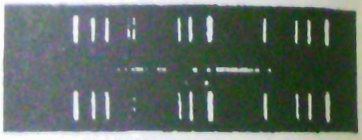 39,000 km/sec
HYDRA	3,960,000,000	61,000 km/sec

প্রথম দিকে মনে করা হয়েছিল এগুলো হয়ত শুধু আপেক্ষিক বেগ। এর মাধ্যমে এটাই প্রতিফলিত হয় যে আমাদের নিজস্ব সৌরজগত কিছু নীহারিকার দিকে ছুটে যাচ্ছে এবং কিছু নীহারিকা থেকে সরে আসছে। কিন্তু পরে যখন সবগুলো বর্ণালীরই লালের দিকে অধিকতর সরণ আবিষ্কৃত হলো তখন এই ব্যাখ্যার আর গ্রহণযোগ্যতা থাকলো না। মনে হচ্ছিল যে, এন্ড্রোমিডা নীহারিকার মতো কিছু কাছের প্রতিবেশী নীহারিকা ছাড়া অন্যান্য নীহারিকাসমূহ সাধারণত আমাদের নিজস্ব ছায়াপথ (গ্যালাক্সী)থেকে দূরে ছুটে যাচ্ছে। অবশ্য এর মাধ্যমে এমনটি বুঝায় না যে আমাদের ছায়াপথের কোন একটি বিশেষ কেন্দ্রীয় অবস্থান রয়েছে, বরং এতে মনে হয় যে মহাবিশ্ব কোন এক ধরনের বিস্ফোরণের মধ্যে রয়েছে যার ফলে প্রত্যেকটি ছায়াপথ অন্যান্য প্রত্যেকটি ছায়াপথ থেকে প্রচন্ড বেগে দূরে ধাবমান।

১৯২৯ সালের পর এই ব্যাখ্যা ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা পায়। কেননা ১৯২৯ সালে হাবল তার আবিষ্কারের কথা ঘোষণা করলেন যে, গ্যালাক্সীসমূহের লালসরণ মোটামুটি আমাদের কাছ থেকে গ্যালাক্সীর দূরত্বের অনুপাতে বৃদ্ধি পায়। এই পর্যবেক্ষণের গুরুত্ব হলোঃ একটি বিস্ফোরিত মহাবিশ্বে বস্তুর গতির ক্ষেত্রে আমরা যুক্তিসঙ্গত ও সহজতম চিত্রের ভবিষ্যদ্বাণী করতে সক্ষম।

স্বাভাবিকভাবেই আমাদের প্রত্যাশা ছিল যে, একটি নির্দিষ্ট সময়ে কোন পর্যবেক্ষক মহাবিশ্বের যে দিকে তাকান না কেন সকল প্রতিনিধিত্বমূলক ছায়াপথকে একই রকম দেখতে পাবেন। (এখানে এবং পরে আমি 'প্রতিনিধিত্বমূলক' বলতে ঐ সব ছায়াপথকে বুঝাবো যাদের বিশেষ ধরনের নিজস্ব ও বৃহৎ গতি নেই এবং যেগুলো শুধু সাধারণ মহাজাগতিক প্রবাহে চলতে থাকে।) এই প্রস্তাব এতই স্বাভাবিক যে (অন্তত কোপারনিকাস এর পর থেকে) ইংরেজ নভোপদার্থবিদ এডওয়ার্ড আর্থার মিলনে (Edward Arthur Milne) একে 'মহাজাগতিক তত্ত্বের সূত্র' (Cosmological Principle) হিসেবে অভিহিত করেন।

ছায়াপথগুলোর মধ্যে 'মহাজাগতিক তত্ত্বের সূত্র' প্রয়োগ করা হলে যেমনটি হওয়া উচিত তা হলো , একজন পর্যবেক্ষক যে ধরনের প্রতিনিধিত্বমূলক ছায়াপথেই অবস্থান করুন না কেন, তিনি অপর সব ছায়াপথকে একই ধরনের গতিতে ছুটতে দেখবেন। এটা হলো 'মহাজাগতিক তত্ত্বের সূত্রের' প্রত্যক্ষ গাণিতিক পরিণতি। এই বিধি অনুযায়ী যে কোন দুটো ছায়াপথের আপেক্ষিক গতি অবশ্যই তাদের মধ্যকার দূরত্বের আনুপাতিক। হাবলও ঠিক এমনটিই দেখতে পেয়েছিলেন।

বিষয়টি বুঝার জন্য ধরা যাক তিনটি ছায়াপথ A, B এবং C একটি সুতায় একই সরল রেখায় টান টান অবস্থায় বাধা রয়েছে। মনে করি A ও B- এর মধ্যকার দূরত্ব B ও C- এর মধ্যকার দূরত্বের সমান। মহাজাগতিক তত্ত্বের সূত্র অনুযায়ী B থেকে A- এর যে গতি পরিলক্ষিত হবে B থেকে C- এরও সেই গতি পরিলক্ষিত হবে। তবে এখানে লক্ষণীয় যে, যেহেতু A থেকে C- এর দূরত্ব B-এর দূরত্বের দ্বিগুণ, তাই B- এর সাপেক্ষে C যে গতিতে চলবে, A-এর সাপেক্ষে তা দ্বিগুণ গতিতে চলবে। আমরা আমাদের মালায় আরো ছায়াপথ যোগ করতে পারি। তাতে সব সময় একই ফলাফল পাবো। অর্থাৎ যে কোন একটি ছায়াপথ থেকে অপর একটি ছায়াপথের সরে যাওয়ার গতি তাদের মধ্যকার দূরত্বের আনুপাতিক হবে।

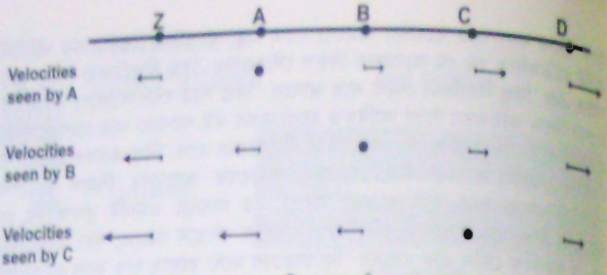

চিত্র ১- সমসত্ত্বতা এবং হাবলের সূত্র : একটি সুতায় বাঁধা এবং সমদূরত্বে অবস্থিত গ্যালাক্সী Z,A,B,C কে উপরের চিত্রে দেখানো হয়েছে। তীর চিহ্নিত রেখার দৈর্ঘ্য এবং দিক দ্বারা A বা B বা C থেকে গ্যালাক্সীগুলোর বেগকে নির্দেশ করা হয়েছে। সমসত্ত্বতার সূত্র অনুযায়ী B থেকে C -এর যে বেগ পরিলক্ষিত হবে, A থেকে B -এরও সেই একই বেগ পরিলক্ষিত হবে। A থেকে C -এর পরিলক্ষিত বেগ হবে B থেকে পরিমাপকৃত C -এর বেগ এবং A থেকে পরিমাপকৃত B -এর বেগের যোগফলের সমান। উপরের চিত্রে অঙ্কিত তীর চিহ্নিত রেখাসমূহে তাই দেখানো হয়েছে। একই পদ্ধতি অনুসরণ করে উপরের চিত্রের যে কোন গ্যালাক্সী থেকে অন্যান্য গ্যালাক্সীর যে কোন বেগই আমরা নির্ণয় করতে পারি। লক্ষণীয় যে বেগগুলো হাবলের সূত্র অনুসরণ করে। অর্থাৎ যে কোন একটি গ্যালাক্সী থেকে অপর যে কোন গ্যালাক্সীর সরে যাওয়ার বেগ তাদের মধ্যকার দূরত্বের সমানুপাতিক। এটাই হলো সমসত্ত্বতার সূত্রের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ বেগের একমাত্র প্যাটার্ন।

এই যুক্তি সামনের দিক বা পিছনের দিক, উভয় ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা যায়। কেননা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রায়ই এমনটি ঘটে। ছায়াপথসমূহের মধ্যকার দূরত্ব এবং তাদের সরে যাবার গতির অনুপাত পর্যবেক্ষণ করে হাবল পরোক্ষভাবে 'মহাজাগতিক তত্ত্বের সূত্র' এর যথার্থতা যাচাই করছিলেন। মহাবিশ্বের যে কোন অংশ অন্য অংশ থেকে বা যে কোন দিক অন্য দিক থেকে কেন পৃথক হবে? সেই প্রশ্নের বিষয়ে মহাজাগতিক তত্ত্বের সূত্র দর্শনগত দিক থেকে যথেষ্ট সন্তোষজনক অভিমত প্রকাশ করে। অবশ্য এটা আমাদেরকে পুনরায় এ নিশ্চয়তা দেয় যে, জ্যোতির্বিদরা ব্যাপক মহাজাগতিক প্রচন্ড ঘূর্ণাবর্তের শুধু একটি স্থানীয় চক্রের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ না করে, তাঁরা (জ্যোতির্বিদরা) বস্তুতপক্ষে মহাবিশ্বের একটি বড় অংশের দিকে তাকাতে চান। অন্যদিকে আমরা মহাজাগতিক তত্ত্বের সূত্রকে অগ্রবর্তী দাবী হিসেবে জোরের সাথেই গ্রহণ করতে পারি এবং দূরত্ব ও বেগের মধ্যে যে আনুপাতিক সম্পর্ক রয়েছে তা নিরূপণ করতে পারি। উপরের অনুচ্ছেদে তাই করা হয়েছে। এভাবে ডপলার সরণ পরিমাপের মাধ্যমে অত্যন্ত দূরবর্তী বস্তুর বেগ নির্ণয় করে তা থেকে আমরা বস্তুর দূরত্ব নিরূপণ করতে পারি। উল্লেখ্য, ডপলার সরণ পরিমাপ তুলনামূলকভাবে সহজ।

ডপলার সরণ পরিমাপ ছাড়াও মহাজাগতিক তত্ত্বের সূত্রের অপর এক ধরনের পর্যবেক্ষণগত সমর্থন রয়েছে। আমাদের নিজস্ব ছায়াপথ এবং নিকটবর্তী ভার্গোমন্ডলের কারণে সৃষ্ট বিক্ষেপের (Distortion) বিষয়টি বাদ দিলে, মহাবিশ্বকে উল্লেখযোগ্যভাবে দিক- নিরপেক্ষ (Isotropic) প্রতীয়মান হয়। অর্থাৎ মহাবিশ্বকে সকল দিক থেকে একই রকম দেখা যায়। (পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচিত মাইক্রোওয়েভ পটভূমি বিকিরণে একে আরো বিশ্বাসযোগ্যভাবে দেখানো হয়েছে।) কিন্তু কোপারনিকাসের পর থেকে 'মহাবিশ্বের কোন এক বিশেষ স্থানে মানব জাতির

অবস্থান'- এমন একটি প্রস্তাবনার বিষয়ে আমরা সতর্ক হয়ে গেছি। অতএব আমাদের চতুর্দিকে মহাবিশ্ব যদি দিক-নিরপেক্ষ হয়ে থাকে তাহলে প্রত্যেকটি প্রতিনিধিত্বমূলক ছায়াপথেও তা দিকনিরপেক্ষ হওয়া উচিত। মহাবিশ্বের ছায়াপথগুলোকে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত কতগুলো গোলক হিসেবে বিবেচনা করা যায়। পরস্পর সম্পর্কযুক্ত দুটো গোলকের কেন্দ্রের চতুর্দিকে ঘূর্ণনের মাধ্যমে একটি গোলকের (বা ছায়াপথের) যে কোন একটি বিন্দুকে অপর গোলকের (বা ছায়াপথের) অন্য যে কোন বিন্দুতে নিয়ে যাওয়া সম্ভব। এভাবে মহাবিশ্বের যে কোন একটি বিন্দুকে (Point) অন্য একটি বিন্দুতে নেয়া যায়। অতএব মহাবিশ্ব যদি সকল বিন্দুতে দিকনিরপেক্ষ হয়, তবে অবশ্যম্ভাবী রূপে তা সমসত্ত্ব হবে।

আরো কিছু বলার আগে 'মহাজাগতিক তত্ত্বের সূত্রের' সাথে এর কয়েকটি বৈশিষ্ট্য যুক্ত করা বাঞ্ছনীয়। প্রথমত ক্ষুদ্রমানদণ্ডে অনিবার্যভাবেই এটা সত্য নয়। আমরা যে ছায়াপথে রয়েছি তা (ছায়াপথ M_{31} ও M_{33} সহ) অন্যান্য ছায়াপথ নিয়ে গঠিত একটি ছোট ও স্থানীয় গুচ্ছের (Cluster) একটি। এই ছায়াপথ গুচ্ছের অবস্থান হলো ছায়াপথের বিরাট গুচ্ছ ভার্গোর (Virgo) কাছে। প্রকৃতপক্ষে মেসিয়ার তালিকার ৩৩ টি ছায়াপথের প্রায় অর্ধেকই রয়েছে ভার্গো মন্ডলে, আকাশের একটি ক্ষুদ্র অংশ জুড়ে। একটি ছায়াপথ গুচ্ছ থেকে আর একটি ছায়াপথ গুচ্ছের যে বিশাল দূরত্ব, কমপক্ষে যদি মহাবিশ্বের ততটুকু দূরত্বের দিকে আমরা তাকাই,তবেই মহাজাগতিক তত্ত্বের সূত্র খাটে। এই দূরত্ব হবে প্রায় দশ কোটি আলোকবর্ষ।

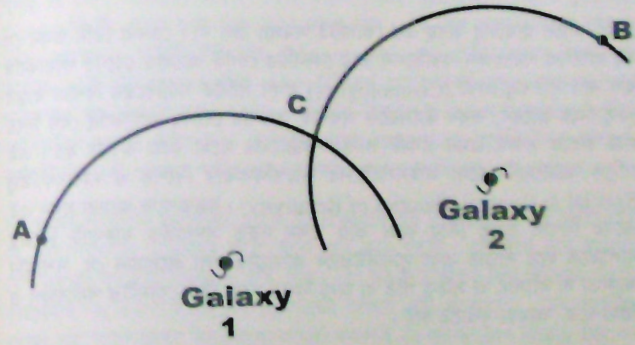

চিত্র ২ - দিকনিরপেক্ষতা এবং সমসত্ত্বতা ঃ মহাবিশ্ব যদি গ্যালাক্সী-১ ও গ্যালাক্সী-২ উভয়ের জন্যই দিকনিরপেক্ষ হয়, তবে তা সমসত্ত্বও হবে। দুটো যাদৃচ্ছিক বিন্দু A এবং B তে অবস্থা যে একই রকম তা দেখানোর জন্য গ্যালাক্সী-১ এর A বিন্দু দিয়ে একটি বৃত্ত এবং গ্যালাক্সী-২ এর B বিন্দু দিয়ে অপর একটি বৃত্ত অংকন করি। এই বৃত্ত দুটো পরস্পরকে C বিন্দুতে ছেদ করেছে। গ্যালাক্সী-১ এর পারিপার্শ্বিক অবস্থা দিকনিরপেক্ষ হতে হলে (গ্যালাক্সী-১ এর উপর অঙ্কিত) A বিন্দু ও C বিন্দুর পারিপার্শ্বিক অবস্থাও অভিন্ন হবে। (C বিন্দু আবার গ্যালাক্সী-২ এর উপরেও অবস্থিত।) একই ভাবে গ্যালাক্সী-২ এর পারিপার্শ্বিক অবস্থা দিকনিরপেক্ষ হতে হলে B এবং C বিন্দুর পারিপার্শ্বিক অবস্থাও দিকনিরপেক্ষ হবে। অতএব A এবং B বিন্দুর পারিপার্শ্বিক অবস্থা অভিন্ন।

আরো একটি সংশোধনী যুক্ত করতে হবে। 'মহাজাগতিক তত্ত্বের সূত্র' ব্যবহার করে নক্ষত্রের গতি ও দূরত্বের আনুপাতিকতা বের করার সময়ে আমরা ধরে নিয়েছিলাম যে, B সাপেক্ষে C- এর বেগ যদি A সাপেক্ষে B-এর বেগের সমান হয়, তাহলে A সাপেক্ষে C- এর বেগ হবে দ্বিগুণ। এটা হলো আমাদের প্রত্যেকের সুপরিচিত একাধিক বেগ যোগ করার সাধারণ পদ্ধতি বা বিধি। আমাদের সাধারণ জীবনে তুলনামূলক দ্রুত বেগের ক্ষেত্রে এই বিধি নিশ্চিতভাবেই কার্যকর। কিন্তু আলোর বেগের কাছাকাছি বেগের ক্ষেত্রে এই বিধি ভেঙ্গে পড়ে। তা না হলে কতগুলো আপেক্ষিক বেগ যোগ করে আমরা এমন এক মোট বেগ পেতাম যা হতো আলোর গতিবেগের (প্রতি সেকেন্ডে তিন লক্ষ কি.মি.) চেয়েও বেশি। আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতার বিশেষ তত্ত্ব (Special Theory of Relativity) তা অনুমোদন করে না। যেমন একাধিক বেগ যোগ করার সাধারণ বিধি অনুযায়ী আলোর বেগের তিন-চতুর্থাংশ বেগে চলমান একটি বিমানের যাত্রী যদি বিমানের গতির দিকে আলোর বেগের তিন-চতুর্থাংশ বেগে একটি বুলেট ছুড়েন তবে ভূমি সাপেক্ষে বুলেটের বেগ হয় আলোর বেগের দেড়গুণ; কিন্তু তা অসম্ভব। একাধিক বেগ যোগ করার এই বিধিকে পরিবর্তন করে বিশেষ আপেক্ষিক তত্ত্ব এই সমস্যা দূর করে। বস্তুতপক্ষে A সাপেক্ষে B-এর বেগ এবং B সাপেক্ষে C-এর বেগ এর সমষ্টি থেকে A সাপেক্ষে C- এর বেগ কিছুটা কম হবে। এর ফলে আলোর বেগের চেয়ে কম যত বেশি সংখ্যক বেগকেই যোগ করি না কেন, কখনও আমরা আলোর বেগের চেয়ে বেশি বেগ পাই না।

১৯২৯ সালে হাবলের কাছে এর কোনটিই সমস্যা ছিল না। কেননা তিনি তখন যে সব ছায়াপথ পর্যবেক্ষণ করছিলেন তার কোনটির বেগই আলোর বেগের কাছাকাছি ছিল না। সৃষ্টিতত্ত্ববিদরা (Cosmologists) যখন সার্বিক মহাবিশ্বের বিশাল বস্তুর দূরত্ব নিয়ে ভাবেন, তখন তাঁদেরকে অবশ্যই আলোর বেগের কাছাকাছি বেগ নিয়ে কাজ করতে সক্ষম এমন একটি তাত্ত্বিক কাঠামোর মধ্যে কাজ করতে হয়। এই তাত্ত্বিক কাঠামোটি হলো আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতার বিশেষ ও সাধারণ তত্ত্ব (Special & General Theories of Relativity)। বস্তুতপক্ষে আমরা যখন এই ধরনের বিশাল দূরত্ব নিয়ে কাজ করি তখন দূরত্ব সম্পর্কিত ধারণাটি নিজেই গোলমেলে হয়ে দাঁড়ায় এবং সুনির্দিষ্টভাবে আমাদের বলা প্রয়োজন যে, দৃশ্যমান উজ্জ্বলতা বা ব্যাসার্ধ বা সঠিক গতি বা অন্য কিছুর মধ্যে ঠিক কোনটির পর্যবেক্ষণ ও পরিমাপকে আমরা বুঝাতে চাই।

১৯২৯ সালের দিকে আবার তাকানো যাক। ছায়াপথগুলোর উজ্জ্বলতম নক্ষত্রের আপাত প্রভা থেকে হাবল ১৮টি ছায়াপথের দূরত্ব নিরুপণ করেন এবং বর্ণালীর ডপলার সরণ থেকে প্রাপ্ত ছায়াপথগুলোর পারস্পরিক (Respective) বেগকে তাঁদের দূরত্বের সাথে তুলনা করেন। তার সিদ্ধান্ত ছিল ঃ বেগ এবং দূরত্বের মধ্যে একটি মোটামুটি সরল আনুপাতিক সম্পর্ক রয়েছে। বস্তুতপক্ষে হাবলের সংগৃহীত উপাত্তের দিকে তাকালে আমাকে ধাঁধার মধ্যে পড়তে হয় যে তিনি কিভাবে এমন একটি সিদ্ধান্তে পৌছলেন। সিদ্ধান্তটি হলো, দূরত্বের সাথে ছায়াপথগুলোর বেগের প্রায় কোন সম্পর্ক নেই বলে প্রতীয়মান হয়। তবে দূরত্ব বাড়ার সাথে সাথে বেগ বাড়ার সামান্য প্রবণতা রয়েছে। আসলেই এই ১৮ টি ছায়াপথের ক্ষেত্রে আমরা বেগ

ও দূরত্বের কোন পরিপাটি আনুপাতিক সম্পর্ক আশা করতে পারি না। কেননা তাদের সব কয়টি বেশ কাছাকাছি দূরত্বে অবস্থিত এবং তাদের কোনটিই ভার্গো গুচ্ছ (Virgo Cluster) থেকে দূরে নয়। এই সিদ্ধান্ত পরিহার করা কঠিন যে, হয়তো উপরে আলোচিত সহজ যুক্তিতর্ক অথবা নিচে বর্ণিত এ সম্পর্কিত তাত্ত্বিক অগ্রগতির ভিত্তিতে হাবল সেই উত্তরটি জেনেছিলেন, যা তিনি জানতেও চেয়েছিলেন।

যা হোক, সম্ভবত ১৯৩১ সালের মধ্যে সাক্ষ্য প্রমাণ ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেলো এবং যে ছায়াপথের বেগ প্রতি সেকেন্ডে ২০,০০০ কি.মি. তাদের বেগ ও দূরত্বের আনুপাতিকতাকে যাচাই করতে হাবল সক্ষম হলেন। তখনকার প্রাক্কলিত দূরত্বের ভিত্তিতে তিনি এই সিদ্ধান্ত নিলেন যে, প্রতি মিলিয়ন আলোকবর্ষ দূরত্বের জন্য বেগ প্রতি সেকেন্ডে ১৭০ কিলোমিটার হারে বৃদ্ধি পায়। এভাবে প্রতি সেকেন্ডে কোন ছায়াপথের বেগ ২০,০০০ কি.মি. - এর অর্থ দাঁড়ালো, ছায়াপথটি ১২০ মিলিয়ন আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত। দূরত্ব বৃদ্ধির সাথে সাথে নির্দিষ্ট বেগ বৃদ্ধির এই যে সংখ্যা এটা সাধারণত হাবল ধ্রুবক নামে পরিচিত। (এই অর্থে এটা ধ্রুবক যে, একটি নির্দিষ্ট সময়ে সবগুলো ছায়াপথের বেগ ও দূরত্বের আনুপাতিকতার সমান। তবে আমরা দেখবো যে, মহাবিশ্বের বিবর্তন ও সময়ের সাথে সাথে হাবল ধ্রুবক পরিবর্তিত হয়।)

১৯৩৬ সালের আগে বর্ণালী বিশেষজ্ঞ মিল্টন হিউমাসন (Milton Humason) -এর সাথে কাজ করার সময় হাবল উরসা মেজর ২ (Ursa Major-II) ছায়াপথ গুচ্ছের দূরত্ব ও বেগ পরিমাপ করতে সক্ষম হলেন। এই ছায়াপথকে প্রতি সেকেন্ডে ৪২০০০ কি.মি. বেগে দূরে সরে যেতে দেখা গেল। এই বেগ হলো আলোর বেগের চৌদ্দ শতাংশ। মাউন্ট উইলসন (Mount Wilson) টেলিস্কোপের তখনকার সর্বোচ্চ পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা ছিল ২৬০ মিলিয়ন আলোকবর্ষ দূরত্ব। হাবল তার পর্যবেক্ষণ বন্ধ করতে বাধ্য হলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পালোমার ও মাউন্ট হ্যামিলটনে বৃহত্তর টেলিস্কোপ স্থাপিত হওয়ার পর অন্যান্য জ্যোতির্বিদরা হাবলের কর্মসূচী অনুযায়ী পুনরায় পর্যবেক্ষণ শুরু করলেন, যা বর্তমানেও চালু রয়েছে।

বিগত অর্ধ শতাব্দীর পর্যবেক্ষণ থেকে সাধারণভাবে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গেল যে, ছায়াপথগুলো আমাদের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। এই দূরে সরে যাওয়ার বেগ তাদের দূরত্বের অনুপাতে বৃদ্ধি পায়। (যে সব ছায়াপথের বেগ আলোর বেগের কাছাকাছি নয় কমপক্ষে সে সব ছায়াপথের বেলায় এটা প্রযোজ্য)। 'মহাজাগতিক তত্ত্বের সূত্র' আলোচনায় ইতোমধ্যে আমরা অবশ্যই যে গুরুত্বারোপ করেছি তার অর্থ এমন নয় যে, আমরা মহাবিশ্বের কোন এক বিশেষ সুবিধা বা অসুবিধা সম্পন্ন অঞ্চলে অবস্থান করছি। প্রত্যেক জোড়া ছায়াপথ তাদের পারস্পরিক দূরত্বের আনুপাতিক আপেক্ষিক বেগে একে অপরের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। হাবলের মূল সিদ্ধান্তসমূহের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনী হলো ছায়াপথ বহির্ভূত দূরত্ব পরিমাপের ক্ষেত্রে মানদন্ডের সংশোধন ও উন্নয়ন। লেভিট ও শাপলী (Leavitt and Shapley) বিষম তারাদের পরম প্রভা ও পর্যায়কালের মধ্যে একটি সম্পর্ক স্থাপন ও নির্ধারণ করেন। ওয়ালটার বাডে (Walter Baade) এবং অন্য বিজ্ঞানীগণ পুনর্মাপন ও পুনর্নির্ধারণ-এর মাধ্যমে এই মানদন্ডের আংশিক সংশোধন করেন।

হাবলের সময়ে দূরের ছায়াপথ গুলোর যে দূরত্ব গণনা করা হয় এখনকার হিসাবে তা ছিল প্রায় দশগুণ বেশি। এভাবে এখন প্রতি মিলিয়ন আলোকবর্ষ দূরত্বের জন্য হাবলের ধ্রুবক প্রতি সেকেন্ডে মাত্র প্রায় পনের কিলোমিটার ধরা হয়।

এসব তথ্য মহাবিশ্বের উৎপত্তি বা সৃষ্টি সম্পর্কে আমাদেরকে কী জ্ঞাত করে? যদি ছায়াপথসমূহ একে অপর থেকে প্রচন্ড বেগে দূরে ছুটে যায়, তবে অতীতের কোন এক সময়ে তারা অবশ্যই নিকটে একত্রিত ছিল। সুনির্দিষ্টভাবে বলা যায়, ছায়াপথসমূহের বেগ যদি অপরিবর্তিত থাকে তাহলে এক জোড়া ছায়াপথ যে সময়ে বর্তমান দূরত্বে পৌছে, তা তাদের মধ্যকার বর্তমান দূরত্বকে তাদের আপেক্ষিক বেগ দিয়ে ভাগ করলে পাওয়া যায়। কিন্তু দুটো ছায়াপথের বর্তমান বেগ যদি দূরত্বের আনুপাতিক হয়, তাহলে যে কোন এক জোড়া ছায়াপথের জন্যই সময় হবে সমান। এছাড়া অতীতের কোন এক সময়ে তারা সকলে অবশ্যই নিকটে বা একত্রিত ছিল। প্রতি মিলিয়ন আলোকবর্ষ দূরত্বের জন্য হাবলের ধ্রুবক (Hubble Constant) যদি প্রতি সেকেন্ডে ১৫ কি.মি. ধরা হয় তাহলে যে সময় থেকে ছায়াপথ গুলো দূরে সরে যেতে শুরু করেছে তা হলো, এক মিলিয়ন আলোকবর্ষ দূরত্বকে প্রতি সেকেন্ডে ১৫ কি.মি. বেগ দিয়ে ভাগ করে যে সময় পাওয়া যায় তার সমান। অর্থাৎ দুই হাজার কোটি বছর। এভাবে গণনাকৃত এই সময়কে আমরা বৈশিষ্ট্যসূচক প্রসারণ সময় (Charecterstic Expansion time) বলবো এবং সরলভাবে এটা হলো হাবল ধ্রুবকের ব্যতিহার (Reciprocal)। মহাবিশ্বের সত্যিকার বয়স বৈশিষ্ট্যসূচক প্রসারণ সময় থেকে প্রকৃত পক্ষে কম। কারণ আমরা দেখবো যে ছায়াপথগুলো স্থির বেগে ছুটছে না, বরং তাদের পারস্পরিক মহাকর্ষ বলের প্রভাবে তাদের চলার বেগ কমে আসে। তাই হাবলের ধ্রুবক প্রতি মিলিয়ন আলোকবর্ষ দূরত্বের জন্য যদি প্রতি সেকেন্ডে ১৫ কি.মি. হয়, তাহলে মহাবিশ্বের বয়স অবশ্যই ২০০০ কোটি বছরের চেয়ে কম হবে।

কখনো কখনো এসব কিছুকে একত্রিত করে সংক্ষেপে আমরা বলি যে মহাবিশ্ব ক্রমবর্ধমান। এটি এমনটি বুঝায় না যে, আবশ্যিকভাবে মহাবিশ্বের একটি নির্দিষ্ট আকার রয়েছে, যদিও তা থাকতে পারে। বিষয়টিকে এভাবে বলা হয়, কেননা যে কোন এক জোড়া প্রতিনিধিত্বমূলক ছায়াপথের মধ্যকার বিচ্ছিন্নতা (দূরত্ব) একটি নির্দিষ্ট সময়ে একই ভগ্নাংশ পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। ছায়াপথগুলোর গতি মোটামুটি অপরিবর্তিত থাকে এমন যে কোন স্বল্প সময়ের জন্য এক জোড়া ছায়াপথের মধ্যে যে দূরত্ব বৃদ্ধি পায় তা হলো, তাদের আপেক্ষিক বেগ ও অতিবাহিত সময়ের গুণফল, অথবা হাবলের সূত্র ব্যবহার করে আমরা তা বের করতে পারি। সেক্ষেত্রে হাবল ধ্রুবক, দূরত্ব ও সময় গুণ করে তা করা হয়। তারপর আগের দূরত্বের তুলনায় কতটুকু দূরত্ব বৃদ্ধি পেল তার অনুপাত ও হাবল ধ্রুবককে অতিবাহিত সময় দিয়ে গুণ করে পাওয়া যায়। যে কোন জোড়া ছায়াপথের ক্ষেত্রেই এই অনুপাত সমান। শতকরা একভাগ সময়ের বিরতিতে প্রত্যেক জোড়া প্রতিনিধিত্বমূলক ছায়াপথের বিচ্ছিন্নতা (পারস্পরিক দূরত্ব) ১% হারে বৃদ্ধি পাবে। বৈশিষ্ট্যসূচক প্রসারণ সময় হলো হাবল ধ্রুবকের ব্যতিহার। তখন আমরা শিথিলভাবে বলি যে, মহাবিশ্বের আকার শতকরা একভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে।

আমি এমন ধারণা দিতে চাই না যে, প্রত্যেকেই লালসরণের এই ব্যাখ্যার সঙ্গে একমত। প্রকৃতপক্ষে আমরা ছায়াপথগুলোকে আমাদের কাছ থেকে দূরে ছুটে যেতে দেখি না। তবে আমরা সকলে এই বিষয়ে নিশ্চিত যে, তাদের (ছায়াপথসমূহের) বর্ণালীর রেখা লালের দিকে অর্থাৎ বৃহত্তর তরঙ্গদৈর্ঘ্যের দিকে সরে যায়। কিছু বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ রয়েছেন যারা ডপলার প্রক্রিয়া বা মহাবিশ্বের প্রসারণের সাথে লালসরণের সম্পর্ক রয়েছে এমন সিদ্ধান্তের বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করেন। হেল মানমন্দিরের হ্যালটন আর্প (Halton Arp) জোর দিয়ে বলেন যে, ছায়াপথগুলো আকাশে গুচ্ছ বা স্তবকে দল বেধে অবস্থান করে; এদের মধ্যে কিছু সংখ্যক ছায়াপথের লালসরণ অন্যদের থেকে বেশ পৃথক। এই সকল গুচ্ছ যদি প্রতিবেশী বা নিকটবর্তী ছায়াপথগুলোর সত্যিই বাস্তব সহাবস্থানের প্রতিনিধিত্ব করে তাহলে সামগ্রিকভাবে তাদের বিভিন্ন বেগ থাকা কঠিন। ১৯৬৩ সালে মার্টিন স্মীডট (Maarten Schmidt) আবিষ্কার করেন যে, নক্ষত্র সদৃশ এক শ্রেণীর বস্তুর বিপুল লালসরণ হয়, কোন কোন ক্ষেত্রে তা ৩০০% এর বেশি। এসব নক্ষত্র সদৃশ বস্তু যদি তাদের লালসরণ নির্দেশিত দূরত্বে থাকে তাহলে তাদেরকে এত উজ্জ্বল হওয়ার জন্য অবশ্যই বিপুল পরিমাণ তেজ বিকিরণ করতে হবে। শেষ পর্যন্ত সত্যিকার বিশাল দূরত্বের ক্ষেত্রে বেগ ও দূরত্বের সম্পর্ক নির্ধারণ করা সহজ নয়।

যাহোক একটি স্বতন্ত্র পদ্ধতির মাধ্যমে এটা নিশ্চিত করা যায় যে, লালসরণের ইংগিত অনুযায়ী ছায়াপথগুলো আসলেই সরে যাচ্ছে। আমরা দেখেছি লালসরণের এই ব্যাখ্যার নিহিতার্থ হলো, মহাবিশ্বের প্রসারণ শুরু হয়েছিল দুই হাজার কোটি বছর থেকে কম আগে কোন এক সময়। অতএব যদি আমরা অন্য কোন সাক্ষ্য থেকে জানতে পারি যে মহাবিশ্বের প্রকৃত বয়স দুই হাজার কোটি বছর বা তার কাছাকাছি কোন সময় -তাহলে এই বিষয়ে আমরা নিশ্চিত হতে পারি। আমাদের ছায়াপথের বয়স যে এক হাজার থেকে দেড় হাজার কোটি বছর তার স্বপক্ষে বস্তুতপক্ষে অনেক সাক্ষ্যই রয়েছে। আমাদের পৃথিবীতে বিভিন্ন তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের (বিশেষ করে ইউরেনিয়াম আইসোটোপ $U\text{-}_{235}$ এবং $U\text{-}_{238}$) তুলনামূলক প্রাচুর্য থেকে মহাবিশ্বের বয়সের এই হিসাব পাওয়া যায়। আবার নক্ষত্রের বিবর্তনের হিসাব থেকেও মহাবিশ্বের বয়সের একই ফলাফল আসে। মৌলের তেজস্ক্রিয়ার হার অথবা নক্ষত্রের বিবর্তনের সাথে নিশ্চিত ভাবেই দূরবর্তী ছায়াপথগুলোর লালসরণের সরাসরি কোন সম্পর্ক নেই। অতএব আমাদের অনুমান সুদৃঢ় যে হাবলের ধ্রুবক থেকে গণনাকৃত মহাবিশ্বের বয়স আসলেই তার সত্যিকার শুরু বা প্রারম্ভের প্রতিনিধিত্ব করে।

এ প্রসঙ্গে এটা স্মরণ করা ঐতিহাসিক দিক থেকে মজার যে ত্রিশ ও চল্লিশের দশকে হাবলের ধ্রুবকের মান অনেক বেশি বলে বিবেচনা করা হতো। তখন এই মান ছিল প্রতি দশ লক্ষ আলোকবর্ষ দূরত্বের জন্য প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ১৭০ কি.মি.। আমাদের আগের যুক্তি অনুযায়ী দশ লক্ষ আলোকবর্ষ দূরত্বকে প্রতি সেকেন্ডে ১৭০ কি.মি. বেগ দিয়ে ভাগ করে মহাবিশ্বের যে বয়স পাওয়া যায় তাহলো প্রায় ২০০ কোটি বছর। মহাকর্ষজনিত কারণে বেগ শ্লথ হওয়ার বিষয়টি যদি বিবেচনায় আনা হয় তখন এই বয়স আরো কমে যায়। কিন্তু লর্ড রাদার ফোর্ড (Lord Ruther Ford) কর্তৃক মৌলের তেজস্ক্রিয়তা পরীক্ষণের পর থেকে এটা ভালভাবেই জানা যায় যে, পৃথিবীর বয়স এর চেয়ে অনেক বেশি। এখন মনে করা হয়, পৃথিবীর বয়স প্রায়

৪৬০ কোটি বছর। পৃথিবীর বয়স তো মহাবিশ্বের বয়সের চেয়ে বেশি হতে পারে না। তাই লালসরণ মহাবিশ্বের বয়স সম্পর্কে আমাদেরকে সত্যিই কোন তথ্য না ব্যাখ্যা দিতে পারে কিনা- সেই বিষয়ে জ্যোতির্বিদরা সন্দেহ পোষণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। ত্রিশ ও চল্লিশের দশকে এই আপাত স্ববিরোধী (Apparent Paradox) তত্ত্ব কয়েকটি অত্যন্ত অভিনব (Ingenious) সৃষ্টিতাত্ত্বিক ধারণার উদ্ভব ঘটায়। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে সম্ভবত স্থিতাবস্থা তত্ত্ব (Steady-State Theory)। হতে পারে যে, পঞ্চাশের দশকে ছায়াপথ বহির্ভূত দূরত্বের মাপনদণ্ড (Scale) দশগুণ বৃদ্ধির মাধ্যমে মহাবিশ্বের বয়স সংক্রান্ত স্ববিরোধিতা দূরীভূত হওয়ার বিষয়টি ছিল মহাবিস্ফোরণ সৃষ্টিতত্ত্বের স্ট্যান্ডার্ড তত্ত্ব হিসেবে আবির্ভূত হওয়ার অপরিহার্য পূর্বশর্ত।

এখানে আমরা মহাবিশ্বের যে চিত্র তৈরি করেছি তা হলো এক ঝাক অপসৃয়মান ছায়াপথের চিত্র। এখন পর্যন্ত আলো আমাদের কাছে তারকাদের একমাত্র দূতের ভূমিকা পালন করেছে এবং ছায়াপথগুলোর দূরত্ব ও বেগ সংক্রান্ত তথ্য বহন করেছে। কিন্তু আদি মহাবিশ্বের অবস্থা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের ; কেননা আমরা দেখবো যে, আলোই ছিল আদি মহাবিশ্ব গঠনকারী প্রধান উপাদান। সাধারণ পদার্থ (Ordinary Matter) শুধু নগণ্য দূষণের (Negligible Contamination) ভূমিকা পালন করছিল। অতএব একটি প্রসারমান মহাবিশ্বে লালসরণকে আলোক তরঙ্গের প্রকৃতি (Behaviour) রূপে আমরা কতটুকু জানলাম, তা যদি পুনরায় বর্ণনা করা হয়, তবে তা পরবর্তীতে আমাদের কাজে লাগবে।

ধরা যাক, একটি আলোক তরঙ্গ দুটো প্রতিনিধিত্বমূলক ছায়াপথের মধ্যে ভ্রমণ করছে। ছায়াপথ দুটোর মধ্যকার দূরত্ব হলো আলোর বেগ ও আলোর ভ্রমণ কালের (যে সময়ে আলো একটি ছায়াপথ থেকে অন্য ছায়াপথে পৌছে সেই সময়) গুণফলের সমান। অথচ আলোক তরঙ্গ ভ্রমণ করার সময়ে ছায়াপথ দুটোর মধ্যকার যে দূরত্ব বৃদ্ধি পায় তা হলো আলোক তরঙ্গের ভ্রমণকাল ও ছায়াপথ দুটোর আপেক্ষিক বেগের গুণফলের সমান।

দুটো গ্যালাক্সীর মধ্যকার দূরত্ববৃদ্ধিকে সেই সময়ে দূরত্ববৃদ্ধির গড়মান দিয়ে ভাগ করে আমরা দুটি গ্যালাক্সীর মধ্যকার দূরত্ববৃদ্ধির ভগ্নাংশ পরিমাপ করি এবং এক্ষেত্রে আলোর ভ্রমণকাল অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। আলোর ভ্রমণকালে দুটো গ্যালাক্সীর মধ্যকার দূরত্ববৃদ্ধির ভগ্নাংশ হলো ঠিক গ্যালাক্সীদ্বয়ের আপেক্ষিক বেগ ও আলোর বেগের অনুপাত (অন্যান্য প্রতিনিধিত্বমূলক গ্যালাক্সীসমূহের জন্যও এটি প্রযোজ্য)। কিন্তু আমরা আগে দেখেছি যে আলোক তরঙ্গের যে কোন যাত্রাপথে এর তরঙ্গদৈর্ঘ্য যে ভগ্নাংশে বৃদ্ধি পায় তা এই একই অনুপাত থেকে পাওয়া যায়। এভাবে মহাবিশ্বের প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে যে কোন একটি আলোক রশ্মির তরঙ্গদৈর্ঘ্য শুধু প্রতিনিধিত্বমূলক ছায়াপথসমূহের দূরত্বের অনুপাতে বৃদ্ধি পায়। আমরা মনে করতে পারি যে মহাবিশ্বের প্রসারণের সাথে সাথে আলোর তরঙ্গ শীর্ষসমূহ পরস্পর থেকে টেনে দূরে এবং আরো দূরে নেয়া হচ্ছে। যদিও আমাদের যুক্তি কড়াকড়িভাবে শুধু স্বল্প সময়ের ভ্রমণের ক্ষেত্রে কার্যকরী থাকবে, তবু এসব যাত্রার ক্রমকে একত্রিত করে আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌছতে পারি যে সাধারণভাবে এটি সত্য। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, যখন আমরা

ছায়াপথ $3C_{295}$ এর দিকে তাকাই এবং দেখি যে আমাদের স্ট্যান্ডার্ড টেবিলের বর্ণালীর তরঙ্গদৈর্ঘ্য থেকে এর তরঙ্গদৈর্ঘ্য ৪৬% বেশি তখন আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছি যে ছায়াপথ $3C_{295}$ থেকে আলোক রশ্মি নিঃসৃত হওয়ার সময়ে মহাবিশ্ব যে আকার বা আয়তনের ছিল বর্তমান আয়তন হবে তার চেয়ে ৪৬% বৃহত্তর।

এ পর্যন্ত আমরা আমাদেরকে শুধু বস্তুসমূহের গতির সাথে সংশ্লিষ্ট রেখেছি। পদার্থবিদরা একে বলেন বিশুদ্ধ গতিবিদ্যা (Kinematics)। যে সব বল বস্তুর গতিকে নিয়ন্ত্রণ করে সে সম্পর্কে কোন বিবেচনা ও বর্ণনা না করে বিশুদ্ধ গতিবিদ্যা শুধু বস্তুর গতি নিয়ে আলোচনা করে। যাই হোক না কেন, বহু শতাব্দী ধরে পদার্থবিদ ও জ্যোতির্বিদরা মহাবিশ্বের গতিবিজ্ঞান অনুধাবন করার চেষ্টা করেছেন। অনিবার্যভাবে এটা মহাকর্ষ বলের সৃষ্টিতাত্ত্বিক ভূমিকা পরীক্ষণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। মহাকর্ষ বলই একমাত্র ক্রিয়াশীল বল যা জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ক বস্তুসমূহের মধ্যে ক্রিয়াশীল রয়েছে।

প্রত্যাশিতভাবে আইজ্যাক নিউটনই (Isaac Newton) এই সমস্যাটি প্রথম অনুধাবন করেছিলেন। ক্যামব্রিজের চিন্তানায়ক রিচার্ড বেন্টলীকে (Richard Bently) লেখা এক বিখ্যাত চিঠিতে নিউটন স্বীকার করেছিলেন যে, যদি মহাবিশ্বের বস্তুসমূহ একটি সীমিত অঞ্চলে সুসমভাবে বিতরিত থাকতো (Distributed) তা হলে সকল বস্তু কেন্দ্রের দিকে পতিত হতে চাইতো এবং একটি বিশাল গোলক ভরে পরিণত হতো। অপরপক্ষে একটি অসীম স্থানে বস্তু যদি সুসমভাবে (Evenly) বিতরিত থাকে তাহলে সকল বস্তু পতিত হওয়ার মত কোন কেন্দ্রবিন্দু থাকবে না। সে ক্ষেত্রে বস্তুসমূহ অসীম সংখ্যক গুচ্ছ বা পিন্ডে (Clump) জড়ো হবে এবং সকল গুচ্ছ (Cluster) মহাবিশ্বে ইতস্তত ছড়ানো (Scattered) থাকবে। নিউটনের প্রস্তাবনা ছিল যে, এমন কি সূর্য ও তারাদের আদি অবস্থা এমনটি হতে পারে।

একটি অসীম মাধ্যমের গতিবিদ্যা (Dynamics of an Infinite Medium) নিয়ে কাজ করা কঠিন বিধায় আপেক্ষিকতার সাধারণ তত্ত্ব (General Relativity) উদ্ভাবন পর্যন্ত এর অধিকতর অগ্রগতি থেমে রইল। এখানে আপেক্ষিকতার সাধারণ তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করার কোন অবকাশ নেই। প্রথম দিকে যা ভাবা হয়েছিল তা না হয়ে সৃষ্টিতত্ত্বের যে কোন ক্ষেত্রে আপেক্ষিকতার সাধারণ তত্ত্ব কম গুরুত্বপূর্ণ হয়ে রইল। এটুকু বলা যথেষ্ট হবে যে, আলবার্ট আইনস্টাইন নন-ইউকিডীয় জ্যামিতির বিদ্যমান গাণিতিক তত্ত্ব ব্যবহার করে মহাকর্ষ বলকে স্থান-কাল বক্রতার অভিক্রিয়া হিসেবে ব্যাখ্যা করেন। আপেক্ষিকতার সাধারণ তত্ত্ব (General Theory of relativity) সমাপ্ত করার এক বছর পর, ১৯১৭ সালে আইনস্টাইন তার সমীকরণসমূহে এমন সমাধান খুঁজে পাবার প্রচেষ্টা চালান যা সম্পূর্ণ মহাবিশ্বের স্থান-কাল জ্যামিতিকে বর্ণনা করতে পারে। সেই সময়ে প্রচলিত সৃষ্টিতাত্ত্বিক ধারণাসমূহকে অনুসরণ করে আইনস্টাইন সুনির্দিষ্টভাবে এমন একটি সমাধান খুঁজছিলেন যাতে মহাবিশ্ব হবে সমসত্ত্ব, দিক-নিরপেক্ষ এবং দৃঢ়ভাবে স্থির। যা হোক এমন কোন সমাধান খুঁজে পাওয়া গেল না। এই সকল সৃষ্টিতাত্ত্বিক পূর্বকল্পনার (Cosmological Pre-supposition) সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি মহাবিশ্বের মডেল পাওয়ার জন্য আইনস্টাইন তার সমীকরণে তথাকথিত সৃষ্টিতাত্ত্বিক ধ্রুবক যুক্ত করতে

বাধ্য হন। এটা তার আদি বা মূল তত্ত্বের আভিজাত্যকে বহুলাংশে খর্ব করেছিল। বিশাল দূরত্বে মহাকর্ষ বলের আকর্ষণের ভারসাম্য রক্ষা করার লক্ষ্যে এই সৃষ্টিতাত্ত্বিক ধ্রুবক প্রবর্তন করা হয়।

আইনস্টাইনের মডেলে মহাবিশ্ব ছিল স্থির এবং তাতে লালসরণের কোন ভবিষ্যদ্বাণী ছিল না। একই বছরে অর্থাৎ ১৯১৭ সালে ডাচ জ্যোতির্বিদ ডব্লিউ.ডি.সিটার (W.De. Sitter) আইনস্টাইনের সংশোধিত তত্ত্বের অপর একটি সমাধান বের করেন। যদিও এই তত্ত্বে মহাবিশ্ব স্থির বলেই প্রতীয়মান হচ্ছিল এবং তাই তা তখনকার সৃষ্টিতাত্ত্বিক ধারণা অনুযায়ী গ্রহণযোগ্য ছিল। কিন্তু এই তত্ত্বের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, দূরত্বের সাথে আনুপাতিক হারে লালসরণ রয়েছে- সেই সম্পর্কে এটি একটি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল। নীহারিকার যে বৃহৎ লালসরণ রয়েছে সেই বিষয়টি ইউরোপীয় জ্যোতির্বিদদের নিকট তখনও অজানা ছিল। যা হোক প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর বড় রকমের লালসরণ দৃশ্যমান হবার সংবাদটি আমেরিকা থেকে ইউরোপে গিয়ে পৌঁছলো এবং ডি, সিটার এর মডেল তাৎক্ষণিকভাবে খ্যাতি ও সম্মান অর্জন করলো। বস্তুতপক্ষে ইংরেজ নভোবিজ্ঞানী আর্থার এডিংটন (Arthur Eddington) আপেক্ষিকতার সাধারণ তত্ত্ব সম্পর্কে ১৯২২ সালে যখন প্রথম সমন্বিত গবেষণামূলক আলোচনা গ্রন্থ প্রকাশ করেন, তখন তিনি বিদ্যমান লালসরণ উপাত্তকে ডি, সিটার মডেল রূপে বিশ্লেষণ করেন। হাবল নিজেই বলেছিলেন যে, ডি, সিটার মডেলই দূরত্বের উপর লালসরণের গুরুত্বের বিষয়ে জ্যোতির্বিদদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। ১৯২৯ সালে হাবল যখন লালসরণের সাথে দূরত্বের আনুপাতিকতা আবিষ্কার করেন, তখন তার মনের গভীরে হয়তো ডি, সিটারের মডেল কাজ করে থাকবে।

ডি, সিটারের মডেল এর উপর এই গুরুত্ব প্রদানের বিষয়টি এখন ভ্রমাত্মক (Misplaced) বলে প্রতীয়মান হয়। একটি কারণে প্রকৃতপক্ষে এটি মোটেই স্থির মডেল নয়। একে স্থির দেখাচ্ছিল কারণ এতে স্পেস বা স্থান সংক্রান্ত স্বতন্ত্র (Peculiar) রাশি প্রবর্তন করা হয়েছিল। কিন্তু এই মডেলে প্রতিনিধিত্বমূলক দর্শকদের মধ্যকার দূরত্ব সময়ের সাথে সাথে প্রকৃতপক্ষে বৃদ্ধি পেত এবং এটাই হলো সেই সাধারণ অপসরণ (Recesion) যা লালসরণ সৃষ্টি করে। ডি, সিটার এর মডেলে লালসরণ যেহেতু দূরত্বের আনুপাতিক হয়ে থাকে তাই এই মডেল 'মহাজাগতিক তত্ত্বের সূত্র' মেনে চলে। মহাজাগতিক তত্ত্বের সূত্র মেনে চলা যে কোন তত্ত্বে (Theory) আপেক্ষিক বেগ এবং দূরত্বের মধ্যে আমরা একটি আনুপাতিকতা প্রত্যাশা করি।

যে সব সৃষ্টিতাত্ত্বিক মডেলে মহাবিশ্ব সমসত্ত্ব ও দিক-নিরপেক্ষ, কিন্তু স্থির নয় বলা হয়েছে- ঐ সব মডেলের ক্ষেত্রে দূরবর্তী গ্যালাক্সীসমূহের অপসরণের এই আবিষ্কার (তা যে কোন হারেই হোক না কেন) দ্রুত যথেষ্ট আকর্ষণ বা উদ্দীপনা সৃষ্টি করলো। মহাকর্ষ বলের ক্ষেত্র সমীকরণগুলোতে তখন আর একটি সৃষ্টিতাত্ত্বিক ধ্রুবকের (Cosmological Constant) প্রয়োজন রইলো না। মূল সমীকরণসমূহে এই সৃষ্টিতাত্ত্বিক ধ্রুবক প্রবর্তন করে আইনস্টাইন যে পরিবর্তন এনেছিলেন সে জন্য পরবর্তীতে তিনি দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন। ১৯২২ সালে রাশিয়ান গণিতবিদ

আলেকজান্ডার ফ্রিডম্যান (Alexandre Friedmann) আইনস্টাইনের আদি বা মূল সমীকরণগুলো সমাধান করলেন, যাতে মহাবিশ্বকে সমসত্ত্ব (Homogenous) ও দিক-নিরপেক্ষ (Isotropic) দেখানো হয়েছে। আইনস্টাইনের সৃষ্টিতাত্ত্বিক ধ্রুবক সংবলিত সংশোধিত ক্ষেত্র সমীকরণ ভিত্তিক মডেল নয় বা ডি. সিটারের মডেলও নয়। বরং আইনস্টাইনের আদি বা মূল ক্ষেত্র সমীকরণের ভিত্তিতে প্রণীত ফ্রিডম্যানের মডেলগুলোই অধিকাংশ আধুনিক সৃষ্টিতাত্ত্বিক তত্ত্বের গাণিতিক পটভূমি তৈরি করেছে।

ফ্রিডম্যানের মডেলগুলো হলো দুটো ভিন্ন ধরণ বা প্রকৃতির। মহাবিশ্বের বস্তুর গড় ঘনত্ব যদি একটি নির্দিষ্ট ক্রান্তিক মানের কম হয় বা সমান হয় তাহলে স্থানের দিক থেকে মহাবিশ্ব হবে অসীম। সেক্ষেত্রে মহাবিশ্বের বর্তমান প্রসারণ চিরকাল চলতে থাকবে। অপর পক্ষে মহাবিশ্বের বস্তুর গড় ঘনত্ব যদি এই ক্রান্তিক মানের চেয়ে বেশি হয় তাহলে বস্তু যে মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র তৈরি করবে তা মহাবিশ্বকে তার নিজের দিকে (গোল করে) বাঁকিয়ে দিবে। এতে মহাবিশ্ব হবে সসীম, যদিও এর স্থানের কোন সীমারেখা নেই - একটি গোলকের পৃষ্ঠের মতো (অর্থাৎ যদি আমরা একটি সরল রেখা বরাবর যাত্রা শুরু করি তবে আমরা মহাবিশ্বের কোন ধার কিংবা কিনারায় গিয়ে পৌঁছি না, বরং শুধু সেখানেই এসে পৌঁছি যেখান থেকে যাত্রা শুরু করেছিলাম)। এক্ষেত্রে মহাকর্ষ বলের ক্ষেত্রসমূহ এতো শক্তিশালী হবে যে এগুলো শেষ পর্যন্ত মহাবিশ্বের প্রসারণ বন্ধ করবে। এর পরিণতিতে মহাবিশ্ব অনির্দিষ্ট বিশাল ঘনত্ব প্রাপ্ত হবে এবং পুনরায় তাতে বিস্ফোরণ ঘটবে। ক্রান্তিক ঘনত্বের মান হলো হাবল ধ্রুবকের বর্গের আনুপাতিক। হাবল ধ্রুবকের বর্তমান গ্রহণযোগ্য মান হলো প্রতি মিলিয়ন আলোকবর্ষ দূরত্বের জন্য প্রতি সেকেন্ডে ১৫ কি.মি.। এই হিসাবে মহাবিশ্বের ক্রান্তিক ঘনত্ব হলো প্রতি ঘন সেন্টিমিটার আয়তনে ৫×১০^{-৩০} গ্রাম। বা প্রতি এক হাজার লিটার আয়তনের স্থানে প্রায় তিনটি হাইড্রোজেন কণিকা।

ফ্রিডম্যান মডেলে একটি প্রতিনিধিত্বমূলক গ্যালাক্সীর গতি হলো সুনির্দিষ্টভাবে ভূপৃষ্ঠ থেকে একটি পাথরের খন্ড উপরের দিকে ছুঁড়ে মারা বা নিক্ষেপ করার মতো। পাথর খন্ডটিকে যদি প্রচন্ড শক্তিতে উপরের দিকে নিক্ষেপ করা হয় বা পৃথিবীর ভর যদি বেশ কম হয় (যা প্রায় একই ধরনের অর্থ বহন করে), তা হলে পাথর খন্ডের গতিবেগ ধীরে ধীরে বা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেতে থাকবে; তথাপি পাথর খন্ডটি অসীমের দিকে যেতে থাকবে। মহাবিশ্বের ঘনত্বের মান যদি ক্রান্তিক ঘনত্বের মানের চেয়ে কম হয় তাহলে এমনটি ঘটবে। অপরপক্ষে পাথর খন্ডটিকে যদি অপর্যাপ্ত গতিতে উপরের দিকে নিক্ষেপ করা হয়, তাহলে তা একটি সর্বোচ্চ উচ্চতায় উঠবে এবং তারপর তা নিচের দিকে নেমে আসবে। মহাবিশ্বের ঘনত্ব যদি ক্রান্তিক ঘনত্বের মানের চেয়ে বেশি হয় সেক্ষেত্রে অবশ্যই এমনটি ঘটবে।

এই সাদৃশ্য বা মিলই (Analogy) একটি পরিচ্ছন্ন ধারণা দেয় যে আইনস্টাইনের সমীকরণসমূহ থেকে কেন স্থির মহাবিশ্বের সমাধান পাওয়া সম্ভব নয়। ভূপৃষ্ঠ থেকে ছুঁড়ে দেওয়া একটি পাথর খন্ড উপরে উঠছে বা নিচে নামছে - এমন দৃশ্য দেখে আমরা তেমন বিস্মিত হই না। তবে আমরা এমনটি কখনও প্রত্যাশা করি না যে এই পাথর খন্ডটি মধ্য আকাশে এখনও ঝুলে রয়েছে। এই সাদৃশ্য বা মিলই প্রসারমাণ

মহাবিশ্ব সম্পর্কে আমাদেরকে একটি ভুল ধারণা পরিহার করতে সাহায্য করে। কোন রহস্যময় বলের ধাক্কা দেয়ার কারণে গ্যালাক্সীগুলোর একটি থেকে অপরটি দূরে ছুটে যাচ্ছে না; যেমন আমাদের উপরে বর্ণিত উদাহরণে নিক্ষিপ্ত পাথর খন্ডকে পৃথিবী তাড়িয়ে দিচ্ছে না। বরং অতীতে কোন এক ধরনের বিস্ফোরণের মাধ্যমে গ্যালাক্সীসমূহকে পরস্পর থেকে দূরে নিক্ষেপ করা হয়েছিল বলেই তারা একে অপরের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে।

১৯২০-এর দশকে অনুধাবন করা যায় নি ; কিন্তু আপেক্ষিকতার সাধারণ তত্ত্বের কোন সাহায্য (Reference) ছাড়াই এই সাদৃশ্য ব্যবহার করে ফ্রিডম্যান মডেলের বিস্তারিত ধর্মের অনেকগুলোই হিসাব করে পরিমাণগতভাবে নিরুপণ করা যায়। আমাদের নিজস্ব গ্যালাক্সীর সাপেক্ষে অন্য যে কোন একটি প্রতিনিধিত্বমূলক গ্যালাক্সীর গতি নিরুপণ করার জন্য একটি গোলক (Sphere) অংকন করি এবং ধরে নিই যে আমাদের (নিজস্ব) গ্যালাক্সী গোলকের কেন্দ্রে রয়েছে আর প্রতিনিধিত্বমূলক গ্যালাক্সীটি রয়েছে এর পৃষ্ঠে (Surface)। পৃষ্ঠের এই গ্যালাক্সীর গতি নির্ভর করবে সুনির্দিষ্টভাবে গোলকের অভ্যন্তরের বস্তু সমষ্টি দিয়ে গঠিত মহাবিশ্বের ভরের উপর এবং এই গোলকের বাইরের বস্তুর উপর এই গতি নির্ভর করবে না। এই বিষয়টিকে অন্যভাবেও বলা যায়। যদি ভূপৃষ্ঠে আমরা একটি গুহা খনন করে পড়ন্ত বস্তুর পতন পর্যবেক্ষণ করি তাহলে দেখবো যে গুহার তলদেশ থেকে এর বাইরে কি পরিমাণ বস্তু রয়েছে তা অপেক্ষা শুধু ঐ স্থান গুহার তলদেশ থেকে ভূকেন্দ্র পর্যন্ত বস্তুর পরিমাণের উপরই ভূকেন্দ্রের দিকে মাধ্যাকর্ষণ জনিত ত্বরণ নির্ভর করে। পরবর্তী উদাহরণের গুহার তলদেশ হলো পূর্ববর্তী উদাহরণের গোলকের পৃষ্ঠদেশের মতো। নিউটন এবং আইনস্টাইন উভয়ের মহাকর্ষ তত্ত্বের একটি উপপাদ্যে এই গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল নিহিত রয়েছে। যে ব্যবস্থাটি (System) পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে তার গোলকীয় বিভিন্ন অংশের মধ্যে সামঞ্জস্য বা ভারসাম্যের উপরই মহাকর্ষ বল নির্ভর করে। আমেরিকান গণিতবিদ জি ডি বার্কহফ (G.D. Birkhoff) ১৯২৩ সালে আপেক্ষিকতার সাধারণ তত্ত্বের (General Relativistic Verson) আলোকে এই উপপাদ্য প্রমাণ করেন। কিন্তু পরবর্তী কয়েক দশক পর্যন্ত এর সৃষ্টিতাত্ত্বিক তাৎপর্য অনুধাবন করা যায় নি।

এই উপপাদ্য প্রয়োগ করে আমরা ফ্রিডম্যান মডেলের মহাবিশ্বের ক্রান্তিক ঘনত্ব বের করতে পারি। যখন আমরা এমন একটি গোলক অংকন করি যার কেন্দ্রে রয়েছে আমাদের গ্যালাক্সী এবং দূরবর্তী কতগুলো গ্যালাক্সী থাকে এর পৃষ্ঠদেশে তখন গোলকের অভ্যন্তরস্থ গ্যালাক্সীসমূহের ভরকে একটি নিষ্ক্রমণ বেগ (Escape Velocity) নিরুপণ করার জন্য ব্যবহার করতে পারি। নিষ্ক্রমণ বেগ বলতে এমন একটি বেগ বুঝায় যে বেগ থাকলে গোলকপৃষ্ঠের একটি গ্যালাক্সী ঠিক অসীমের দিকে পালাতে সক্ষম হবে। বুঝা যায় যে,এই নিষ্ক্রমণ বেগ গোলকের ব্যাসার্ধের আনুপাতিক। এই গোলকের ভর যত বেশি হবে একটি গ্যালাক্সীকে অসীমে পালাতে হলে অবশ্যই তত অধিকতর বেগে ছুটতে হবে। কিন্তু হাবলের সূত্র থেকে আমরা জানতে পারি যে, গোলক পৃষ্ঠের একটি গ্যালাক্সীর প্রকৃত বেগ গোলকের ব্যাসার্ধেরও আনুপাতিক অর্থাৎ গোলকের কেন্দ্রস্থল আমাদের গ্যালাক্সী থেকে গোলকের পৃষ্ঠের

গ্যালাক্সী পর্যন্ত দূরত্বের সমানুপাতিক। এভাবে নিষ্ক্রমণ বেগ গোলকের ব্যাসার্ধের উপর নির্ভরশীল হলেও গ্যালাক্সীর প্রকৃত ও তার নিষ্ক্রমণ বেগের অনুপাত গোলকের আকারের উপর নির্ভর করে না। এটা সকল গ্যালাক্সীর জন্য সমান এবং যে গ্যালাক্সীকেই গোলকের কেন্দ্র হিসেবে ধরি না কেন সকল ক্ষেত্রেই তা অভিন্ন। প্রত্যেকটি গ্যালাক্সী হাবলের সূত্র মেনে চলে এবং প্রত্যেকটি গ্যালাক্সীর বেগ নিষ্ক্রমণ বেগ অতিক্রম করে তা অসীমে হারিয়ে যাবে, নাকি তার (প্রত্যেকটি গ্যালাক্সীর) বেগ নিষ্ক্রমণ বেগের চেয়ে কম হওয়ার কারণে ভবিষ্যতে কোন এক সময়ে তা আমাদের গ্যালাক্সীতে ফিরে আসবে (বা পতিত হবে) তা নির্ভর করবে হাবল ধ্রুবক ও মহাবিশ্বের ঘনত্বের (Cosmic Density) মানের উপর। সহজভাবে বলা যায়,ক্রান্তিক ঘনত্ব হলো মহাবিশ্বের ঘনত্বের সেই মানের সমান, যে মান হলে প্রত্যেকটি গ্যালাক্সীর নিষ্ক্রমণ বেগ হাবলের সূত্র অনুযায়ী প্রাপ্ত বেগের সমান হয়। ক্রান্তিক ঘনত্ব শুধু হাবল ধ্রুবকের উপর নির্ভর করতে পারে। বস্তুত ক্রান্তিক ঘনত্ব হলো সরলভাবে (Simply) হাবল ধ্রুবকের বর্গের আনুপাতিক।

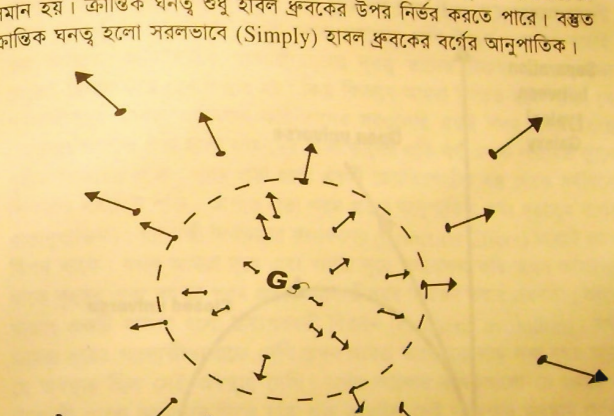

চিত্র ৩- বার্কহফের উপপাদ্য এবং মহাবিশ্বের প্রসারণ ঃ উপরের চিত্রে একটি নির্দিষ্ট গ্যালাক্সী 'G'-এর সাপেক্ষে কতগুলো গ্যালাক্সীকে তাদের বেগসহ দেখানো হয়েছে। গ্যালাক্সীগুলোর দিক এবং বেগ যথাক্রমে তাদের সঙ্গে সংযুক্ত তীর চিহ্নিত রেখা এবং রেখার দৈর্ঘ্য দ্বারা নির্দেশ করা হয়েছে। (হাবলের সূত্র অনুযায়ী গ্যালাক্সী G সাপেক্ষে অন্যান্য গ্যালাক্সীর বেগ হবে দূরত্বের সমানুপাতিক)। বার্কহফের উপপাদ্য অনুযায়ী গ্যালাক্সী 'G' সাপেক্ষে গ্যালাক্সী 'A' এর গতি নির্ণয় করতে হলে, শুধু গোলক 'G' এর ভর বের করতে হবে এবং এই গোলকের ব্যাস হবে G থেকে A পর্যন্ত। উপরের চিত্রে ড্যাশ লাইন দিয়ে গোলকের পরিধি দেখানো হয়েছে। G থেকে A-এর দূরত্ব যদি বেশি না হয় তাহলে গোলকের অভ্যন্তরের বস্তুর মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র মধ্যম মানের এবং A- এর গতি নিউটনের বলবিদ্যার সূত্র দ্বারা নিরূপণ করা যায়।

একই ধরনের যুক্তি ব্যবহার করে সময়ের সাথে সাথে মহাবিশ্বের আকার কি হবে তা আমরা বিস্তারিতভাবে গণনা করতে পারি। কিন্তু এতে যে ফলাফল পাওয়া যায় তা বেশ জটিল। যা হোক, এমন একটি সহজ ফলাফল এতে রয়েছে যা পরবর্তীতে আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হবে। মহাবিশ্বের আদি যুগে মহাবিশ্বের আকার শুধু সময়ের ঘাত (Power)- এর সাথে পরিবর্তিত হতো। বিকিরণের ঘনত্বকে যদি উপেক্ষা করা হয় তাহলে সময়ের এই ঘাত হয় দুই-তৃতীয়াংশ বা বিকিরণের ঘনত্ব যখন পদার্থের ঘনত্বকে অতিক্রম করে তখন সময়ের ঘাত হয় দুই-এর এক অংশ। ফ্রিডম্যানের সৃষ্টিতাত্ত্বিক মডেলের যে একটি দিক আপেক্ষিকতার সাধারণ তত্ত্ব ছাড়া বুঝা যায় না তা হলো, ঘনত্ব ও জ্যামিতির মধ্যকার সম্পর্ক। গ্যালাক্সীসমূহের বেগ যদি নিষ্ক্রমণ বেগ অপেক্ষা বেশি হয়, তাহলে মহাবিশ্ব হবে উন্মুক্ত (Open) এবং অসীম। আর যদি গ্যালাক্সীসমূহের বেগ নিষ্ক্রমণ বেগ অপেক্ষা কম হয় তবে মহাবিশ্ব হবে আবদ্ধ (Closed) এবং সসীম।

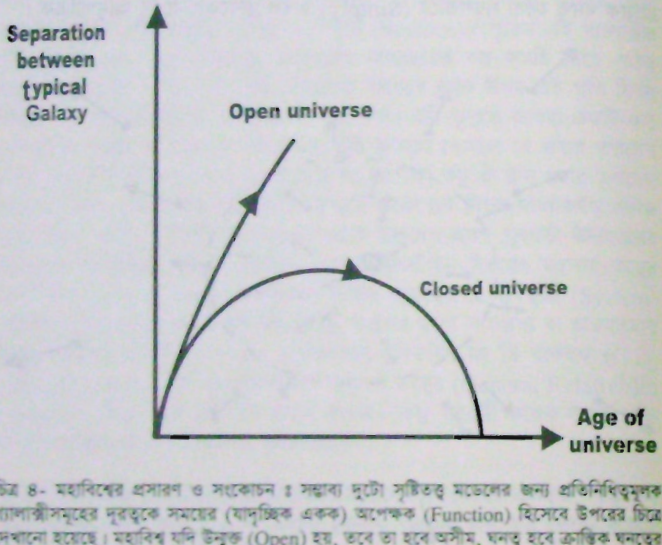

চিত্র ৪- মহাবিশ্বের প্রসারণ ও সংকোচন ঃ সম্ভাব্য দুটো সৃষ্টিতত্ত্ব মডেলের জন্য প্রতিনিধিত্বমূলক গ্যালাক্সীসমূহের দূরত্বকে সময়ের (যাদৃচ্ছিক একক) অপেক্ষক (Function) হিসেবে উপরের চিত্রে দেখানো হয়েছে। মহাবিশ্ব যদি উন্মুক্ত (Open) হয়, তবে তা হবে অসীম, ঘনত্ব হবে ক্রান্তিক ঘনত্বের কম এবং প্রসারণ যদিও ক্রমেই শ্লথ হয়ে আসবে তবুও চিরদিনের জন্য তা চলতেই থাকবে। একটি আবদ্ধ (Closed) মহাবিশ্বের ক্ষেত্রে মহাবিশ্ব হলো সসীম, ঘনত্ব হলো ক্রান্তিক ঘনত্বের চেয়ে বেশি এবং শেষ পর্যন্ত প্রসারণ বন্ধ হয়ে সংকোচন শুরু হবে। একটি বক্র প্রধান মহাবিশ্বের জন্য সৃষ্টিতাত্ত্বিক ধ্রুবক বাদ দিয়ে আইনস্টাইনের ক্ষেত্র সমীকরণ ব্যবহার করে উপরোক্ত নকশা অংকন করা হয়েছে।

গ্যালাক্সীগুলোর বেগ নিষ্ক্রমণ বেগ অতিক্রম করছে কি করছে না, তা জানার একটি পদ্ধতি হলো গ্যালাক্সীসমূহের বেগ কি হারে হ্রাস পাচ্ছে তা পরিমাপ করা। যদি এই মন্দন একটি নির্দিষ্ট পরিমাণের চেয়ে কম হয় তখন নিষ্ক্রমণ বেগ অতিক্রান্ত হয়। আবার যদি এই মন্দন একটি নির্দিষ্ট পরিমাণের চেয়ে বেশি হয় তখন নিষ্ক্রমণ বেগ অতিক্রান্ত হয় না। এর অর্থ হলো অত্যন্ত দূরবর্তী গ্যালাক্সীসমূহের লালসরণ বনাম

দূরত্বের গ্রাফ অংকন করে আমাদেরকে এই গ্রাফের বক্রতা (Curvature) বাস্তবে পরিমাপ করতে হবে। আমরা যদি অধিকতর ঘন সসীম মহাবিশ্ব থেকে তুলনামূলক কম ঘন অসীম মহাবিশ্বের দিকে যাই তাহলে দেখবো অত্যন্ত বেশি দূরত্বে লালসরণ বনাম দূরত্বের গ্রাফ চেপ্টা (Flatten out) হয়ে যায় (বা অনেকটা আনুভূমিক হয়ে যায়)। বিশাল দূরত্বে অবস্থিত গ্যালাক্সীসমূহের জন্য অংকিত লালসরণ বনাম দূরত্ব গ্রাফের আকৃতি ও বক্রতা পর্যবেক্ষণ করার কর্মসূচীকে সাধারণত 'হাবল প্রোগ্রাম' বলা হয়।

হাবল (Hubble), স্যানভেজ (Sanvadge) এবং সম্প্রতি অন্যরাও প্রচুর পরিশ্রম করে এই প্রোগ্রামের উপর অনেক গবেষণা করেন। এ পর্যন্ত যে ফলাফল পাওয়া গেছে তা মোটেই সিদ্ধান্তমূলক নয়। সমস্যাটি হলো, এখানে অতি দূরের গ্যালাক্সীসমূহের দূরত্ব নিরূপণ করার জন্য দূরত্ব নির্দেশক হিসেবে ব্যবহৃত শেফালী বিষম (Cepheid Variable) তারা অথবা সবচেয়ে বেশি উজ্জ্বল তারাকে বাছাই করা অসম্ভব। আমাদেরকে গ্যালাক্সীসমূহের দূরত্ব তাদের নিজস্ব আপাত প্রভা থেকেই হিসাব করে বের করতে হয়। কিন্তু কিভাবে আমরা নিশ্চিত হতে পারি, যে গ্যালাক্সীসমূহ আমরা পর্যবেক্ষণ করি তাদের সবগুলোর একই পরম প্রভা রয়েছে (স্মর্তব্যঃ আপাত প্রভা হলো আমাদের টেলিস্কোপের প্রতি বর্গ একক পরিমিত স্থানে গৃহীত বিকিরিত শক্তি। পরম প্রভা হলো একটি জ্যোতিঃশাস্ত্রীয় বস্তু থেকে সর্বদিকে বিকিরিত সর্বমোট শক্তি। আপাত প্রভা পরম প্রভার আনুপাতিক এবং দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক)। গ্যালাক্সী নির্বাচনের ফলাফলের (Selection Effect) মধ্যেই প্রচন্ড বিপদ থাকে। যখন আমরা দূরে এবং আরো দূরে পর্যবেক্ষণ করি তখন আমাদের থাকে বৃহত্তর এবং বৃহত্তর পরম প্রভার গ্যালাক্সীসমূহ নির্বাচন করার প্রবণতা। আরো খারাপ একটি সমস্যা হলো ছায়াপথবর্তী বিবর্তন (Gallactic evolution)। যখন আমরা দূরের গ্যালাক্সীগুলোকে দেখি তখন আমরা তাদেরকে লক্ষ লক্ষ বছর আগে যে অবস্থায় ছিল সেই অবস্থায় দেখি। অর্থাৎ আলোর কণিকাগুলো যে সময়ে ঐ গ্যালাক্সী থেকে আমাদের দিকে যাত্রা শুরু করেছিল সেই সময়কার অবস্থায় দেখি। প্রতিনিধিত্বমূলক গ্যালাক্সীসমূহ যদি এখনকার তুলনায় তখন উজ্জ্বলতর থাকে তাহলে আমাদের গণনাকৃত দূরত্ব হবে তাদের প্রকৃত দূরত্ব অপেক্ষা কম। প্রিন্সটনের জে.পি.অস্ট্রাইকার (J.P. Ostriker) এবং এসডি ট্রেমাইন (S.D.Tremanie) অতি সম্প্রতি যে সম্ভাবনার বিষয়টি উপস্থাপন করেছেন তা হলো, বৃহত্তর গ্যালাক্সীসমূহের বিবর্তন শুধু তাদের স্বতন্ত্র নক্ষত্রসমূহের বিবর্তনের কারণে ঘটে না, বরং তাদের গ্যালাক্সীসমূহের নিকটবর্তী ছোট ছোট গ্যালাক্সী গিলে খাওয়ার কারণেও এই বিবর্তন ঘটে থাকে। তবে এসব বিভিন্ন রকমের গ্যালাক্সীয় বিবর্তন সম্পর্কে পর্যাপ্ত পরিমাণগত জ্ঞান রয়েছে কিনা, সেই বিষয়ে নিশ্চিত হওয়ার জন্য আমাদেরকে দীর্ঘসময় অপেক্ষা করতে হবে।

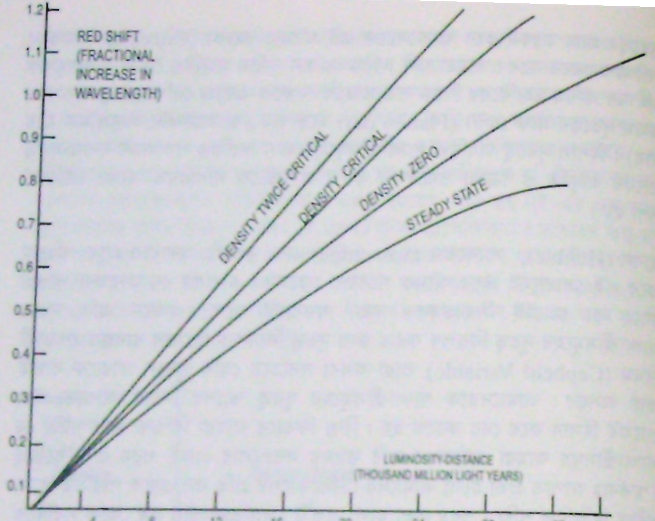

চিত্র ৫- লালসরণ বনাম দূরত্ব : সম্ভাব্য ৪টি সৃষ্টিতাত্ত্বিক তত্ত্বের জন্য লালসরণকে উপরের চিত্রে দূরত্বের অপেক্ষক হিসেবে দেখানো হয়েছে। (সুনির্দিষ্টভাবে প্রকাশের লক্ষ্যে এখানে দূরত্ব হলো 'প্রভার' দূরত্ব। একটি বস্তুর জ্ঞাত স্বকীয় প্রভা বা পরম প্রভার সাপেক্ষে পর্যবেক্ষণকৃত আপাত প্রভা থেকে নিরূপণকৃত দূরত্ব) আইনস্টাইনের ক্ষেত্র সমীকরণ থেকে সৃষ্টিতাত্ত্বিক ধ্রুবক পদ বাদ দিয়ে উক্ত সমীকরণ ব্যবহার করে ফ্রিডম্যান মডেলে একটি বস্তু- প্রধান মহাবিশ্বের জন্য তিনটি বক্রতা (Curve) অংকন করা হয়েছে। ঘনত্ব ক্রান্তিক মানের দ্বিগুণ হলে মহাবিশ্ব হবে আবদ্ধ যা প্রথম বক্রতায় দেখানো হয়েছে। দ্বিতীয় বক্রতায় ঘনত্ব ক্রান্তিক মানের সমান দেখানো হয়েছে। এক্ষেত্রে মহাবিশ্ব হবে প্রান্তিক মানে উন্মুক্ত। তৃতীয় বক্রতায় প্রদর্শিত ঘনত্ব শূন্য হলে মহাবিশ্ব হবে উন্মুক্ত। সময়ের সঙ্গে মহাবিশ্বের অবস্থার কোন পরিবর্তন ঘটেনা এমন যে কোন তত্ত্বের ক্ষেত্রেই স্থিতাবস্থা চিহ্নিত রেখাচিত্রটি প্রযোজ্য হবে। স্থিতাবস্থা বক্রতার সঙ্গে বর্তমান পর্যবেক্ষণের ফলাফল সঠিকভাবে মেলে না। তবে অন্যান্য সম্ভাবনার সঙ্গেও পর্যবেক্ষণের ফলাফল নিশ্চিতভাবে মেলে না। কেননা স্থিতাবস্থা নয় এমন তত্ত্বে গ্যালাক্সীর বিবর্তনের কারণে দূরত্ব নির্ণয় করা খুবই কঠিন হয়ে পড়ে। প্রতি মিলিয়ন আলোকবর্ষ দূরত্বের জন্য হাবল ধ্রুবকের মান ১৫ কি. মি./ সেকেন্ড ধরে সবগুলো বক্রতা অংকন করা হয়েছে। তবে হাবল ধ্রুবকের যে কোন মান ধরে এই বক্রতা অংকন করা সম্ভব। সেক্ষেত্রে হাবল ধ্রুবকের মানকে শুধু দূরত্বের সঙ্গে পুনর্নির্ধারণ করতে হবে।

বর্তমান হাবল প্রোগ্রাম থেকে সর্বোত্তম যে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় তা হলো, দূরবর্তী গ্যালাক্সীসমূহের মন্দন বেশ কম বলেই মনে হয়। এর দ্বারা এটাই বুঝায় যে, গ্যালাক্সীসমূহ নিষ্ক্রমণ বেগের চাইতে অধিক বেগে ছুটছে। অর্থাৎ মহাবিশ্ব হলো উন্মুক্ত (Open) এবং চিরকাল তা প্রসারিত হতে থাকবে। মহাজাগতিক ঘনত্বের হিসাবের সাথে এটা ভাল মিলে যায়। গ্যালাক্সীসমূহে দৃশ্যমান বস্তুর পরিমাণ ক্রান্তিক ঘনত্বের মাত্র কয়েক শতাংশের বেশি নয় বলে মনে হয়। তবে এই বিষয়েও অনিশ্চয়তা রয়েছে। সাম্প্রতিক হিসাবে গ্যালাক্সীসমূহের ভর বৃদ্ধি পাচ্ছে। হার্ভার্ডের জর্জ ফিল্ড (George Field) এবং অন্যদের প্রস্তাবনা অনুযায়ী আয়োনিত

হাইড্রোজেনের আন্ত:গ্যালাক্সীয় গ্যাস থাকতে পারে যা একটি মহাজাগতিক ক্রান্তিক ঘনত্বের জন্য প্রয়োজনীয় ভর যোগান দিতে সক্ষম; অথচ এখনও আমরা তা শনাক্ত করতে পারি নি।

সৌভাগ্যবশত মহাবিশ্বের সূচনা সম্পর্কে উপসংহারে উপনীত হওয়ার জন্য আমাদেরকে এর (মহাবিশ্বের) বড় মাপের জ্যামিতি সম্পর্কে কোন সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে পৌছার প্রয়োজন পড়ে না। কারণ হলো, মহাবিশ্বের রয়েছে এক ধরনের দিগন্তবৃত্ত (Horizon) এবং যখন আমরা মহাবিশ্বের শুরুর দিকে ফিরে তাকাই তখন এই দিগন্ত বৃত্ত দ্রুতই সংকুচিত হয়ে পড়ে।

কোন সংকেতই আলোর চেয়ে অধিক বেগে ভ্রমণ করতে পারে না। তাই মহাবিশ্বের উদ্ভবের পর থেকে সংঘটিত কোন ঘটনা আমরা শুধু তখনই জানতে পারি, যখন ঐ ঘটনা (Event) থেকে আলোক রশ্মি আমাদের নিকট পৌছার জন্য পর্যাপ্ত সময় পায়। এই দূরত্বের বাইরে সংঘটিত কোন ঘটনার প্রতিক্রিয়া বা ফলাফল আমাদের উপর এখন পর্যন্ত পড়বে না। কারণ এটা দিগন্তবৃত্তের বাইরে। মহাবিশ্বের বয়স যদি এখন ১০,০০০ মিলিয়ন বছর হয়, তবে এখন দিগন্ত বৃত্ত হবে ৩০,০০০ মিলিয়ন আলোকবর্ষ দূরে। কিন্তু মহাবিশ্বের বয়স যখন (মাত্র) কয়েক মিনিট ছিল তখন তার দিগন্তবৃত্ত ছিল মাত্র কয়েক আলোকমিনিট দূরে; তবে এই দূরত্ব থেকে সূর্য ও পৃথিবীর বর্তমান দূরত্ব বাদ দিতে হবে। এটাও সত্য যে, তখন সম্পূর্ণ মহাবিশ্ব ছিল অপেক্ষাকৃত ছোট। আমরা আগেই বলেছি যে, যে কোন এক জোড়া কণিকা বা বস্তুর তখনকার পারস্পরিক দূরত্ব ছিল এখনকার চেয়ে কম। যা হোক যখন আমরা পেছনে মহাবিশ্বের শুরুর দিকে তাকাই তখন দেখি মহাবিশ্বের আকারের তুলনায় দিগন্ত বৃত্তের দূরত্ব ক্ষুদ্রতর সংকুচিত হয়। মহাবিশ্বের আকার হলো সময়ের ১/২ বা ২/৩ ঘাতের আনুপাতিক অথচ দিগন্তবৃত্তের দূরত্ব শুধু সময়ের আনুপাতিক। এজন্য যতই সময়ের পেছনে যাওয়া যায় ততই দেখা যায় যে, দিগন্তবৃত্ত মহাবিশ্বের ক্ষুদ্রতর অংশকে বেষ্টন (Enclose) করে রয়েছে।

আদি মহাবিশ্বে দিগন্ত বৃত্ত ক্ষুদ্রতর হওয়ার কারণে আমরা মহাবিশ্বের যতই শুরুর দিকে দৃষ্টিপাত করি মহাবিশ্বের বক্রতা সার্বিকভাবে ততই ক্ষুদ্রতর পার্থক্য সৃষ্টি করে।

এভাবে বর্তমান সৃষ্টিতাত্ত্বিক তত্ত্ব এবং জ্যোতিঃশাস্ত্রীয় পর্যবেক্ষণ যদিও মহাবিশ্বের ব্যাপ্তি বা ভবিষ্যত সম্পর্কে এখনও ভালভাবে জানান দেয় নি, তবু তারা মহাবিশ্বের অতীত সম্পর্কে একটি বেশ স্পষ্ট ছবি উপস্থাপন করে।

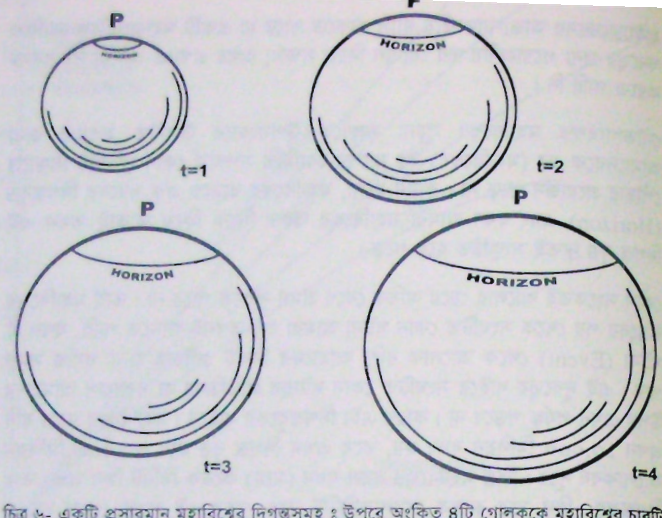

চিত্র ৬- একটি প্রসারমান মহাবিশ্বের দিগন্তসমূহ ঃ উপরে অংকিত ৪টি গোলককে মহাবিশ্বের চারটি মুহূর্তের প্রতীক হিসেবে দেখানো হয়েছে। এখানে সমান সময়ের ব্যবধানের ৪টি মুহূর্ত নেয়া হয়েছে। একটি নির্দিষ্ট বিন্দু 'P' এর দিগন্ত বলতে আমরা এমন এক দূরত্বকে বুঝাবো যে এই দূরত্বের বাইরের কোন বিন্দু থেকে আগত আলোক সংকেত ঐ বিন্দু 'P' তে পৌছার সময় পায় নি। দিগন্তের মধ্যস্থিত মহাবিশ্বের অংশকে উপরের গোলকের আনশেডেড ক্যাপ (Unshaded Cap) হিসেবে দেখানো হয়েছে। 'P' বিন্দু থেকে দিগন্ত পর্যন্ত দূরত্ব সময়ের সরাসরি অনুপাতে বৃদ্ধি পায়। অপরপক্ষে একটি বিকিরণ প্রভাবিত মহাবিশ্বের ক্ষেত্রে মহাবিশ্বের ব্যাসার্ধ সময়ের বর্গমূলের অনুপাতে বৃদ্ধি পায়। এর ফলে আমরা যতই সময়ের পেছনে যাই, ততই মহাবিশ্বের ক্ষুদ্রতর অংশকে দিগন্ত বেষ্টিত দেখতে পাই।

এই অধ্যায়ে যে সকল পর্যবেক্ষণ আলোচনা করা হয়েছে তা মহাবিশ্বের এমন একটি চিত্র আমাদের কাছে উপস্থাপন করেছে যা যতটা চমৎকার ততটা সরল। মহাবিশ্ব সুসমভাবে এবং সবদিকে সমানভাবে প্রসারিত হচ্ছে। সকল দিকে এবং সকল প্রতিনিধিত্বমূলক গ্যালাক্সীতে অবস্থিত পর্যবেক্ষকগণ একই ধরনের প্রবাহ দেখতে পান। মহাবিশ্ব যখন প্রসারিত হতে থাকে তখন আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য গ্যালাক্সীসমূহের মধ্যকার দূরত্বের অনুপাতে প্রসারিত বা প্রলম্বিত হতে থাকে। এমনটি বিশ্বাস করা হয় না যে মহাজাগতিক কোন বিকর্ষণের কারণে মহাবিশ্বের এই প্রসারণ ঘটছে। বরং অতীতের এক বিস্ফোরণের অবশিষ্ট বেগের প্রভাবেই এই প্রসারণ ঘটছে। মহাকর্ষের প্রভাবে অবশিষ্ট এই বেগগুলো ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। এই মন্দন বেগ ধীর বলেই প্রতীয়মান হয়। তা এই পরামর্শই প্রদান করে যে, মহাবিশ্বের বস্তুর ঘনত্ব কম এবং এর মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র এত দুর্বল যে, তা মহাবিশ্বকে স্থানে (Spatially) সীমিত করতে পারে না বা শেষ পর্যন্ত প্রসারণকে উল্টো দিকে ফিরাতে পারে না। জ্ঞাত তথ্যাদি বিচারের মাধ্যমে মহাবিশ্বের প্রসারণকে সময়ের পেছনের দিকে গণনা করে আমরা যে হিসাব পাই, তাতে দেখা যায় যে, এখন থেকে এক হাজার কোটি বছর থেকে দুই হাজার কোটি বছর আগের কোন এক সময়ে অবশ্যই এই প্রসারণ শুরু হয়েছিল।

মহাজাগতিক মাইক্রোওয়েভ পটভূমি বিকিরণ
The Cosmic Microwave Radiation Background

আগের অধ্যায়ে যে ইতিহাস বর্ণনা করা হয়েছে তার সঙ্গে অতীতের সকল জ্যোতির্বিদগণই পরিচিত, এমন কি টেলিস্কোপের বিন্যাস (Setting) সম্পর্কেও। পর্যবেক্ষণকারীগণ ক্যালিফোর্নিয়া বা পেরুর পর্বতের শিখরে স্থাপিত বড় বড় টেলিস্কোপ থেকে অথবা তাঁদের টাওয়ার থেকে খালি চোখে ভল্লুক শিকারীর দৃষ্টিতে রাতের আকাশকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্যবেক্ষণ করে বেড়ান। ভূমিকাতে আমি বলেছি যে এটাও এমন একটি গল্প অতীতে যা বহুবার বলা হয়েছে এবং অনেক সময়ে তা এখনকার চেয়ে অধিকতর বিস্তারিতভাবেই করা হয়েছে।

এখন আমরা এক ভিন্ন ধরনের জ্যোতির্বিজ্ঞান পেয়েছি যা এক দশক আগেও ছিল না। আমরা এখন শুধু আমাদের নিজস্ব গ্যালাক্সীর মতো গ্যালাক্সীসমূহ থেকে বিগত কয়েক মিলিয়ন বছর ধরে বিকীর্ণ (Emitted) আলোক রশ্মি পর্যবেক্ষণ করবো না, বরং মহাবিশ্ব সৃষ্টির প্রথম দিকের স্থৈতিক বেতারের অবশেষ-এর বিকীর্ণ পটভূমিকেও পর্যবেক্ষণ করবো। টেলিস্কোপের স্থাপনেও পরিবর্তন এসেছে। এগুলোকে এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যা ভবনের ছাদে, বেলুনে অথবা পৃথিবীর বায়ুমন্ডলের উপরে ঘূর্ণায়মান রকেটে স্থাপিত অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায়।

১৯৬৪ সালে বেল টেলিফোন ল্যাবরেটরীর কাছে ব্যতিক্রম ধরনের একটি রেডিও এন্টেনা ছিল। এই এন্টেনাটি স্থাপন করা হয়েছিল নিউজার্সি রাজ্যের হলমডেলের **ক্রফোর্ড** পর্বতে এবং এটি ইকো উপগ্রহের (Echosatellite) মাধ্যমে যোগাযোগের জন্য তৈরি করা হয়েছিল। কিন্তু এটা ভীষণ কম মাত্রার গুঞ্জন (Noise) ধারণ করত এবং এর বিশ ফুট লম্বা প্রতিফলক এন্টেনা থাকার কারণে, এটি একটি সম্ভাবনাময় বেতার তরঙ্গের দূরবীক্ষণ যন্ত্রে পরিণত হয়। আমাদের গ্যালাক্সীর উচ্চ গ্যালাক্সীয় অক্ষ থেকে (অর্থাৎ ছায়াপথের তলের বাইরে থেকে) যে বেতার তরঙ্গ নির্গত হয়, সেগুলোর মাত্রা পরিমাপের জন্য বেতার জ্যোতির্বিজ্ঞানী আর্নো এ. পেনজিয়াস (Arno A Penzias) এবং রবার্ট ডব্লিউ, উইলসন (Robert W. Wilson) এন্টেনাটি স্থাপন করেন।

এ ধরনের পরিমাপ খুবই কঠিন। জ্যোতিঃশাস্ত্রীয় অন্যান্য উৎসের মতই আমাদের গ্যালাক্সীতে আগত বেতার তরঙ্গগুলোকে এক ধরনের গুঞ্জন হিসেবে সর্বোত্তমভাবে বর্ণনা করা যায়। বজ্রসহ বৃষ্টিপাতের সময়ে রেডিওতে যে রকম গুঞ্জন শুনতে পাওয়া যায় এটা অনেকটা তেমন। রেডিও এন্টেনার কাঠামো ও এম্প্লিফায়ার সার্কিটের

মধ্যে ইলেকট্রনের এলোমেলো চলাচলের কারণে অনিবার্যভাবে সৃষ্ট বৈদ্যুতিক গুঞ্জন (Electrical Noise) বা পৃথিবীর বায়ুমন্ডল থেকে এন্টেনা যে বেতার গুঞ্জন (Radio Noise) গ্রহণ করে তা থেকে এই বেতার গুঞ্জনকে সহজে পৃথক করা যায় না। নক্ষত্র বা দূরের গ্যালাক্সী থেকে সৃষ্ট তুলনামূলক মৃদু বেতার গুঞ্জনের উৎস যখন কেউ পর্যবেক্ষণ করতে চায়, তখন এই সমস্যাটি তত প্রকট হয় না। এ ক্ষেত্রে যে কেউ এন্টেনার আলোক রশ্মিকে (Beam) সামনে পেছনে নিয়ে এমনভাবে স্থাপন করতে পারে যেন এটা উৎস এবং নিকটবর্তী খালি আকাশের মাঝখানে থাকে। এন্টেনাকে উৎস কিংবা নিকটবর্তী আকাশ, যে কোন দিকেই তাক করা হোক না কেন এন্টেনার কাঠামো, এম্প্লিফায়ার সার্কিট বা পৃথিবীর বায়ুমন্ডল থেকে আগত কৃত্রিম গুঞ্জন (Spurious noise) প্রায় একই রকম হবে। তাই যখন এদেরকে তুলনা করা হয় তখন এরা পরস্পরকে বাতিল করে। যা হোক আমাদের নিজস্ব গ্যালাক্সী থেকে (বা আকাশ থেকে) যে বেতার গুঞ্জন আসে তা পরিমাপ করার জন্য পেনজিয়াস এবং উইলসন চেষ্টা করেছিলেন। তাই তাদের গ্রাহক যন্ত্রের মধ্যে কোন বৈদ্যুতিক গুঞ্জন সৃষ্টি হয় কিনা, তা চিহ্নিত করার বিষয়টি ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

বস্তুতপক্ষে অতীতে এই ধরনের পরীক্ষায় যে পরিমাণ গুঞ্জনের ব্যাখ্যা করা যায় তার চেয়ে সামান্য বেশি পরিমাণ গুঞ্জন পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু এম্প্লিফায়ার সার্কিটে কিছুটা অতিরিক্ত বৈদ্যুতিক গুঞ্জন সৃষ্টি হওয়াকেই এই গড়মিলের সম্ভাব্য কারণ বলে মনে করা হলো। এ সমস্যা দূর করার জন্য পেনজিয়াস এবং উইলসন 'Cold Load' নামে পরিচিত একটি কৌশল ব্যবহার করলেন। এন্টেনা থেকে যে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় তাকে তুলনা করা হয় একটি কৃত্রিম উৎস থেকে উৎপন্ন বিদ্যুতের সাথে। কৃত্রিম উৎসটিকে তরল হিলিয়াম দিয়ে পরমশূন্য তাপমাত্রার প্রায় ৪° কেলভিন উপরে রাখা হয়। এম্প্লিফায়ার সার্কিটে উৎপন্ন বৈদ্যুতিক গুঞ্জন উভয়ক্ষেত্রে সমান হয় এবং তুলনা করার সময়ে তড়িৎ গুঞ্জন পরস্পরকে বাতিল করে। ফলে এন্টেনাতে সৃষ্ট বিদ্যুত সরাসরি পরিমাপ করা সম্ভব হয়। এন্টেনা থেকে যে বিদ্যুত এভাবে পরিমাপ করা হয় তাতে শুধু এন্টেনা কাঠামো, পৃথিবীর বায়ুমন্ডল এবং যে কোন মহাজাগতিক উৎসের বেতার তরঙ্গের অবদান থাকে।

পেনজিয়াস এবং উইলসন আশা করেছিলেন এন্টেনার কাঠামোয় খুব ক্ষুদ্রতর পরিমাণ তড়িৎ গুঞ্জন সৃষ্টি হবে। যা হোক অনুমানটি পরীক্ষা করার জন্য তারা তুলনামূলক স্বল্প তরঙ্গদৈর্ঘ্য ৭.৩৫ সে.মি. এ তাঁদের পর্যবেক্ষণ শুরু করেন। এই তরঙ্গদৈর্ঘ্যে আমাদের নিজস্ব গ্যালাক্সী থেকে আগত 'বেতার গুঞ্জন' নগণ্য হওয়া উচিৎ। এই তরঙ্গদৈর্ঘ্যে আমাদের পৃথিবীর বায়ুমন্ডল থেকে কিছু 'বেতার গুঞ্জন' স্বাভাবিকভাবে প্রত্যাশিত ছিল। তবে এর একটি বৈশিষ্ট্যসূচক দিক-নির্ভরতা থাকবে। যে দিকে এন্টেনা তাক করা থাকবে সেই দিকের বায়ু মন্ডলের পুরুত্বের সাথে বেতার গুঞ্জন আনুপাতিক হবে। এটা জেনিথের (Zenith) দিকে অর্থাৎ আকাশের যে বিন্দু মাথার ঠিক উপরে অবস্থিত সেদিকে কম হবে এবং দিগন্তের দিকে (Horizon) বেশি হবে। প্রত্যাশিত ছিল ঃ দিকের উপর বৈশিষ্ট্যসূচক নির্ভরতাজনিত বেতার গুঞ্জন থেকে বায়ুমন্ডলের বেতার গুঞ্জন বাদ দিলে এন্টেনাতে আর কোন বিদ্যুত অবশেষ হিসেবে থাকবে না এবং এটা নিশ্চিত করবে যে এন্টেনার কাঠামোতে সৃষ্ট বৈদ্যুতিক গুঞ্জন সত্যিকারেই নগণ্য ছিল। তখন তাঁরা প্রায় ২১

সে.মি. তরঙ্গদৈর্ঘ্যের চেয়ে দীর্ঘতর তরঙ্গদৈর্ঘ্যে গ্যালাক্সীকে পরীক্ষা করতে সমর্থ হবেন। এই তরঙ্গদৈর্ঘ্যে গ্যালাক্সী থেকে সৃষ্ট বেতার গুঞ্জন পর্যাপ্ত হতে পারে বলে প্রত্যাশিত ছিল।

[ঘটনাক্রমে ৭.৩৫ সে.মি. বা ২১ সে.মি. এবং ১ মিটার পর্যন্ত তরঙ্গদৈর্ঘ্যের বেতার তরঙ্গকে মাইক্রোওয়েভ বিকিরণ বলা হয়। এর কারণ হলো এই তরঙ্গদৈর্ঘ্যগুলো দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শুরুতে রাডার কর্তৃক ব্যবহৃত ভিএইচএফ (VHF) ব্যান্ডের তরঙ্গদৈর্ঘ্য থেকে ক্ষুদ্রতর ছিল।]

১৯৬৪ সালের বসন্তকালে পেনজিয়াস এবং উইলসন বিস্মিত হয়ে দেখলেন যে তারা ৭.৩৫ সে.মি. তরঙ্গদৈর্ঘ্যে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ 'মাইক্রোওয়েভ গুঞ্জন' পাচ্ছেন, যা দিকের উপর নির্ভরশীল ছিল না। তাঁরা আরো দেখলেন এই স্থিতি (স্থির তরঙ্গদৈর্ঘ্যের মাইক্রোওয়েভ নয়েজ) দিনের কোন সময় বা বছরের কোন ঋতুর সাথে পরিবর্তিত হচ্ছিল না। এটি আমাদের নিজস্ব গ্যালাক্সী থেকে আসতে পারে এমনও প্রতীয়মান হচ্ছিল না। যদি আমাদের নিজস্ব গ্যালাক্সী থেকে আসত তবে আমাদের গ্যালাক্সীর সাথে অনেকটা সদৃশ এন্ড্রোমিডা নামক বিরাট M_{31} গ্যালাক্সী ৭.৩৫ সে.মি. তরঙ্গদৈর্ঘ্যে আলো বিকিরণ করতো এবং এই 'মাইক্রোওয়েভ নয়েজ' ইতোমধ্যে পর্যবেক্ষণ করা যেতো। সর্বোপরি পর্যবেক্ষণকৃত 'মাইক্রোওয়েভ নয়েজ'-এর অভিমুখ পরিবর্তনের সাথে কোন ভিন্নতা (Variation) না পাওয়ার কারণে দৃঢ়ভাবে এ ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছিল যে এই বেতার তরঙ্গগুলো যদি সত্যিকার হয়ে থাকে তবে তা ছায়াপথ (Milky Way) থেকে আসছিল না, বরং মহাবিশ্বের বৃহত্তর আয়তন বা পরিসর থেকে আসছিল।

সুনির্দিষ্টভাবে এটা পুনর্বিবেচনা করা প্রয়োজন হয়ে পড়লো যে, এন্টেনা নিজেই প্রত্যাশিত পরিমাণের চেয়ে বেশি পরিমাণ গুঞ্জন সৃষ্টি করছিল কি না। বিশেষ করে এটা জানা ছিল যে এক জোড়া কবুতর গ্রাহকযন্ত্রের (এন্টেনার) গলার দিকে বাসা বানিয়ে বসবাস করছিল। কবুতর দুটো ধরা হলো। তাদেরকে বেল ল্যাবরেটরীর হর্ইপনি সাইটে প্রেরণ করা হলো এবং ছেড়ে দেয়া হলো। কয়েকদিন পর তাদেরকে পুনরায় এন্টেনার উপর হলমডেলে পাওয়া গেল। পুনরায় কবুতর দুটো ধরা হলো এবং শেষ পর্যন্ত অধিকতর নিশ্চিত প্রক্রিয়ায় তাদেরকে সরানো হলো। যাহোক কবুতর দুটো তাদের বসবাসের সময়ে এন্টেনার গলার দিকে মলত্যাগের মাধ্যমে একটি সাদা 'ডাই-ইলেকট্রিক' বস্তুর প্রলেপ দিয়েছিল এবং কক্ষ তাপমাত্রায় এই বস্তু বৈদ্যুতিক গুঞ্জনের উৎস হতে পারত। ১৯৬৫ সালের প্রথম দিকে গ্রাহকযন্ত্রের গলার দিকটি খুলে ফেলা সম্ভব হলো এবং তাকে পরিষ্কার করা হলো। কিন্তু এতে এবং অন্যান্য সকল প্রচেষ্টা সত্ত্বেও পর্যবেক্ষণকৃত গুঞ্জনের মাত্রার অতি সামান্য অংশই কমলো। রহস্য রয়েই গেল কোথা থেকে এই 'বেতার গুঞ্জন' আসছে।

পেনজিয়াস এবং উইলসনের কাছে যে এক প্রস্থ সংখ্যাভিত্তিক উপাত্ত রইল তাতে ছিল তাদের পর্যবেক্ষণকৃত বেতার গুঞ্জনের তীব্রতা। এই তীব্রতা বর্ণনা করতে গিয়ে তাঁরা যে ভাষা ব্যবহার করেন তা বেতার প্রকৌশলীদের জন্য সাধারণ; কিন্তু এ ক্ষেত্রে তার একটি অপ্রত্যাশিত তাৎপর্য রয়েছে বলে প্রকাশ পেলো। কোন বস্তুর অভ্যন্তরে ইলেকট্রনসমূহের তাপীয় গতির কারণে যে কোন ধরনের বস্তু পরম শূন্যের উপরের যে

কোন তাপমাত্রায় সর্বদা বেতার গুঞ্জন বিকিরণ বা বিচ্ছুরিত (Emit) করবে। অনচ্ছ (Opaque) দেয়ালের একটি বাক্সের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট তরঙ্গদৈর্ঘ্যে বেতার গুঞ্জনের তীব্রতা একমাত্র দেয়ালগুলোর তাপমাত্রার উপর নির্ভরশীল। তাপমাত্রা যত বেশি হবে স্থির বেতার গুঞ্জন তত বেশি তীব্র হবে। এভাবে একটি নির্দিষ্ট তরঙ্গদৈর্ঘ্যে পর্যবেক্ষণকৃত বেতার গুঞ্জনের তীব্রতাকে 'সমতুল্য তাপমাত্রায়' (Equivalent Temperature) প্রকাশ করা সম্ভব। এই বেতার গুঞ্জনের পর্যবেক্ষণকৃত তীব্রতা হবে যে বাক্সে এ 'বেতার গুঞ্জন' সৃষ্টি হচ্ছে সেই বাক্সের দেয়ালের তাপমাত্রার সমতুল্য। অবশ্যই একটি রেডিও টেলিস্কোপ একটি থার্মোমিটার নয়। বেতার তরঙ্গগুলো এন্টেনার কাঠামোতে যে সামান্য বিদ্যুৎ প্রবাহ সৃষ্টি করে তা পরিমাপের মাধ্যমে একটি রেডিও টেলিস্কোপ বেতার তরঙ্গের শক্তি পরিমাপ করে। যখন একজন বেতার জ্যোতির্বিজ্ঞানী বলেন যে নির্দিষ্ট একটি সমতুল্য তাপমাত্রায় বেতার গুঞ্জন পর্যবেক্ষণ করছেন, তখন তিনি শুধু এই বুঝান যে, বেতার গুঞ্জনকে পর্যবেক্ষণ করার জন্য যে অনচ্ছ বাক্সে এন্টেনাকে স্থাপন করা হতো এটা হলো সেই বাক্সের তাপমাত্রা। এন্টেনাটি ঐ রকম একটি বাক্সে আছে কিংবা নেই তা অবশ্যই অন্য প্রশ্ন।

বিশেষজ্ঞদের নিকট থেকে আপত্তি এড়ানোর জন্য আমার উল্লেখ করা প্রয়োজন যে বেতার প্রকৌশলীরা প্রায়ই বেতার গুঞ্জনের তীব্রতাকে তথাকথিত গ্রাহকযন্ত্রের (এন্টেনার) তাপমাত্রা হিসেবে বর্ণনা করেন। এটা উপরে বর্ণিত 'সমতুল্য তাপমাত্রা' থেকে সামান্য পৃথক। তবে পেনজিয়াস এবং উইলসন কর্তৃক পর্যবেক্ষণকৃত তরঙ্গদৈর্ঘ্য এবং তীব্রতার জন্য দুটো সংজ্ঞা চূড়ান্ত অর্থে একই রকম।

পেনজিয়াস এবং উইলসন দেখতে পেলেন, যে বেতার গুঞ্জন তারা গ্রহণ করেছেন তার সমতুল্য তাপমাত্রা হলো পরম শূন্য তাপমাত্রার চেয়ে প্রায় ৩.৫০° সেন্টিগ্রেড বেশি। (বা আরও নির্ভুলভাবে বলা যায়, এই তাপমাত্রা ছিল পরম শূন্যের উপরে, ২.৫ ডিগ্রী এবং ৪.৫ ডিগ্রীর মধ্যে)। সেন্টিগ্রেড স্কেলে পরিমাপকৃত তাপমাত্রাকে যখন বরফের গলনাংকের সাথে তুলনা না করে পরম শূন্য তাপমাত্রার সাথে তুলনা করা হয়, তখন তাকে 'ডিগ্রী কেলভিনে' প্রকাশ করা হয়। এভাবে পেনজিয়াস এবং উইলসন কর্তৃক পর্যবেক্ষণকৃত বেতার গুঞ্জনকে ৩.৫ ডিগ্রী কেলভিন বা সংক্ষেপে ৩.৫°K সমতুল্য তাপমাত্রার সমান হিসেবে বর্ণনা করা যায়। এটা প্রত্যাশিত মানের চাইতে অনেকটা বেশি ছিল, কিন্তু প্রকৃত অর্থে এখনও তা খুবই কম। তাই পেনজিয়াস এবং উইলসন এই ফলাফল প্রকাশ করার আগে কিছু সময়ের জন্য যে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করলেন, তাতে বিস্ময়ের কিছু ছিল না। লালসরণ আবিষ্কারের পর এটাই যে সবচেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ সৃষ্টিতাত্ত্বিক অগ্রগতি তা নিশ্চিতভাবে তৎক্ষণাৎ পরিষ্কার হলো না।

রহস্যজনক মাইক্রোওয়েভ গুঞ্জনের অর্থ শীঘ্রই নভোপদার্থবিদদের দ্বারা ব্যাখ্যা পেতে লাগলো। পেনজিয়াস অন্যান্য বিষয়ে কথা বলার জন্য তার সহকর্মী এম আই টি'র বেতার জ্যোতির্বিদ বার্ণার্ড বার্ককে (Bernard Burke) টেলিফোন করেছিলেন। এর অল্প সময় আগে বার্ক তার একজন সহকর্মী কানেগী ইনস্টিটিউশনের কেন টার্নার (Ken Turner) এর কাছ থেকে একটি তথ্য জানতে পারেন। জনস হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রিন্সটনের নবীন তাত্ত্বিক পি. জে. ই. পিবল্স (P.J.E. Peebles)-এর

বক্তৃতা থেকে টার্নার আবার এই নতুন তথ্যটি জানতে পেরেছিলেন। এই বক্তৃতায় পিবলস যুক্তি দেখান যে আদি মহাবিশ্বের অবশেষ হিসেবে বর্তমানে যে পটভূমি বেতার গুঞ্জন থাকা উচিত তার সমতুল্য তাপমাত্রা হবে মোটামুটি ১০°K। বার্ক ইতোমধ্যে জেনেছিলেন যে বেল ল্যাবরেটরীতে হর্ন গ্রাহকযন্ত্রের সাহায্যে পেনজিয়াস বেতার গুঞ্জনের তাপমাত্রা বা তীব্রতা পরিমাপ করেছিলেন। তাই টেলিফোনে আলাপের মাধ্যমে বার্ক জানতে চেয়েছিলেন পরিমাপ বা পর্যবেক্ষণ কেমন চলছে। পেনজিয়াস জানালেন যে পরিমাপ ভালভাবেই চলছে। কিন্তু পরিমাপের ফলাফলের মধ্যে এমন কিছু রয়েছে, যা তিনি বুঝছেন না। বার্ক পেনজিয়াসকে পরামর্শ দিলেন যে তার গ্রাহক যন্ত্রে যা পাওয়া যাচ্ছে সে সম্পর্কে প্রিন্সটনের পদার্থবিদরা হয়তো কোন আকর্ষণীয় তত্ত্ব বা মতামত দিতে পারবেন।

১৯৬৫ সালের মার্চ মাসে পিবলস তার এক প্রবন্ধে এবং বক্তৃতায় আদি মহাবিশ্বের যে বিকিরণ বর্তমানে মহাবিশ্বে বিদ্যমান থাকতে পারে সেই বিকিরণের বিষয়টি বিবেচনায় আনেন। বিকিরণ অবশ্য একটি সাধারণ শব্দ বা পরিভাষা (General Term)। এতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে সকল তরঙ্গদৈর্ঘ্যের তড়িৎ চুম্বক তরঙ্গ - তা শুধু বেতার তরঙ্গ নয় বরং অবলোহিত আলো (Infra-red light), দৃশ্যমান আলো, অতি-বেগুনী আলো (Ultra-violet light), এক্স-রে এবং অত্যন্ত ক্ষুদ্র তরঙ্গদৈর্ঘ্যের গামারশ্মি নামক বিকিরণও এর মধ্যে রয়েছে। এ সব বিকিরণের তরঙ্গদৈর্ঘ্যের মধ্যে তীক্ষ্ণ পার্থক্য (Sharp distinction) নেই। তরঙ্গদৈর্ঘ্যের মান ক্রমাগত পরিবর্তনের মাধ্যমে এক ধরনের বিকিরণ অন্য ধরনের বিকিরণে পরিবর্তিত হয়। পিবলস উল্লেখ করেছিলেন যে আদি মহাবিশ্বে যদি তীব্র (Intense) পটভূমি বিকিরণ বিদ্যমান না থাকতো, তাহলে প্রথম কয়েক মিনিটে পারমাণবিক বিক্রিয়া এত দ্রুতগতিতে সম্পন্ন হতো যে বিদ্যমান হাইড্রোজেনের (হাইড্রোজেন নিউক্লিয়াসের) একটি বিরাট অংশ ভারী মৌলে পরিবর্তিত হয়ে যেত এবং সে ক্ষেত্রে বর্তমান মহাবিশ্বে তিন-চতুর্থাংশ হাইড্রোজেন পাওয়া যেত না। আদি মহাবিশ্ব যদি সমতুল্য প্রচন্ড তাপমাত্রা সহ খুব ক্ষুদ্র তরঙ্গদৈর্ঘ্যের বিকিরণ দ্বারা পূর্ণ থাকে তবে তা এই দ্রুত পারমাণবিক রদ্ধনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে। ফলে পরমাণুর নিউক্লিয়াসসমূহ গঠিত হওয়ার সাথে সাথেই ধ্বংস বা এদের অংশে বিচ্ছিন্ন হতে পারে।

আমরা দেখতে পাবো যে পরবর্তীতে মহাবিশ্বের প্রসারণের পরেও এই বিকিরণ টিকে রইলো। তবে মহাবিশ্বের প্রসারণের সাথে এর সমতুল্য তাপমাত্রা মহাবিশ্বের আকারের ব্যস্তানুপাতে কমতে থাকে। (আমরা দেখি যে এটা হলো অনিবার্যভাবে লালসরণের একটি প্রতিক্রিয়া যা দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে।) এতে এটাই বুঝা যায় যে বর্তমান মহাবিশ্বও বিকিরণ দ্বারা পূর্ণ হওয়া উচিত। কিন্তু তার সমতুল্য তাপমাত্রা হবে প্রথম কয়েক মিনিটের তুলনায় অত্যন্ত কম। পিবলস হিসাব করেন যে, প্রথম কয়েক মিনিটে সৃষ্ট হিলিয়াম এবং ভারী মৌলসমূহের পরিমাণ জ্ঞাত সীমার মধ্যে থাকার জন্য সেই সময়ের বিকিরণের তীব্রতা এতটা বেশি হবে যাতে বর্তমান সময়েও সেই বিকিরণের পটভূমি তাপমাত্রা কমপক্ষে ১০°K হয়।

১০°K তাপমাত্রার সংখ্যাটি ছিল কিছুটা অধিক প্রাক্কলিত এবং শীঘ্রই পিবলস এবং অন্যরা এই হিসাবকে আরো বিস্তারিত এবং নির্ভুল হিসাব দ্বারা প্রতিস্থাপন করেন।

আসলে পিবল্‌স - এর প্রবন্ধটি কখনও এর আদিরূপে ছাপা হয় নি। যাহোক সিদ্ধান্ত বা উপসংহারটি ছিল আরো বেশি নির্ভুল। পর্যবেক্ষণকৃত হাইড্রোজেনের পরিমাণ থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, প্রথম কয়েক মিনিটে মহাবিশ্ব বিপুল পরিমাণ বিকিরণ দ্বারা অবশ্যই পূর্ণ ছিল- যা বেশি পরিমাণ ভারী মৌল বা কণিকা সৃষ্টিতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিল। ঐ সময়ের পর থেকে মহাবিশ্বের প্রসারণ সমতুল্য তাপমাত্রাকে কমিয়ে সামান্য কয়েক ডিগ্রী কেলভিনে নিয়ে এসেছে যা এখন পটভূমি বেতার গুঞ্জন হিসেবে সবদিক থেকে সমানভাবে আসছে। পেনজিয়াস এবং উইলসনের আবিষ্কারের স্বাভাবিক ব্যাখ্যা হিসেবে দ্রুত এটাই দাঁড়িয়ে গেল। এভাবে এক অর্থে হলমডেল গ্রাহকযন্ত্র যে একটি বাক্সের মধ্যে অবস্থিত সেই বাক্সটিই হলো সম্পূর্ণ মহাবিশ্ব। যাহোক গ্রাহকযন্ত্র কর্তৃক পরিমাপকৃত সমতুল্য তাপমাত্রা কিন্তু বর্তমান মহাবিশ্বের তাপমাত্রা নয়, বরং এই সমতুল্য তাপমাত্রা হলো মহাবিশ্বের অনেক আগের তাপমাত্রা- যা ঐ সময় থেকে মহাবিশ্বের বিপুল প্রসারণের সাথে আনুপাতিক হারে হ্রাস পেয়েছে।

পিবল্‌স -এর কাজ ছিল সৃষ্টিতাত্ত্বিক সম্ভাবনা সম্বন্ধে একই ধরনের অনেকগুলো অনুমানের সর্বশেষ একটি। বস্তুত চল্লিশের দশকের শেষের দিকে জর্জ গ্যামো (George Gamow) ও তার সহযোগী র‍্যালফ আলফার (Ralph Alpher) এবং রবার্ট হেরম্যান (Robert Herman) পারমাণবিক সংশ্লেষণের 'মহাবিস্ফোরণ তত্ত্ব' উদ্ভাবন (Developed) করেন। ১৯৪৮ সালে আলফার এবং হেরম্যান এই তত্ত্বটি ব্যবহার করে ভবিষ্যতবাণী করেন যে, বর্তমানে মহাবিশ্বে প্রায় ৫°K তাপমাত্রার পটভূমি বিকিরণ রয়েছে। ১৯৬৪ সালে রাশিয়ায় ইয়া. বি. জেলডোভিচ (Ya.B. Zeldovich) এবং পৃথকভাবে ইংল্যান্ডে ফ্রেড হয়েল (Fred Hoyle) ও আর জে. টেলর (R.J. Tayler) গণনা করে একই ধরনের ফলাফল পান। বেল ল্যাবরেটরী ও প্রিন্সটনের দলগুলো আগের এই কাজ সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না। তাই এই কাজের সিদ্ধান্ত বা ফলাফল পটভূমি বিকিরণের প্রকৃত আবিষ্কার- এর উপর কোন প্রভাব বা প্রতিক্রিয়া (Effect) ফেলে নি। অতএব ষষ্ঠ অধ্যায়ে এই বিষয়ে বিস্তারিত বলার জন্য আমরা অপেক্ষা করবো। আগের কোন তাত্ত্বিক কাজই কেন মহাজাগতিক পটভূমি বিকিরণ অন্বেষণে প্ররোচিত করে নি সেই বিহ্বল করা ঐতিহাসিক প্রশ্নটি আমরা ষষ্ঠ অধ্যায়ে উপস্থাপন করবো।

পরীক্ষা ভিত্তিক গবেষণাকারী অভিজ্ঞ পদার্থবিদ রবার্ট এইচ.ডি.কে- এর ভাবনা দ্বারা পিবল্‌স- এর ১৯৬৫ সালের গণনা প্ররোচিত হয়েছিল। (অন্যান্য বিষয় ছাড়াও বেতার জ্যোতির্বিজ্ঞানী কর্তৃক ব্যবহৃত প্রধান মাইক্রোওয়েভ কৌশলগুলোর কয়েকটি ডিক আবিষ্কার করেছিলেন। ১৯৬৫ সালের কোন এক সময়ে ডিক ভাবতে লাগলেন মহাজাগতিক ইতিহাসের আদি, ঘন ও উত্তপ্ত পর্যায় থেকে পর্যবেক্ষণযোগ্য কিছু বিকিরণ অবশেষ হিসেবে এখনও টিকে রয়েছে কি না? ডিকের ভাবনার ভিত্তি ছিল স্পন্দনশীল বিশ্বের তত্ত্ব (Oscillating Theory of The Universe)। এই বইয়ের শেষ অধ্যায়ে আমরা এই বিষয়ে ফিরে আসবো। বিকিরণের বিষয়টি তার নিকট স্পষ্ট ভাবেই প্রতীয়মান হচ্ছিল, যদিও আপাত দৃষ্টিতে বিকিরণের সুনির্দিষ্ট তাপমাত্রা সম্পর্কে তাঁর কোন ধারণা ছিলনা। কিন্তু তিনি গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টি নিশ্চিতভাবে উপলব্ধি করেছিলেন তা হলো , খুঁজে দেখার মত অর্থবহ কিছু রয়েছে।

পি. জি. রোল (P.G. Roll) এবং ডি.টি. উইলকিনসন (D.T. Wilkinson) কে ডিক পরামর্শ দিলেন, তারা যেন মাইক্রোওয়েভ পটভূমি বিকিরণ খুঁজে বের করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখেন। এই উদ্দেশ্যে তারা কম গুঞ্জন সম্পন্ন একটি ছোট গ্রাহক যন্ত্র প্রিন্সটনের পালমার পদার্থবিদ্যা বিষয়ক ল্যাবরেটরীর ছাদে স্থাপন করলেন। (এই উদ্দেশ্যে বিরাট বেতার দুরবীক্ষণ যন্ত্র ব্যবহার করার প্রয়োজন নেই। কারণ বিকিরণ সকল দিক থেকেই আসে। তাই অধিকতর দৃঢ়ভাবে ফোকাস করা গ্রাহক যন্ত্রের আলোকরশ্মি দ্বারা কিছুই পাওয়া যায় না।)

ডিকের আগেই রোল (Roll) এবং উইলকিনসন তাঁদের পরিমাপ সমাপ্ত করতে পারলেন। পেনজিয়াস বার্ক-এর কাছ থেকে পিবল্‌স-এর কাজ সম্পর্কে সবেমাত্র জানতে পারেন এবং তিনি ডিক-কে টেলিফোন করেন। তাঁরা নভোপদার্থবিদ্যা বিষয়ক জার্নালে একজোড়া সহযোগী প্রবন্ধ প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সিদ্ধান্ত হলো, পেনজিয়াস এবং উইলসন তাদের পর্যবেক্ষণ সম্পর্কে ঘোষণা দেবেন এবং ডিক পিবল্‌স রোল ও উইলকিনসন -এর সৃষ্টিতাত্ত্বিক তাৎপর্যের ব্যাখ্যা দিবেন। পেনজিয়াস এবং উইলসন তখনও বেশ সতর্ক রইলেন। তাঁরা তাদের প্রবন্ধের একটি রক্ষণশীল ধরনের শিরোনাম দিলেন,"৪০৮০ মিলিয়ন সাইকেল/সেকেন্ড² কম্পন হারের গ্রাহক যন্ত্রে অতিরিক্ত তাপমাত্রা পরিমাপ।" (যে কম্পন হারে গ্রাহক যন্ত্রকে স্থাপন করা হয়েছিল তা ছিল প্রতি সেকেন্ডে ৪০৮০ মিলিয়ন চক্র; এর আনুষাঙ্গিক (Corresponding) তরঙ্গদৈর্ঘ্য হলো ৭.৩৫ সে.মি.। তাঁরা শুধু ঘোষণা দিলেন যে, পরিমাপ করে জেনিথের দিকে গুঞ্জনের যে কার্যকরী তাপমাত্রা পাওয়া গেছে তা প্রত্যাশিত মানের চেয়ে প্রায় ৩.৫°K বেশি। সৃষ্টিতত্ত্বের সাথে এর কোন সম্পর্কের বিষয় তাঁরা পুরোপুরি এড়িয়ে গেলেন। তাঁরা শুধু উল্লেখ করলেন যে একই সংখ্যায় ডিক, পিবল্‌স, রোল এবং উইলকিনসনের যৌথ প্রবন্ধে প্রদত্ত ব্যাখ্যাই সম্ভবত অতিরিক্ত গুঞ্জন তাপমাত্রার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

পেনজিয়াস এবং উইলসন কর্তৃক আবিষ্কৃত মাইক্রোওয়েভ বিকিরণ কি সত্যিই মহাবিশ্বের শুরু থেকে অবশেষ হিসেবে রয়েছে? এই প্রশ্ন নিষ্পত্তি করার জন্য ১৯৬৫ সালের পর থেকে যে সব পরীক্ষা পরিচালনা করা হয়েছে সেগুলো বিবেচনা করার আগে আমাদের প্রথমে জিজ্ঞাসা করা প্রয়োজন তাত্ত্বিকভাবে আমরা কি আশা করি এবং সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে প্রচলিত ধারণাগুলো যদি নির্ভুল বা শুদ্ধ হয় তাহলে মহাবিশ্ব যে বিকিরণে পূর্ণ তার সাধারণ ধর্মাবলী বা বৈশিষ্ট্য কি? মহাবিশ্ব প্রসারণের সাথে বিকিরণের ক্ষেত্রে কি ঘটেছে তা বিবেচনা করতে এ প্রশ্ন আমাদেরকে পথ দেখায়। এই প্রসারণ শুধু পারমাণবিক সংশ্লেষণের সময় বা প্রথম তিন মিনিটের পরে নয়, বরং এর পর থেকে যে দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হয়েছে- সেই সময়েও ঘটেছে।

আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত তড়িৎ চুম্বক তত্ত্বের মাধ্যমে বিকিরণের যে চিরায়ত চিত্র আলোচনা করেছি তা যদি এখন বাদ দেই এবং তার পরিবর্তে আরো আধুনিক 'কোয়ান্টাম তত্ত্ব' গ্রহণ করি, তবে তা আমাদের জন্য খুবই সহায়ক হবে। কোয়ান্টাম তত্ত্বে বলা হয় যে বিকিরণ ফোটন নামক কণা দ্বারা গঠিত বা সৃষ্ট। একটি সাধারণ আলোর তরঙ্গে বিপুল সংখ্যক ফোটন থাকে। এ ফোটনগুলো একত্রে একই দিকে ভ্রমণ করে। কিন্তু তরঙ্গগুলো কি পরিমাণ শক্তি বহন করে তা যদি খুব সুনির্দিষ্টভাবে

আমাদের পরিমাপ করতে হতো, তাহলে আমরা দেখতে পেতাম যে এই শক্তি সব সময়ই একটি নির্দিষ্ট রাশির গুণফলের সমান। এই রাশিটিকেই আমরা একটি একক ফোটনের শক্তি হিসেবে চিহ্নিত করি। যেহেতু ফোটনের শক্তি সাধারণভাবে খুবই কম তাই অধিকাংশ বাস্তব ক্ষেত্রে প্রতীয়মান হয় যে একটি তড়িত-চুম্বক তরঙ্গের যে কোন পরিমাণ শক্তি থাকতে পারে। যা হোক পরমাণু বা পরমাণুর নিউক্লিয়াসের সাথে বিকিরণের মিথষ্ক্রিয়ার সময়ে একবারে সচরাচর একটি মাত্র ফোটন অংশগ্রহণ করে এবং এ সব প্রক্রিয়া পরীক্ষা বা বিচার করার সময়ে তরঙ্গ-বর্ণনা গ্রহণের চেয়ে কণিকা-বর্ণনা গ্রহণ করা প্রয়োজন। ফোটনের ভর এবং আধান হলো শূন্য, তবুও তারা বাস্তব। প্রত্যেকটি ফোটন একটি নির্দিষ্ট শক্তি ও ভরবেগ বহন করে এবং এমন কি প্রত্যেকটি ফোটনের গতির দিকে নির্দিষ্ট ঘূর্ণনও রয়েছে।

কোন একটি একক ফোটন যখন মহাবিশ্বের মধ্যদিয়ে ভ্রমণ করে তখন তার ক্ষেত্রে কি ঘটে? বর্তমান মহাবিশ্বকে নিয়ে বলতে গেলে খুব বেশি কিছু নয়। ১০০০ কোটি আলোকবর্ষ দূরে যে বস্তু রয়েছে তার আলোও আমাদের কাছে সম্পূর্ণ নিখুঁতভাবেই পৌছে বলে মনে হয়। তাই আন্ত-গ্যালাক্সীয় স্থানে যে বস্তুই থাকুক না কেন তা অবশ্যই পর্যাপ্ত স্বচ্ছ হতে হবে যাতে ফোটনগুলো বিক্ষিপ্ত বা বিশোষিত না হয়ে মহাবিশ্বের বয়সের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ বা সময় ধরে ভ্রমণ করতে পারে।

যাহোক দূরের গ্যালাক্সীসমূহের লালসরণ থেকে আমরা জানতে পারি যে মহাবিশ্ব প্রসারমান। অতএব এর বস্তুসমূহ বর্তমানের চেয়ে অতীতের কোন এক সময়ের মহাবিশ্বে অধিকতর ঠাসাঠাসি বা গাদাগাদি অবস্থায় ছিল। যখন একটি ফ্লুয়িডের (Fluid) উপর চাপ প্রয়োগ করা হয় তখন এর তাপমাত্রা সাধারণত বৃদ্ধি পায়। অতএব আমরা সিদ্ধান্ত নিতে পারি যে মহাবিশ্বের বস্তুসমূহ অতীতে অধিকতর উত্তপ্ত ছিল। বস্তুত আমরা বিশ্বাস করি যে মহাবিশ্বের এমন একটি সময় ছিল যা সম্ভবত প্রথম সাত লক্ষ বছর, যখন মহাবিশ্বের বস্তুগুলো এত উত্তপ্ত ও ঘন ছিল যে ওগুলো নক্ষত্র এবং গ্যালাক্সী গঠন করতে পারছিল না এবং এমন কি অণুগুলোও তখন পর্যন্ত তাদের উপাদান নিউক্লিয়াস ও ইলেকট্রন রূপে পরস্পর থেকে পৃথক ছিল।

এ রকম অস্বস্তিকর অবস্থায় একটি ফোটন বাধাহীন বা মুক্তভাবে অপরিসীম দূরত্ব অতিক্রম করতে পারতো না, যা বর্তমান মহাবিশ্বে পারে। একটি ফোটন তার পথে বিপুল পরিমাণ মুক্ত ইলেকট্রন পেতো যা একে কার্যকরভাবে হয় বিক্ষিপ্ত (Scatter) করে ফেলতো অথবা শোষণ করে নিতো। যদি একটি ফোটন একটি ইলেকট্রন দ্বারা বিক্ষিপ্ত হয়, তবে হয় ফোটনটি ইলেকট্রনের কাছে কিছু শক্তি হারাবে না হয় ইলেকট্রন থেকে ফোটনটি কিছু শক্তি শোষণ করবে। এটা নির্ভর করবে প্রথমদিকে ফোটনের শক্তি ইলেকট্রন অপেক্ষা বেশি না কম ছিল তার উপর। একটি ফোটন বিশোষিত হবার বা ফোটনের শক্তির একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটার আগে একটি ফোটন যে গড় মুক্ত সময় (Mean free time) ভ্রমণ করতে পারতো তা হতো খুবই সংক্ষিপ্ত। এই ভ্রমণকাল মহাবিশ্বের বৈশিষ্ট্যসূচক সম্প্রসারণ সময়ের তুলনায় (Characteristic time of expansion of the Universe) খুবই কম হতো। এমন কি ইলেকট্রনসমূহ এবং পারমাণবিক নিউক্লিয়াসসমূহের মত অন্যান্য কণিকার জন্য এ গড় মুক্ত সময় হতো আরও সংক্ষিপ্ত বা অল্প। এভাবে যদিও প্রথম দিকে মহাবিশ্ব এক অর্থে খুব দ্রুত প্রসারিত হচ্ছিল- একটি একক ফোটন, একটি

একক ইলেকট্রন বা একটি পারমাণবিক নিউক্লিয়াসের জন্য প্রসারণ অনেক বেশি সময় নিচ্ছিল এবং মহাবিশ্বের প্রসারণের সঙ্গে প্রত্যেকটি কণিকার বিশেষিত হওয়া, বিক্ষিপ্ত হওয়া বা পূর্ণ নির্গত হবার জন্য এই সময় ছিল পর্যাপ্ত।

এই ধরনের কোন ব্যবস্থায় (System) যখন একটি একক কণিকা অনেকগুলো মিথস্ক্রিয়া করার জন্য সময় পায় তখন তা একটি স্থিতাবস্থায় চলে আসে। একটি নির্দিষ্ট পাল্লার বৈশিষ্ট্যসমূহে (অবস্থান, শক্তি, বেগ, ঘূর্ণন ইত্যাদি) কণিকার সংখ্যা এমন এক পর্যায়ে নেমে আসে যে প্রতি সেকেন্ডে যত সংখ্যক কণিকা ছিটকে ঐ পাল্লার বাইরে চলে আসবে ঠিক সেই সমসংখ্যক কণিকা ছিটকে পাল্লার ভিতরে ঢুকে পড়বে। এভাবে এমন একটি ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যসমূহ আদি শর্তাবলী দ্বারা নির্ধারিত না হয়ে বরং স্থিতাবস্থার শর্ত বা চাহিদা দ্বারা নির্ধারিত হবে। অবশ্যই এখানে স্থিতাবস্থা (Equilibrium) বলতে এই বুঝায় না যে, কণিকাগুলো জমে যায় (Frozen) - বরং স্থিতাবস্থাটি হলো পরিসংখ্যানগত। এভাবেই কণিকাগুলো অবস্থান, শক্তি, বেগ, ঘূর্ণন -- ইত্যাদিতে বিভাজিত হয়। এই 'স্থিতাবস্থা'র পরিবর্তন হয় না অথবা ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয়।

এ ধরনের পরিসংখ্যানগত স্থিতাবস্থা সচরাচর তাপীয় স্থিতাবস্থা (Thermal Equilibrium) হিসেবে পরিচিত। কারণ এই ধরনের 'স্থিতাবস্থার' পর্যায়কে সর্বদা একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রা দ্বারা সংজ্ঞায়িত করা হয়। এ তাপমাত্রা অবশ্য পুরো ব্যবস্থার সর্বত্র সুসম হবে। সত্যিকার অর্থে একমাত্র একটি তাপীয় স্থিতাবস্থাই তাপমাত্রাকে সুনির্দিষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত বা নির্ধারণ করতে পারে। পরিসংখ্যানগত বলবিদ্যা (Statistical Mechanics) নামে তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যার যে শক্তিশালী, সমৃদ্ধ ও জ্ঞানগর্ভ শাখা রয়েছে তা তাপীয় স্থিতাবস্থায় কোন ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যসমূহ হিসাব করার গাণিতিক কৌশল প্রদান করে।

তাপীয় স্থিতাবস্থা অনেকটা চিরায়ত অর্থনীতির মূল্য প্রক্রিয়ার মতই কাজ করে বলে অনুমান করা হয়। যদি সরবরাহের চাইতে চাহিদা বৃদ্ধি পায় তাহলে পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পাবে এবং তা প্রকৃত চাহিদাকে কিছুটা ছেটে ফেলবে ও তা উৎপাদন বৃদ্ধিতে উৎসাহ যোগাবে। যদি চাহিদার চেয়ে সরবরাহ বৃদ্ধি পায় তবে পণ্যের মূল্য কমে যাবে, কার্যকরী চাহিদা বৃদ্ধি পাবে ও অধিক উৎপাদনকে নিরুৎসাহিত করবে। উভয় ক্ষেত্রেই সরবরাহ এবং চাহিদা একটি সাম্যতায় পৌছবে। একই ভাবে শক্তি, বেগ ইত্যাদিসহ অনেক বেশি সংখ্যক কণিকা যদি কোন একটি নির্দিষ্ট পাল্লায় থাকে, তখন স্থিতাবস্থা প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত কণিকাগুলো যে হারে এই পাল্লায় প্রবেশ করে তার চেয়ে বেশি হারে এই পাল্লা ত্যাগ করবে। শক্তি, বেগ ইত্যাদিসহ অনেক কম সংখ্যক কণিকা যদি কোন একটি নির্দিষ্ট পাল্লায় (Range) থাকে তখন স্থিতাবস্থা প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত কণিকাগুলো যে হারে এই পাল্লায় প্রবেশ করে, তার চেয়ে কম হারে এই পাল্লা ত্যাগ করবে।

অবশ্যই চিরায়ত অর্থনীতিতে যেমনটি ধারণা করা হয় মূল্য প্রক্রিয়া ঠিক তেমনভাবে কাজ করে না। কিন্তু এখানেও যুক্তিটা খাটে - বাস্তব পৃথিবীতে অধিকাংশ ভৌত ব্যবস্থার ক্ষেত্রেই তাপীয় স্থিতাবস্থা নেই। নক্ষত্রগুলোর কেন্দ্রে প্রায় নিখুঁত তাপীয় স্থিতাবস্থা বিদ্যমান রয়েছে। তাই আমরা সেখানকার অবস্থা কিছুটা আস্থার সাথে

হিসাব করতে পারি। কিন্তু তাপীয় স্থিতাবস্থার কাছাকাছি কোন অবস্থা ভূপৃষ্ঠের কোথাও নেই এবং কাল বৃষ্টি হবে কিনা সে বিষয়ে আমরা নিশ্চিত হতে পারি না। মহাবিশ্ব কখনো নিখুঁত তাপীয় স্থিতাবস্থায় ছিল না। কারণ মোটের উপর এটা প্রসারমান। তবে আদি সময়ে মহাজাগতিক প্রসারণের হারের চেয়ে যখন একক কণিকাসমূহের বিক্ষিপ্ত হওয়া বা বিশোষিত হওয়ার হার অনেক বেশি ছিল, তখন মহাবিশ্ব এক নিখুঁত তাপীয় স্থিতাবস্থা থেকে ধীরে ধীরে অপর এক তাপীয় স্থিতাবস্থায় বিবর্তিত হচ্ছিল বলে ধরে নেয়া যায়।

মহাবিশ্ব এক এক সময়ে এক একটি তাপীয় স্থিতাবস্থা অতিক্রম করে এসেছে বলে এই বইতে যে যুক্তি উপস্থাপন করা হয়েছে তা সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ (Crucial)। পরিসংখ্যানগত বলবিদ্যার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যখনই আমরা একটি ব্যবস্থার (System) তাপমাত্রা এবং কয়েকটি সংরক্ষিত সংখ্যার ঘনত্ব সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করি, তখনই তাপীয় স্থিতাবস্থায় থাকা কোন ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যসমূহ সম্পূর্ণরূপে নির্ধারিত হয়ে যায়। এক্ষেত্রে বলা যায় মহাবিশ্বের আদি অবস্থার অতি সামান্য চিহ্ন বা স্মৃতিই অবশিষ্ট রয়েছে। মহাবিশ্বের সৃষ্টিলগ্নের ঘটনাবলীর ইতিহাস পুনর্নির্মাণ করতে চাইলে আমাদেরকে একটা অসহায় অবস্থাতে পড়তে হয়। তবে তা এমন একটা সুবিধাও প্রদান করে যার ফলে অনেকগুলো যাদৃচ্ছিক কল্পনা ব্যতিরেকে আমরা সৃষ্টিলগ্নের ঘটনা প্রবাহের গতি সম্পর্কে সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে পারি।

আমরা দেখেছি যে পেনজিয়াস এবং উইলসন কর্তৃক আবিষ্কৃত মাইক্রোওয়েভ বিকিরণ মহাবিশ্বের স্থিতাবস্থা থেকে অবশেষ হিসেবে টিকে রয়েছে বলে বিশ্বাস করা হয়। অতএব পর্যবেক্ষণকৃত মাইক্রোওয়েভ পটভূমি বিকিরণের যে সব বৈশিষ্ট্য বা ধর্ম আমরা দেখতে আশা করি সেগুলো দেখার জন্য আমাদেরকে প্রশ্ন করতে হবে তাপীয় স্থিতাবস্থায় বস্তুর সাথে বিকিরণের সাধারণ ধর্মাবলীর সম্পর্ক কি?

বস্তুত সুনির্দিষ্টভাবে এটাই হলো সে প্রশ্ন যা কোয়ান্টাম তত্ত্বের উদ্ভব ঘটিয়েছে এবং ফোটনের মাধ্যমে বিকিরণের ব্যাখ্যা দিয়েছে। ১৮৯০ সালের দিকে জানা গেল যে তাপীয় স্থিতাবস্থায় বস্তুর সাথে বিকিরণের ধর্মাবলী শুধু তাপমাত্রার উপর নির্ভর করে। আরো সুনির্দিষ্টভাবে বলা যায় : একটি নির্দিষ্ট পাল্লার তরঙ্গদৈর্ঘ্যের মধ্যে প্রতি একক আয়তনে বিকিরণ শক্তির পরিমাণ একটি সর্বজনীন সূত্র (Universal Formula) দ্বারা প্রদান করা যায়। এ সূত্রে থাকে শুধু তরঙ্গদৈর্ঘ্য এবং তাপমাত্রা। ঐ একই সূত্র দ্বারা অনচ্ছ দেয়াল বেষ্টিত একটি বাক্সের অভ্যন্তরস্থ বিকিরণের পরিমাণ বের করা যায়। তাই একজন বেতার জ্যোতির্বিজ্ঞানী এই সূত্র ব্যবহার করে পর্যবেক্ষণকৃত বেতার গুঞ্জনের তীব্রতাকে সমতুল্য তাপমাত্রার মাধ্যমে ব্যাখ্যা করতে পারেন। অপরিহার্যভাবে একই সূত্র যে কোন তরঙ্গদৈর্ঘ্যে সম্পূর্ণরূপে শোষণ করে, এমন শোষক পৃষ্ঠ থেকে (প্রতি সেকেন্ডে প্রতি বর্গ সেন্টিমিটারে) নির্গত বিকিরণের পরিমাণ প্রদান করে। তাই এই ধরনের বিকিরণ কৃষ্ণকায়া বিকিরণ নামে পরিচিত। অর্থাৎ কৃষ্ণকায়া বিকিরণকে তরঙ্গদৈর্ঘ্যসহ শক্তির একটি নির্দিষ্ট বিভাজন দ্বারা সংজ্ঞায়িত করা হয় এবং শুধু তাপমাত্রার উপর নির্ভরশীল একটি সর্বজনীন সূত্র দ্বারা কৃষ্ণকায়া বিকিরণকে প্রকাশ করা যায়।

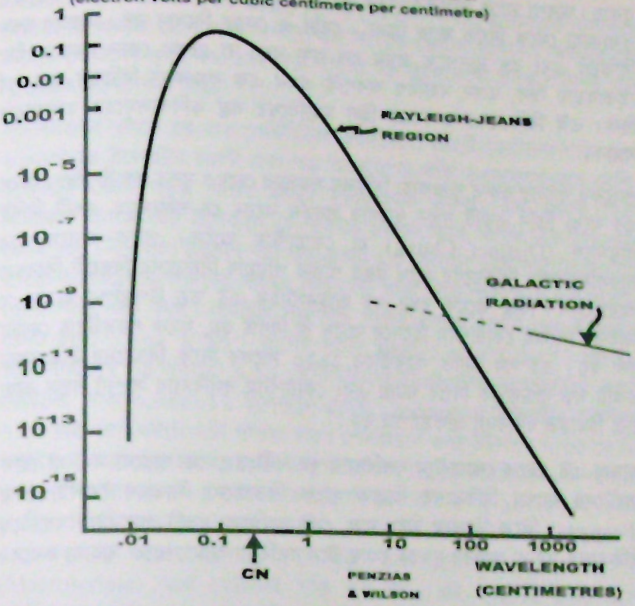

চিত্র ৭- প্লাংকে বিভাজন ঃ 3°K তাপমাত্রার কৃষ্ণকায়া বিকিরণের জন্য প্রতি একক তরঙ্গদৈর্ঘ্য পাল্লার মধ্যে শক্তিঘনত্বকে তরঙ্গদৈর্ঘ্যের অপেক্ষক হিসেবে উপরে দেখানো হয়েছে। (3°K -এর বেশি তাপমাত্রার ক্ষেত্রে যদি তা 'f' গুণ বেশি হয়, তখন তরঙ্গদৈর্ঘ্য 1/f গুণাকে দ্বারা গুণ করে কমাতে হয় এবং শক্তিঘনত্বকে f' দিয়ে গুণ করে বাড়াতে হয়।) বক্রতার (Curve) ডানদিকের সোজা অংশকে মোটামুটিভাবে সহজতর 'রেলি জিনস' বলে বর্ণনা করা হয়। এই অবনত রেখা কৃষ্ণকায়া বিকিরণ ছাড়াও অনেক ক্ষেত্রে প্রত্যাশিত। বিকিরণের কোয়ান্টাম প্রকৃতির জন্য বামদিকের রেখার খাড়া পতন রক্ষা করা যায়। আর এই খাড়া পতন হলো কৃষ্ণকায়া বিকিরণের সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য। আমাদের গ্যালাক্সী থেকে আগত বেতার তরঙ্গনের তীব্রতাকে 'গ্যালাকটিক রেডিয়েশন রেখা' দ্বারা দেখানো হয়েছে।

উনিশ শতকের শেষ সপ্তাহগুলোতে ম্যাক্স কার্ল আর্নেস্ট লুডজিগ প্লাংক (Max Karl Ernst Ludwig Plank) কৃষ্ণকায়া বিকিরণের সঠিক সূত্র আবিষ্কার করেন। নির্দিষ্ট 3°K তাপমাত্রায় পর্যবেক্ষণকৃত মহাজাগতিক মাইক্রোওয়েভ তরঙ্গন সুনির্দিষ্টভাবে চিত্র ৭- এ দেখানো হলো। প্লাংক এর সূত্রের সংক্ষিপ্ত ও বৈশিষ্ট্যসূচক বর্ণনা হলো : কৃষ্ণকায়া বিকিরণ পূর্ণ একটি বাক্সে যে কোন পাল্লার তরঙ্গদৈর্ঘ্যে বর্ধমান তরঙ্গদৈর্ঘ্যের সাথে সাথে শক্তি অত্যন্ত দ্রুতহারে বৃদ্ধি পেয়ে সর্বোচ্চে পৌছে এবং তারপর পুনরায় খাড়াভাবে পতিত হয়। এই প্লাংক বিভাজন (Plank Distribution) সর্বজনীন এবং বিকিরণ যেসব বস্তু কণিকার সাথে মিথস্ক্রিয়া করে সেই সব বস্তু কণিকার প্রকৃতির উপর তা (প্লাংক বিভাজন) নির্ভরশীল নয়। শুধু বস্তুকণিকার তাপমাত্রার উপর তা নির্ভরশীল। এখনকার দিনে ব্যবহৃত কৃষ্ণকায়া বিকিরণ বলতে তরঙ্গদৈর্ঘ্যের সাথে শক্তির বিভাজন সম্পন্ন যে কোন বিকিরণকে

বুঝায়। অবশ্য তাকে প্লাংকের সূত্রের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে। বিকিরণ সত্যিকার কৃষ্ণকায়া থেকে নির্গত হচ্ছে কিনা - সেটা এ ক্ষেত্রে বিবেচ্য নয়। এভাবে যখন বিকিরণ এবং বস্তু ন্যূনপক্ষে প্রথম দশ লক্ষ বছর বা তেমন কোন সময় তাপীয় স্থিতাবস্থায় ছিল, তখন মহাবিশ্ব অবশ্যই এমন এক কৃষ্ণকায়া বিকিরণ দ্বারা পূর্ণ ছিল। এই বিকিরণের তাপমাত্রা ছিল মহাবিশ্বের বস্তু কণিকাসমূহের তাপমাত্রার সমান।

প্লাংকের গণনার গুরুত্ব কৃষ্ণকায়া বিকিরণ সমস্যার চেয়েও সুদূর প্রসারী ছিল। কারণ এর মধ্যে তিনি একটি নতুন ধারণার প্রবর্তন করেন যে শক্তিসমূহ একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে (Distinct Chunk) বা কোয়ান্টায় আসে। প্লাংক প্রথমে মাত্র ভারসাম্যাবস্থায় বিকিরণের সাথে বস্তুর শক্তির পরিমাণ নির্ধারণের বিষয়টি বিবেচনা করেছিলেন। কিন্তু কয়েক বছর পর আইনস্টাইন এই তত্ত্ব উপস্থাপন করেন যে বিকিরণ নিজেই কোয়ান্টাম হিসেবে আসে বা নির্গত হয়, যাকে পরবর্তীতে ফোটন বলা হয়। এই সব উন্নতি পরবর্তীতে ১৯২০ সালের দিকে বিজ্ঞানের ইতিহাসের একটি বড় বুদ্ধিবৃত্তিক বিপ্লব ঘটায় এবং কোয়ান্টাম বলবিদ্যার সম্পূর্ণ নতুন ভাষ্য দ্বারা চিরায়ত বলবিদ্যা প্রতিস্থাপিত হয়।

আমরা এই বইতে কোয়ান্টাম বলবিদ্যার খুব গভীরে যেতে পারবো না। যা হোক ফোটনের ব্যাখ্যা বিকিরণের চিত্রকে প্লাংক বিভাজনের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলোর (Features) দিকে কিভাবে নিয়ে যায়, সেই আঙ্গিকে একটি প্রসারমান মহাবিশ্বে বিকিরণের ধর্ম বা আচরণ বুঝতে কোয়ান্টাম বলবিদ্যা আমাদেরকে সাহায্য করবে।

খুব দীর্ঘ তরঙ্গদৈর্ঘ্যে কৃষ্ণকায়া বিকিরণের শক্তিঘনত্ব কেন কমে যায় তা ব্যাখ্যা করা সহজ। যে সব বিকিরণের মাত্রা (Dimension) তরঙ্গদৈর্ঘ্যের চেয়ে কম, তাদেরকে যে কোন পরিমাণে একত্রিত করা কঠিন। কোয়ান্টাম তত্ত্ব ছাড়া তরঙ্গ তত্ত্ব দ্বারাই এটা ভালভাবে বুঝা যেত।

অপরপক্ষে খুব ছোট তরঙ্গদৈর্ঘ্যে কৃষ্ণকায়া বিকিরণের শক্তিঘনত্ব যে কমে যায়, তা কোয়ান্টাম তত্ত্ব ছাড়া ব্যাখ্যা করা যেত না। পরিসংখ্যানগত বলবিদ্যার একটি সুপরিচিত ফলাফল হলো এই যে, একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় কোন প্রকারের কণিকার বা তরঙ্গের (বা উত্তেজনার) শক্তি যদি একটি নির্দিষ্ট পরিমাণের চেয়ে বেশি হয়, তবে সেই সব কণিকা বা তরঙ্গ বা উত্তেজনা ইত্যাদি সৃষ্টি করা কঠিন। শক্তির এই নির্দিষ্ট পরিমাণ হবে তাপমাত্রার আনুপাতিক। যা হোক বিকিরণের তরঙ্গদৈর্ঘ্য যদি যাদৃচ্ছিক অল্প শক্তির হয়ে থাকে, তখন কোন কিছুই খুব ক্ষুদ্র তরঙ্গদৈর্ঘ্যের কৃষ্ণকায়া বিকিরণের সর্বমোট পরিমাণকে সীমিত করতে পারে না। পরীক্ষার সাথে শুধু এটাই পরস্পর বিরোধী ছিল না- এটা কৃষ্ণকায়া বিকিরণের সর্বমোট শক্তি অসীম হওয়ার মত ভয়াবহ বিপজ্জনক পরিণতিতে নিয়ে যেত। একমাত্র পথ ছিল এটা অনুমান করা যে শক্তি আসে গুচ্ছে গুচ্ছে (Chunks) বা কোয়ান্টাম রূপে। তরঙ্গদৈর্ঘ্য কমতে থাকার সাথে সাথে প্রতিটি শক্তি গুচ্ছের পরিমাণ বাড়তে থাকবে। ফলে একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় স্বল্প তরঙ্গদৈর্ঘ্যে গুচ্ছ যখন উচ্চ শক্তিতে থাকে তখন অত্যন্ত কম বিকিরণ হবে। এই বিষয়ে আইনস্টাইনের চূড়ান্ত অনুমান হলো (Hypothesis) যে কোন

ফোটনের শক্তি তরঙ্গদৈর্ঘ্যের ব্যস্তানুপাতিক। একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় কৃষ্ণকায়া বিকিরণের অত্যন্ত বেশি শক্তি সম্পন্ন অল্প সংখ্যক ফোটন থাকবে। অতএব স্বল্প সংখ্যক ফোটনের খুবই কম তরঙ্গদৈর্ঘ্য থাকায় স্বল্প তরঙ্গদৈর্ঘ্যে প্লাংক বন্টনের কমে যাওয়াকে ব্যাখ্যা করা যায়।

সুনির্দিষ্টভাবে বলতে হয় এক সেন্টিমিটার তরঙ্গদৈর্ঘ্যে একটি ফোটনের শক্তি হলো ০.০০০১২৪ ইলেকট্রন ভোল্ট এবং স্বল্প তরঙ্গদৈর্ঘ্যে শক্তি তুলনামূলকভাবে বেশি। ইলেকট্রন ভোল্ট হলো শক্তির একটি সুবিধাজনক একক। এক ভোল্ট বিভব পার্থক্যের জন্য একটি ইলেকট্রন যে শক্তিতে চলাচল করে, তাকে এক ইলেকট্রন ভোল্ট বলে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় একটি ১.৫ ভোল্টের ফ্লাশ লাইটের ব্যাটারী প্রতিটি ইলেকট্রনকে লাইটের বাল্বের ফিলামেন্ট ধাক্কা দিয়ে পাঠাতে ১.৫ ইলেকট্রন ভোল্ট শক্তি খরচ করে। (মেট্রিক পদ্ধতিতে শক্তির একক হিসাবে এক ইলেকট্রন ভোল্ট হলো ১.৬০২ X $১০^{-১২}$ আর্গের সমান অথবা ১.৬০২ X $১০^{-১৯}$ জুলস)। আইনস্টাইনের সূত্র অনুযায়ী ৭.৩৫ সেন্টিমিটার মাইক্রোওয়েভ তরঙ্গদৈর্ঘ্যের একটি ফোটনের শক্তি ০.০০০০১৭ ইলেকট্রন ভোল্ট। ০.০০০১২৪ ইলেকট্রন ভোল্টকে ৭.৩৫ দ্বারা ভাগ করলে এটা পাওয়া যায়। পেনজিয়াস এবং উইলসন ৭.৩৫ সে.মি. তরঙ্গদৈর্ঘ্যে তাদের গ্রাহক যন্ত্রকে বিন্যাস বা স্থাপন (Tune) করেছিলেন। অপরদিকে দৃশ্যমান আলোর একটি ফোটনের তরঙ্গদৈর্ঘ্য হবে প্রায় ৫ X $১০^{-৫}$ সে.মি. (এক সে.মি.-এর ত্রিশহাজার ভাগের একভাগ) এবং এর শক্তি হবে ০.০০০১২৪ X ২০,০০০ বা ২.৫ ইলেকট্রন ভোল্ট। উভয় ক্ষেত্রেই ম্যাক্রোস্কোপিক (Macroscopic) অর্থে ফোটনের শক্তি খুব কম। এই কারণেই ফোটনগুলো একত্রিত হয়ে বিকিরণের প্রবাহ সৃষ্টি করে বলে প্রতীয়মান হয়।

ঘটনাক্রমে, রাসায়নিক বিক্রিয়ার শক্তিসমূহ সাধারণত প্রতি অণুতে প্রতি ইলেকট্রনে এক ইলেকট্রন ভোল্ট হয়ে থাকে। উদাহরণ স্বরূপ একটি হাইড্রোজেন অণু থেকে একটি ইলেকট্রন বের করে নিয়ে আসতে সর্বমোট ১৩.৬ ইলেকট্রন ভোল্ট শক্তি খরচ হয়। কিন্তু এটা হলো এক ব্যতিক্রমধর্মী ও প্রবল (Violent) রাসায়নিক ঘটনা। সূর্যের আলোর ফোটনসমূহেরও এক ইলেকট্রন ভোল্ট বা তার কাছাকাছি শক্তি রয়েছে। এই বাস্তবতা আমাদের নিকট ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। এটাই জীবনের জন্য একান্ত অপরিহার্য সালোক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার মতো রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটায়। পারমাণবিক বিক্রিয়ায় প্রতিটি অণুর নিউক্লিয়াসে সাধারণত এক মিলিয়ন ভোল্ট মানের শক্তি থাকে। এ কারণে এক পাউন্ড প্লুটোনিয়ামে মোটামুটি এক মিলিয়ন পাউন্ড টিএনটির সমান বিস্ফোরক শক্তি থাকে।

কৃষ্ণকায়া বিকিরণের প্রধান গুণগত বৈশিষ্ট্যসমূহ ফোটন চিত্রের মাধ্যমে সহজেই বুঝা যায়। প্রথমত: পরিসংখ্যানগত বলবিদ্যার বিধিগুলো আমাদেরকে জানায় যে একটি প্রতিনিধিত্বমূলক (টিপিক্যাল) ফোটনের শক্তি হলো তাপমাত্রার আনুপাতিক। অথচ আইনস্টাইনের সূত্র অনুযায়ী যে কোন ফোটনের শক্তি তরঙ্গদৈর্ঘ্যের ব্যস্তানুপাতিক। এই দুটো বিধিকে একত্র করে আমরা জানতে পারি যে কৃষ্ণকায়া বিকিরণে ফোটনের তরঙ্গদৈর্ঘ্য তাপমাত্রার ব্যস্তানুপাতিকভাবে পরিবর্তিত হয়। পরিমাণগত ভাবে একে বলা যায় ঃ কৃষ্ণকায়া বিকিরণের অধিকাংশ শক্তি যে প্রতিনিধিত্বমূলক তরঙ্গদৈর্ঘ্যের

নিকটে কেন্দ্রীভূত বা একীভূত (Concentrated) হয়ে থাকে তাহলো ১°K তাপমাত্রায় ০.২৯ সে.মি. তরঙ্গদৈর্ঘ্যে এবং তা উচ্চতর তাপমাত্রায় আনুপাতিকভাবে কম।

উদাহরণ স্বরূপ ৩০০°K সাধারণ কক্ষ- তাপমাত্রায় একটি অনচ্ছ বস্তু কৃষ্ণকায়া বিকিরণ নির্গত করবে এবং এই বিকিরণের টিপিক্যাল তরঙ্গদৈর্ঘ্য হবে ০.২৯/৩০০ সে.মি. বা প্রায় এক সেন্টিমিটারের এক হাজার ভাগের এক ভাগ। এটা অবলোহিত বিকিরণের পাল্লার মধ্যে এবং এর তরঙ্গদৈর্ঘ্য এত দীর্ঘ যে আমাদের চোখ তা দেখতে পায় না। অপর পক্ষে সূর্যের পৃষ্ঠভাগের তাপমাত্রা প্রায় ৫৮০০°K এবং এর ফলে সূর্য থেকে নিঃসৃত আলোর শীর্ষ তরঙ্গদৈর্ঘ্য হয় প্রায় ০.২৯/৫৮০০ সেমি অর্থাৎ প্রায় এক সেন্টিমিটারের পাঁচ লক্ষ ভাগের এক ভাগ যা প্রায় ৫০০০ এ্যাঙস্ট্রম একক (Angstrom Units)। [এক এ্যাঙস্ট্রম একক এক সেন্টিমিটারের দশ কোটি ভাগের এক ভাগ বা ১০⁻⁸ সে.মি.।] আমরা যাকে দৃশ্যমান তরঙ্গদৈর্ঘ্য বলি এবং আমাদের চোখ যে তরঙ্গদৈর্ঘ্যে দেখতে সক্ষম, সেই তরঙ্গদৈর্ঘ্যের পাল্লার (Range) মাঝামাঝি স্থানে এর অবস্থান। বস্তুত এই তরঙ্গদৈর্ঘ্যসমূহ এতো ক্ষুদ্র হওয়ার কারণেই উনিশ শতক শুরুর আগে আলোর যে তরঙ্গ ধর্ম রয়েছে তা আবিষ্কার করা যায় নি। আলোর তরঙ্গ ধর্মের তখনই প্রমাণ পাই যখন আলো ক্ষুদ্র ছিদ্রের মধ্য দিয়ে সত্যিই অতিক্রম করে চলে যায় এবং আমরা অপবর্তন (Diffraction) হিসেবে আলোর তরঙ্গ সঞ্চালন ধর্ম দেখতে পাই।

আমরা দেখেছি দীর্ঘ তরঙ্গদৈর্ঘ্যে কৃষ্ণকায়া বিকিরণের শক্তিঘনত্ব হ্রাস পাওয়ার কারণ হলো, যে সকল বিকিরণের মাত্রা (Dimension) একটি তরঙ্গদৈর্ঘ্যের চেয়ে ক্ষুদ্রতর সেগুলোকে যে কোন আয়তনে (In any volume) রাখা (Putting) কঠিন। বস্তুত কৃষ্ণকায়া বিকিরণের ফোটনসমূহের গড় দূরত্ব প্রতিনিধিত্বমূলক ফোটনের তরঙ্গদৈর্ঘ্যের মোটামুটি সমান। কিন্তু আমরা দেখেছি এই প্রতিনিধিত্বমূলক তরঙ্গদৈর্ঘ্য তাপমাত্রার ব্যস্তানুপাতিক। এই কৃষ্ণকায়া বিকিরণে বিধি হলো এই যে একটি নির্দিষ্ট আয়তনে ফোটনের সংখ্যা হলো তাপমাত্রার ঘনফলের (Cube) সমানুপাতিক।

কৃষ্ণকায়া বিকিরণে শক্তির পরিমাণ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য আমরা এই সকল তথ্যকে সমন্বিত করতে পারি। সরলভাবে প্রতি লিটারে শক্তি বা 'শক্তিঘনত্ব' হলো প্রতি লিটারে ফোটন সংখ্যা ও ফোটন প্রতি গড়শক্তির গুণফল। কিন্তু আমরা দেখেছি যে প্রতি লিটারে ফোটন সংখ্যা হলো তাপমাত্রার ঘনফলের সমানুপাতিক। আবার ফোটনের গড়শক্তি হলো তাপমাত্রার আনুপাতিক। অতএব কৃষ্ণকায়া বিকিরণের লিটার প্রতি শক্তি হলো তাপমাত্রার ঘনফলের ও তাপমাত্রার গুণফলের আনুপাতিক বা অন্যভাবে তাপমাত্রার চতুর্থঘাতের (Fourth Power) আনুপাতিক। সংখ্যাগতভাবে একে প্রকাশ করতে চাইলে বলা যায়, ১°K তাপমাত্রায় কৃষ্ণকায়া বিকিরণের শক্তিঘনত্ব হলো লিটার প্রতি ৪.৭২ ইলেকট্রন ভোল্ট; ১০°K তাপমাত্রায় কৃষ্ণকায়া বিকিরণের শক্তিঘনত্ব হলো লিটার প্রতি ৪৭২০০ ইলেকট্রন ভোল্ট এবং অনুরূপ সংখ্যাসমূহ (এটাই স্টিফ্যান বোলতজম্যান সূত্র হিসেবে পরিচিত)। পেনজিয়াস ও উইলসন কর্তৃক আবিষ্কৃত বেতার গুঞ্জন যদি ৩°K তাপমাত্রার

কৃষ্ণকায়া বিকিরণের হয়ে থাকে, তাহলে অবশ্যই এর শক্তিঘনত্ব (Energy Density) হবে লিটার প্রতি ৪.৭২ ইলেকট্রন ভোল্ট ও ৩' -এর গুণফলের সমান বা লিটার প্রতি ৩৮০ ইলেকট্রন ভোল্ট। যখন তাপমাত্রা ১০০০ গুণ বেশি ছিল, শক্তিঘনত্ব ছিল মিলিয়ন মিলিয়ন গুণ বেশি।

এখন আমরা মাইক্রোওয়েভ বিকিরণের ধ্বংসাবশেষ (Fossil) -এর মূলে (Origin) যেতে পারি। আমরা দেখেছি অতীতে অবশ্যই কোন একটা সময় ছিল যখন মহাবিশ্ব এতো উত্তপ্ত ও ঘন ছিল যে পরমাণুসমূহ তাদের নিউক্লিয়াস ও ইলেকট্রনে বিচ্ছিন্ন ছিল এবং মুক্ত ইলেকট্রনের চতুষ্পার্শ্বে ছড়িয়ে থাকা ফোটন, বস্তু ও বিকিরণের মধ্যে একটি তাপীয় ভারসাম্যতা রক্ষা করছিল। সময় যতই অতিবাহিত হচ্ছিল মহাবিশ্ব ততই প্রসারিত ও শীতল হচ্ছিল এবং শেষ পর্যন্ত মহাবিশ্বের তাপমাত্রা প্রায় ৩০০০°K এ নেমে এলো। এই তাপমাত্রায় নিউক্লিয়াস ও ইলেকট্রনসমূহ একত্রিত হয়ে পরমাণু গঠন করতে সক্ষম হলো। (নভোপদার্থবিদ্যার পরিভাষায় একে সাধারণত পুন:সংযোজন (Recombination) বলা হয়। এককভাবে এটা একটি অশুদ্ধ টার্ম (Inappropriate Term)। কারণ আমরা বিবেচনা করছি যে মহাবিশ্বের ইতিহাসে পূর্বে কখনও নিউক্লিয়াস এবং ইলেকট্রন একত্রিত হয়ে পরমাণু গঠন করে নি।) মুক্ত ইলেকট্রন হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে যাবার কারণে বস্তু ও বিকিরণের মধ্যকার তাপীয় সংযোগ (Contact) ভেঙে গেল এবং তারপর বিকিরণ মুক্তভাবে প্রসারিত হতে লাগলো।

যে মুহূর্তে এটা ঘটলো তখন বিকিরণ ক্ষেত্রে শক্তি বিভিন্ন তরঙ্গদৈর্ঘ্যে তাপীয় স্থিতাবস্থার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছিল এবং প্লাংক এর কৃষ্ণকায়া বিকিরণের সূত্র দ্বারা বস্তুর তাপমাত্রার সমান যে তাপমাত্রা পাওয়া গেল তা হলো প্রায় ৩০০০°K। (বিশেষ করে) একটি প্রতিনিধিত্বমূলক ফোটনের তরঙ্গদৈর্ঘ্য এক মাইক্রন হয়ে থাকবে এবং ফোটনসমূহের মধ্যকার গড় দূরত্ব মোটামুটিভাবে (ফোটনের) এই প্রতিনিধিত্বমূলক তরঙ্গদৈর্ঘ্যের সমান হয়ে থাকবে।

তারপর থেকে ফোটনের ক্ষেত্রে কি ঘটেছে ? একক ফোটনসমূহ সৃষ্টিও হতে পারে নি, ধ্বংসও হতে পারে নি। অতএব ফোটনসমূহের মধ্যকার গড় দূরত্ব মহাবিশ্বের আকারের অনুপাতে শুধু বৃদ্ধি পেয়েছে। অর্থাৎ প্রতিনিধিত্বমূলক গ্যালাক্সীসমূহের গড় দূরত্বের অনুপাতে ফোটনের তরঙ্গদৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পাচ্ছিল। কিন্তু বিগত অধ্যায়ে আমরা দেখেছি যে মহাজাগতিক লালসরণের কারণে মহাবিশ্ব প্রসারণের সাথে সাথে যে কোন আলোকরশ্মির তরঙ্গদৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পেয়েছে। একই ভাবে যে কোন একক ফোটনের তরঙ্গদৈর্ঘ্য শুধু মহাবিশ্বের আকারের অনুপাতে বৃদ্ধি পেয়েছে। অতএব কৃষ্ণকায়া বিকিরণের মতো ফোটনসমূহ প্রায় প্রতিনিধিত্বমূলক এক তরঙ্গদৈর্ঘ্য-দূরত্বে অবস্থান করে। বস্তুত এই ধরনের যুক্তিতর্কের আলোকে সংখ্যাগতভাবে বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাই যে মহাবিশ্ব যখন প্রসারিত হচ্ছিল এবং এমন কি বিকিরণ বস্তুর সাথে যখন আর তাপীয় স্থিতাবস্থায় ছিল না, তখন এই মহাবিশ্ব যে বিকিরণে পূর্ণ ছিল তাকে প্লাংক-এর কৃষ্ণকায়া বিকিরণ সূত্র দ্বারা নিখুঁতভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। মহাবিশ্ব প্রসারণের একমাত্র ফলাফল ছিল মহাবিশ্বের আকার অনুপাতে প্রতিনিধিত্বমূলক ফোটনের তরঙ্গদৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পাওয়া। কৃষ্ণকায়া বিকিরণের তাপমাত্রা

প্রতিনিধিত্বমূলক তরঙ্গদৈর্ঘ্যের ব্যস্তানুপাতে পরিবর্তিত হয়। অতএব মহাবিশ্বের প্রসারণের সাথে সাথে এর কৃষ্ণকায়া বিকিরণ তাপমাত্রা ব্যস্তানুপাতে কমছিল।

উদাহরণস্বরূপ পেনজিয়াস এবং উইলসন যে স্থির মাইক্রোওয়েভ তরঙ্গ আবিষ্কার করেছিলেন তার তীব্রতা ছিল মোটামুটি ৩°K তাপমাত্রার সমতুল্য এবং মহাবিশ্বের তাপমাত্রা যখন খুবই উচ্চ ছিল (৩০০০°K) তখনকার তুলনায় মহাবিশ্বকে এক হাজার গুণ প্রসারিত করলে প্রত্যাশিত তাপমাত্রা যেমন হওয়া উচিত, এই ফলাফল ছিল তাই। যদি এই ব্যাখ্যা সঠিক হয়ে থাকে, তাহলে নভোবিজ্ঞানীদের প্রাপ্ত ৩°K - এর স্থির বেতার তরঙ্গ হলো সবচেয়ে প্রাচীন সংকেত যা আমাদের দেখতে পাওয়া দূরতম গ্যালাক্সীসমূহ থেকে আগত আলোর এবং এই আলো অনেক পূর্বেই নির্গত (Emitted) হয়েছে।

কিন্তু পেনজিয়াস এবং উইলসন স্থির মহাজাগতিক বেতার তরঙ্গের তীব্রতা মাত্র একটি তরঙ্গদৈর্ঘ্য ৭.৩৫ সে.মি. এ পরিমাপ করেছিলেন। শীঘ্রই এটা নির্ধারণ করা অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়লো যে মহাবিশ্বের বস্তু ও বিকিরণ যখন তাপীয় স্থিতাবস্থায় ছিল তখন থেকে যদি লালসরণকৃত বিকিরণ ধ্বংসাবশেষ বা ফসিল রূপে টিকে থাকে, তাহলে প্লাংক-এর কৃষ্ণকায়া বিকিরণের সূত্র দ্বারা ব্যাখ্যাকৃত বিকিরণ শক্তির বন্টনের সাথে যে তরঙ্গদৈর্ঘ্য পাওয়া যায় তা প্রত্যাশিত মানের ছিল কি না। যদি তাই হয়ে থাকে তাহলে পর্যবেক্ষণকৃত বেতার গুঞ্জনের তীব্রতার সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্লাংকের সূত্রের মাধ্যমে যে সমতুল্য তাপমাত্রা হিসাব করা হয়েছে তবে তা পেনজিয়াস এবং উইলসন কর্তৃক পর্যবেক্ষণকৃত ৭.৩৫ সে.মি. তরঙ্গদৈর্ঘ্যে যা হয়েছে, অন্যান্য সকল তরঙ্গদৈর্ঘ্যেও সেই একই পরিমাপের হবে।

আমরা দেখেছি যে পেনজিয়াস এবং উইলসনের আবিষ্কারের সময়ে মাইক্রোওয়েভ বিকিরণের পটভূমি খুঁজে বের করার আর একটি প্রয়াস নিউজার্সিতে চলছিল। বেল ল্যাবরেটরী এবং প্রিন্সটন গ্রুপ কর্তৃক জোড়া মূল প্রবন্ধ প্রকাশিত হবার অল্প পরেই রোল এবং উইলকিনসন তাঁদের নিজস্ব ফলাফল প্রকাশ করলেন। এই ফলাফল অনুযায়ী ৩.২ সে.মি. তরঙ্গদৈর্ঘ্য বিকিরণের পটভূমিতে সমতুল্য তাপমাত্রা ছিল ২.৫০ এবং ৩.৫০ কেলভিন। অর্থাৎ পর্যবেক্ষণকৃত ত্রুটিকে বিবেচনায় নিয়ে বিকিরণকে প্লাংকের সূত্র দ্বারা ব্যাখ্যা করা হলে ৩.২ সে.মি. তরঙ্গদৈর্ঘ্য অপেক্ষা ৭.৩৫ সে.মি. তরঙ্গদৈর্ঘ্যের স্থির মহাজাগতিক বেতার তরঙ্গের তীব্রতা যে অনুপাতে বেশি হওয়া উচিত - তা ছিল ঠিক সেই প্রত্যাশিত মানের।

১৯৬৫ সালের পর থেকে ধ্বংসাবশেষ মাইক্রোওয়েভ বিকিরণের তীব্রতাকে বেতার নভোবিজ্ঞানীরা এক ডজন তরঙ্গদৈর্ঘ্যের জন্য পরিমাপ করেন। এগুলোর বিস্তৃতি ছিল ৭৩.৫ সে.মি. থেকে ০.৩৩ সে.মি. পর্যন্ত। ২.৭°K থেকে ৩°K তাপমাত্রার মধ্যে এই সকল প্রত্যেকটি পরিমাপে তরঙ্গদৈর্ঘ্যের বিপরীতে শক্তির বিভাজন ছিল প্লাংক-সূত্রের সংগে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

যা হোক, এটা সত্যিই কৃষ্ণকায়া বিকিরণ কিনা সেই সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে আমাদের স্মরণ করা প্রয়োজন, যে প্রতিনিধিত্বমূলক তরঙ্গদৈর্ঘ্যে প্লাংকের শক্তির বণ্টন সর্বোচ্চমানে পৌঁছে তা হলো ০.২৯ সেন্টিমিটারকে তাপমাত্রা (কেলভিন ডিগ্রী) দ্বারা

ভাগ করে যে মান পাওয়া যায়, তার সমান। ৩°K তাপমাত্রার জন্য এর মান দাঁড়ায় ০.১ সেন্টিমিটার। এভাবে সকল মাইক্রোওয়েভ পরিমাপের সর্বোচ্চ মান ছিল প্লাংক বল্টনের দীর্ঘতর তরঙ্গদৈর্ঘ্যের দিকে। কিন্তু আমরা জানি যে বর্ণালীর এই অংশে শক্তিঘনত্ব বৃদ্ধির সাথে তরঙ্গদৈর্ঘ্য কমে আসার কারণ হলো অল্প ঘন আয়তনের স্থানে বেশি দীর্ঘ তরঙ্গদৈর্ঘ্যের বিকিরণকে ধারণ করার অসুবিধা। এছাড়া বর্ণালীর এই অংশে বিভিন্ন ধরনের বিকিরণ ক্ষেত্র বিদ্যমান থাকে। তাপীয় ভারসাম্যাবস্থায় যে সব বিকিরণ ক্ষেত্র তৈরী হয় নি - সে ধরনের বিকিরণ ক্ষেত্রও এতে অন্তর্ভুক্ত থাকে। (বেতার নভোপদার্থবিদরা বর্ণালীর এই অংশকে রেলি-জিনস (Rayleigh-Jeans) অংশ বলেন, কারণ লর্ড রেলি এবং স্যার জেমস জিনস (Lord Rayleigh and Sir James Jeans) এটা প্রথম ব্যাখ্যা করেছিলেন।) আমরা সত্যিকার কৃষ্ণকায়া বিকিরণ দেখছি কি না সেটা যাচাই করার জন্য প্লাংক বল্টনের সর্বোচ্চ মানের বাইরের স্বল্প তরঙ্গদৈর্ঘ্য অংশে যাওয়া উচিত এবং পরীক্ষা করা উচিত যে কোয়ান্টাম তত্ত্বের প্রত্যাশা অনুযায়ী ক্রমহ্রাসমান তরঙ্গদৈর্ঘ্যে শক্তিঘনত্ব সত্যি কমে যায় কি না। ০.১ সে.মি. নীচের তরঙ্গদৈর্ঘ্যে আমরা বস্তুত বেতার বা মাইক্রোওয়েভ জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের ক্ষেত্রের বাইরে নবতর এক প্রকার অবলোহিত জ্যোতির্বিজ্ঞানে পৌঁছি।

দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমাদের গ্রহের বায়ুমন্ডল ০.৩ সে.মি.-এর বেশি তরঙ্গদৈর্ঘ্যে বেশ স্বচ্ছ। তবে ক্ষুদ্রতর তরঙ্গদৈর্ঘ্যে তা ক্রমান্বয়েই অধিকতর অস্বচ্ছ হতে থাকে। মাটি বা ভূমিতে স্থাপিত যে কোন বেতার পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র, এমন কি যদি তা পর্বতের শিখরেও স্থাপন করা হয়, তবে তা ০.৩ সে.মি. তরঙ্গদৈর্ঘ্যের চেয়ে অনেক ক্ষুদ্রতর তরঙ্গদৈর্ঘ্যের মহাজাগতিক বিকিরণকে পরিমাপ করতে সক্ষম হবে বলে মনে হয় না।

এই অধ্যায়ে বর্ণনাকৃত পটভূমি বিকিরণ পরিমাপের বহু পূর্বেই নভোবিজ্ঞানীগণ ক্ষুদ্রতর তরঙ্গদৈর্ঘ্যের বিকিরণকে রেডিও বা ইনফ্রারেড টেলিস্কোপের পরিবর্তে অপটিক্যাল টেলিস্কোপের মাধ্যমে পরিমাপ করেছিলেন। অফিউসাস (Ophiuchus) নক্ষত্র মন্ডলে একটি আন্ত-নাক্ষত্রিক গ্যাসের মেঘ রয়েছে। এই মেঘ পৃথিবী এবং অফিউসাস নামক উত্তপ্ত সাধারণ একটি নক্ষত্রের মধ্যবর্তী স্থানে রয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। অফিউসাস নক্ষত্রের বর্ণালীতে কতগুলো অস্বাভাবিক কালো বন্ধনী বা ফিতার মত দাগ রয়েছে। এটা এই ইঙ্গিত দেয় যে, বাধা সৃষ্টিকারী অন্তবর্তী মেঘের গ্যাসসমূহ একসেট তীক্ষ্ণ তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো শোষণ করে। এগুলো হলো সেই তরঙ্গদৈর্ঘ্য যাতে ফোটনসমূহের প্রয়োজনীয় ঠিক সেই শক্তি থাকে এবং যা হলে তারা (ফোটন) মেঘের গ্যাসের অণুগুলোকে নিম্ন শক্তিস্তর থেকে উচ্চ শক্তিস্তরে যেতে উৎসাহিত করে। (পরমাণুর মতই অণুসমূহ মাত্র সুনির্দিষ্ট বা কোয়ান্টায়িত অবস্থায় বিদ্যমান থাকে।) এভাবে তরঙ্গদৈর্ঘ্য পর্যবেক্ষণ করে এবং তার কোথায় কালো বন্ধনী রয়েছে দেখে এ সকল অণুর প্রকৃতি এবং এগুলো কি অবস্থায় রয়েছে সে সম্পর্কে কিছুটা সিদ্ধান্তে পৌছা সম্ভব।

অফিউসাস নক্ষত্রের বর্ণালীতে ৩৮৭৫ এ্যাঙগষ্ট্রম (এক সে.মি.- এর ৩৮.৭৫ মিলিয়ন ভাগের এক ভাগ) একক তরঙ্গদৈর্ঘ্যের একটি বিশোষণ রেখা এই ইঙ্গিত দেয় যে, আন্ত-নাক্ষত্রিক মেঘে একটি কার্বন ও একটি নাইট্রোজেন পরমাণু সমন্বয়ে তৈরি একটি সায়ানোজেন (CN) অণু রয়েছে। যথাযথভাবে বলা উচিত যে,

সায়ানোজেন (CN) হল একটি যৌগমূলক (Radical)। তার মানে সাধারণ অবস্থায় অন্যান্য পরমাণুর সাথে এটা দ্রুতই মিলিত হয়ে হাইড্রোসায়ানোজেনের (HCN) মত বিষাক্ত অধিকতর স্থায়ী অণু গঠন করে। আন্ত-নাক্ষত্রিক স্থানে সায়ানোজেন বেশ স্থায়ী হয়।] ১৯৪১ সালে ডব্লিউ, এস, এডামস (W.S. Adams) এবং এ, ম্যাকলার (Mekellar) আবিষ্কার করেন যে, এই বিশোষণ রেখাটি প্রকৃতপক্ষে বিশ্লিষ্ট (Split)। অর্থাৎ এটি ৩৮৭৪.৬০৮ অ্যাঙগস্ট্রম, ৩৮৭৫.৭৬৩ অ্যাঙগস্ট্রম এবং ৩৮৭৩.৯৯৮ অ্যাঙগস্ট্রম একক তরঙ্গদৈর্ঘ্যের তিনটি রেখার সমন্বয়ে গঠিত। এই বিশোষণ রেখাগুলির মধ্যে প্রথমটি এমন এক ক্ষণস্থায়ী (Transition) অবস্থা নির্দেশ করে, যে অবস্থায় সায়ানোজেন অণু এর সর্বনিম্ন শক্তিস্তর (Ground state) থেকে একটি কম্পনশীল (Vibrating) অবস্থায় উন্নীত হয় এবং এমন কি সায়ানোজেন যদি শূন্য তাপমাত্রায়ও থাকে তাহলেও বিশোষণ রেখা উৎপন্ন হবে বলে আশা করা যায়। তবে সর্বনিম্ন শক্তিস্তরের থেকে ঠিক উপরের ঘূর্ণায়মান স্তর (Rotating State) থেকে অন্যান্য কম্পনশীল স্তরে (Vibrating State) সায়ানোজেন অণু উন্নীত হওয়ার সময়ে শুধু অন্যান্য দুটো বিশোষণ রেখা তৈরি হতে পারে। এভাবে সায়ানোজেন অণুর একটা ভাল অংশ আন্ত-নাক্ষত্রিক মেঘে ঘূর্ণায়মান স্তরে থাকে। সর্বনিম্ন শক্তিস্তর ও ঘূর্ণায়মান স্তরের মধ্যে জ্ঞাত শক্তির পার্থক্য এবং পর্যবেক্ষণকৃত বিভিন্ন বিশোষণ রেখার আপেক্ষিক তীব্রতা ব্যবহার করে ম্যাকলার (Mckellar) নিরূপণ করেন যে, সায়ানোজেনকে এক ধরনের বিকার বা উত্তেজনার (Perturbation) সম্মুখীন হতে হয়, এই বিকার বা উত্তেজনার কার্যকর তাপমাত্রা হলো ২.৩°K এবং এই তাপমাত্রাই সায়ানোজেন অণুকে ঘূর্ণায়মান স্তরে উন্নীত করে।

এই রহস্যময় বিকারকে মহাবিশ্বের সৃষ্টিতত্ত্বের সাথে যুক্ত করার মত কোন কারণ সেই সময়ে খুঁজে পাওয়া যায় নি এবং তা পর্যাপ্ত মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারে নি। যাহোক ১৯৬৫ সালে ৩ °K মহাজাগতিক পটভূমি বিকিরণ আবিষ্কার হওয়ার পর জর্জ ফিল্ড (George Field), আই এস,শকোভস্কি (I.S.Shklovsky) এবং এন,জে,উলফ (N.J.Woolf) অনুধাবন করেন যে, এটাই (৩°K তাপমাত্রার পটভূমি বিকিরণ) ছিল সেই বিঘ্ন (Perturbation) যা ১৯৪১ সালে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিল এবং এর কারণেই নক্ষত্রমন্ডল অফিউসাস -এর মেঘের সায়ানোজেন অণুতে ঘূর্ণন সৃষ্টি হয়। এই ঘূর্ণন সৃষ্টির জন্য কৃষ্ণকায়া ফোটনের যে তরঙ্গদৈর্ঘ্য প্রয়োজন তা ০.২৬৩ সে.মি.। ভূমিভিত্তিক বেতার জ্যোতির্বিদ্যার মাধ্যমে যে সকল তরঙ্গদৈর্ঘ্য গ্রহণ করা যায়, এটা হলো তার চেয়ে কম। কিন্তু এর পরেও এটা এতো ছোট নয় যে ৩ °K তাপমাত্রার প্রান্ত বন্টনে ০.১ সে.মি. নিচের তরঙ্গদৈর্ঘ্যসমূহের যে দ্রুত পতন ঘটে (Fall off) তা পরীক্ষা করা যায় না।

তারপর থেকে সায়ানোজেন বা অন্য কোন অণু অন্যান্য ঘূর্ণন স্তরে থাকার জন্য যে বিশোষণ রেখা সৃষ্টি হয়, তা খুঁজে বের করার জন্য প্রচেষ্টা চালানো হয়। দ্বিতীয় আন্ত-নাক্ষত্রিক সায়ানোজেনের ঘূর্ণন স্তর পর্যবেক্ষণ করে ১৯৭৮ সালে যে তীব্রতার বিকিরণ পাওয়া যায়, তার তরঙ্গদৈর্ঘ্য ছিল ০.১৩২ সে.মি. এবং তাপমাত্রা ছিল ৩°K। যা হোক, এই ধরনের পর্যবেক্ষণ এতদিন বিকিরণ শক্তিঘনত্বের শুধু উচ্চ সীমা নির্ধারণ করেছে এবং এর তরঙ্গদৈর্ঘ্য হলো ০.১ সে.মি. থেকে ক্ষুদ্রতর। এসব

ফলাফল ছিল উৎসাহব্যঞ্জক, কেননা ০.১ সে.মি. তরঙ্গদৈর্ঘ্যের কাছাকাছি বিকিরণ শক্তিঘনত্ব এত দ্রুত পড়তে শুরু করে যা কৃষ্ণকায়া বিকিরণের ক্ষেত্রেই আশা করা যায়। যা হোক এটা সত্যিকার কৃষ্ণকায়া বিকিরণ কিনা তা যাচাই করতে বা একটি সুনির্দিষ্ট বিকিরণ তাপমাত্রা নির্ধারণ করতে তরঙ্গদৈর্ঘ্যের এই সকল উচ্চ সীমা অনুমোদন করে না।

পৃথিবীর বায়ুমন্ডলের উপরে একটি বেলুন বা রকেটের স্থাপিত একটি অবলোহিত (Infrared) রশ্মি গ্রাহক যন্ত্রের মাধ্যমে শুধু এই সমস্যা সমাধান সম্ভব ছিল। এই পরীক্ষাগুলো ছিল ভীষণ কঠিন এবং প্রথম দিকে এগুলো এমন সামঞ্জস্যহীন ফলাফল দিত যে, কখনো তা স্ট্যান্ডার্ড কসমোলজির পক্ষে আবার কখনো বিপক্ষের জন্য উৎসাহব্যঞ্জক হয়ে দাঁড়াতো। কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি রকেট গ্রুপ প্রাংক কৃষ্ণকায়া বিভাজনে যেমনটি আশা করা যায় তার চেয়েও ক্ষুদ্র তরঙ্গদৈর্ঘ্যের অনেক বেশি বিকিরণ বের করলেন। আবার এম আই টি'র একটি বেলুন গ্রুপ যে ফলাফল পেলেন তা ছিল কৃষ্ণকায়া বিকিরণের প্রত্যাশিত মানের সাথে মোটামুটি সংগতিপূর্ণ। উভয় গ্রুপই কাজ চালিয়ে যেতে লাগলেন এবং ১৯৭২ সালের মধ্যে উভয় গ্রুপই এই কাছাকাছি। ১৯৭৬ সালে বার্কলে বিশ্ববিদ্যালয়ের বেলুন গ্রুপ নিশ্চিত করলেন যে, ০.২৫ সে.মি. থেকে ০.০৬ সে.মি. পাল্লার ক্ষুদ্রতর তরঙ্গদৈর্ঘ্যে বিকিরণের শক্তিঘনত্ব (Radiation Energy Density) ক্রমাগত এমনভাবে পড়তে শুরু করে যা ০.১°K থেকে ৩°K তাপমাত্রায় প্রত্যাশিত। এখন এটা চূড়ান্ত বলেই মনে হয় যে মহাজাগতিক পটভূমি বিকিরণ সত্যিই একটি কৃষ্ণকায়া বিকিরণ এবং এর তাপমাত্রা হলো ৩°K।

পাঠক হয়তো এই বিষয়ে বিস্ময় বোধ করতে পারেন যে, অবলোহিত রশ্মি গ্রাহক যন্ত্রপাতি সম্বলিত একটি কৃত্রিম উপগ্রহ পৃথিবীর বায়ুমন্ডলের যথেষ্ট উপরে স্থাপন করে এবং প্রয়োজনীয় ও পর্যাপ্ত সময় নিয়ে নিখুঁত পরিমাপের মাধ্যমে কেন এই প্রশ্নটির নিষ্পত্তি করা গেল না। আসলে আমি নিশ্চিত নই কেন এটা অসম্ভব ছিল। ৩°K -এর মত স্বল্প বিকিরণ তাপমাত্রা পরিমাপ করার জন্য যন্ত্রপাতিকে তরল হিলিয়াম (Cold load) দ্বারা শীতল করতে হয় এবং এই ধরনের সায়ানোজেনিক যন্ত্রপাতি পরিবহণ করে একটি ভূ-উপগ্রহে স্থাপনের কোন প্রযুক্তি বিদ্যমান নেই। যাহোক কেউ কেউ হয়তো ভাববেন যে, এই সব সত্যিকার মহাজাগতিক অনুসন্ধানে মহাশূন্য বাজেটের বৃহত্তম অংশ ব্যয় করা উচিত।

মহাজাগতিক পটভূমি বিকিরণের বিভাজনকে তরঙ্গদৈর্ঘ্য ও দিকসহ যখন আমরা বিবেচনা করি তখন ভূপৃষ্ঠের বায়ুমন্ডলের উপরে পর্যবেক্ষণ পরিচালনার বিষয়টি আরো গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে। সকল পর্যবেক্ষণেই যে ফলাফল পাওয়া যায় তা হলো পটভূমি বিকিরণ নিখুঁতভাবে দিক-নিরপেক্ষ বা Isotropic। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে এটা হলো 'মহাজাগতিক তত্ত্বের সূত্র'-এর পক্ষে সবচেয়ে শক্তিশালী যুক্তি। যা হোক শুধু পৃথিবীর বায়ুমন্ডলের কারণে মহাজাগতিক পটভূমি বিকিরণের সম্ভাব্য দিক-নির্ভরশীলতার পার্থক্য বের করা খুবই কঠিন। বস্তুতপক্ষে পটভূমি বিকিরণ তাপমাত্রা পরিমাপ করার সময়ে একে দিক-নিরপেক্ষ ধরে আমাদের বায়ুমন্ডলের বিকিরণ থেকে পটভূমি বিকিরণকে পৃথক করা হয়।

মাইক্রোওয়েভ পটভূমি বিকিরণের দিক-নির্ভরশীলতার যে বিষয়টি এর পর্যবেক্ষণকে আকর্ষণীয় করেছে তা হলো, এই বিকিরণের তীব্রতা নিখুঁতভাবে দিক-নিরপেক্ষ হওয়া প্রত্যাশিত নয়। সামান্য দিক পরিবর্তনের সাথে সাথে বিকিরণের তীব্রতার হ্রাস-বৃদ্ধি (Fluctations) ঘটা বাঞ্ছনীয়। এর কারণ হলো, হয় বিকিরণ নির্গত হওয়ার সময়ে অথবা তার পরে সত্যিকার পিন্ডাকৃতির মহাবিশ্ব থেকে তা বের হয়েছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, গঠনের প্রথম স্তরগুলোতে গ্যালাক্সীসমূহ হয়তো বা আকাশে উষ্ণ দাগ হিসেবে দেখা দিয়ে থাকবে এবং গড় তাপমাত্রার চেয়ে গ্যালাক্সীসমূহের কৃষ্ণকায়া তাপমাত্রা ছিল সামান্য বেশি এবং এই দাগসমূহ (Spot) সম্ভবত অর্ধ মিনিটের বেশি চাপ (Arc) অবধি বিস্তৃত হয়ে থাকবে। অধিকন্তু মহাবিশ্বের মধ্যে পৃথিবীর গতির কারণে পুরো আকাশে বিকিরণের তীব্রতার মধ্যে মসৃণতার সামান্য তারতম্য রয়েছে। পৃথিবী সূর্যের চারদিকে প্রতি সেকেন্ডে ৩০ কিলোমিটার বেগে ঘুরছে এবং আমাদের গ্যালাক্সীর ঘূর্ণনের ফলে সৌরজগত প্রতি সেকেন্ডে ২৫০ কি. মি. বেগে গ্যালাক্সীর চারদিকে ঘুরছে। এই মহাজগতের অন্যান্য প্রতিনিধিত্বমূলক গ্যালাক্সীর তুলনায় আমাদের গ্যালাক্সীর বেগ কত, তা কেউ সুনির্দিষ্টভাবে জানে না। কিন্তু ধারণা করা হয় প্রতি সেকেন্ডে এটা কয়েক শত কিলোমিটার বেগে কোন এক দিকে যাচ্ছে। উদাহরণ স্বরূপ যদি আমরা ধরে নিই যে মহাবিশ্বের গড় বস্তুর (Matter) তুলনায় এটা প্রতি সেকেন্ডে ৩০০ কিলোমিটার বেগে চলছে তাহলে পটভূমি বিকিরণের তুলনায় পৃথিবীও একই বেগে চলছে। তাই পৃথিবীর গতির অনুকূল দিক থেকে যে পটভূমি বিকিরণ আসে তার তরঙ্গদৈর্ঘ্য আলোর বেগের তুলনায় ৩০০ কি.মি./ সেকেন্ড বেগে কমবে। আবার পৃথিবীর গতির প্রতিকূল দিক থেকে যে পটভূমি বিকিরণ আসে তার তরঙ্গদৈর্ঘ্য আলোর বেগের তুলনায় ৩০০ কি.মি./সেকেন্ড বেগে বাড়বে। এই বেগ আলোর বেগের ০.১ শতাংশ। এভাবে সমতুল্য বিকিরণ তাপমাত্রা দিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে খুব সূক্ষ্মভাবে পরিবর্তিত হবে। আর এই পরিবর্তনের মান হবে - পৃথিবী যে দিকে যাচ্ছে সেদিকে যে গড় মান তার চেয়ে প্রায় ০.১% বেশি এবং যে দিক থেকে আমরা আসছি (অর্থাৎ পৃথিবী আসছে) সেই দিকে প্রায় ০.১% কম। বিগত কয়েক বছর ধরে দিক-নির্ভরতার জন্য যে কোন দিকে সমতুল্য বিকিরণ তাপমাত্রা পরিবর্তনের সর্বোত্তম উচ্চসীমা ছিল প্রায় ০.১%। এ জন্যই আমরা মহাবিশ্বের মধ্য দিয়ে পৃথিবীর বেগ পরিমাপে সম্পূর্ণ সক্ষম ছিলাম না। যতদিন পৃথিবীর কক্ষে স্থাপিত উপগ্রহ থেকে পরিমাপ গ্রহণ না করা যাবে, ততদিন পর্যন্ত এই প্রশ্নের নিষ্পত্তি নাও হতে পারে। [এই বইয়ের চূড়ান্ত সংশোধনের কাজ যখন চলছিল তখন নাসার (NASA) জন ম্যাথারের (Jhon Mather) কাছ থেকে আমি কসমিক ব্যাকগ্রাউন্ড এক্সপ্লোরার স্যাটেলাইট নিউজলেটার নং-১ পেলাম। তখন এতে ঘোষণা করা হয় যে সম্ভাব্য অবলোহিত রশ্মি ও মাইক্রোওয়েভ পটভূমি বিকিরণ বন ভয়েজ উপগ্রহ থেকে পর্যবেক্ষণ করার জন্য এম আই টির রাইনার ওয়েজ *(Rainier Weiss)* - এর তত্ত্বধানে ছয় জন বিজ্ঞানীর একটি দলকে নিয়োগ করা হয়েছে।]

আমরা লক্ষ্য করেছি, মহাজাগতিক মাইক্রোওয়েভ পটভূমি বিকিরণ দৃঢ়ভাবে সাক্ষ্য প্রদান করে যে কোন এক সময়ে মহাবিশ্বের বস্তু এবং বিকিরণ তাপীয় স্থিতাবস্থায় ছিল। যা হোক পর্যবেক্ষণকৃত ৩°K সমতুল্য বিকিরণ তাপমাত্রা থেকে আমরা এখনও যথেষ্ট সৃষ্টিতাত্ত্বিক অন্তর্দৃষ্টি লাভ করি নি। বস্তুত এই বিকিরণ তাপমাত্রা আমাদেরকে

অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি সংখ্যা নির্ধারণ করতে সাহায্য করবে, যা প্রথম তিন মিনিটের ইতিহাস অনুধাবন করতে প্রয়োজন হবে।

আমরা দেখেছি যে, একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় একক আয়তন স্থানে ফোটনের সংখ্যা প্রতিনিধিত্বমূলক তরঙ্গদৈর্ঘ্যের ঘনফলের ব্যস্তানুপাতিক। তাই এটা তাপমাত্রার ঘনফলের সরাসরি আনুপাতিক। বিকিরণ তাপমাত্রা নিখুঁত ১°K হলে, প্রতি লিটার আয়তন স্থানে ২০,২৮২.৯ টি ফোটন থাকবে। অতএব পটভূমি বিকিরণের তাপমাত্রা ৩°K হলে প্রতি লিটার ঘন আয়তনে প্রায় ৫,৫০,০০০ ফোটন থাকবে। যা হোক বর্তমান মহাবিশ্বে পারমাণবিক কণিকার ঘনত্ব (নিউট্রন এবং প্রোটন) হলো প্রতি এক হাজার লিটার ঘন আয়তনে ৬ এবং ০.০৩ -এর মাঝামাঝি কোন সংখ্যক কণিকা। (দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে যে উপরের সংখ্যাটি ক্রান্তিক ঘনত্বের দ্বিগুণ এবং নিচের সংখ্যাটি দৃশ্যমান গ্যালাক্সীসমূহে যে ঘনত্ব পর্যবেক্ষণ করা হয় সে বিবেচনায় কম)। বর্তমান মহাবিশ্বে প্রতিটি পারমাণবিক কণিকার জন্য ১০০ মিলিয়ন ও ২০০০০ মিলিয়ন -এর মধ্যবর্তী কোন সংখ্যক ফোটন রয়েছে এবং এই ফোটন সংখ্যা নির্ভর করবে কণিকা ঘনত্বের সত্যিকার মানের উপর।

অধিকন্তু দীর্ঘকাল ধরে পারমাণবিক সংখ্যা প্রতি ফোটন সংখ্যা মোটামুটি অপরিবর্তিত বা ধ্রুব রয়েছে (Constant)। যে সময় থেকে বিকিরণ মুক্তভাবে প্রসারিত হচ্ছিল সেই সময়ের পর থেকে পটভূমি ফোটন এবং পারমাণবিক কণিকাসমূহ সৃষ্টিও হয় নি বা ধ্বংসও হয় নি। অতএব তাদের অনুপাতও স্বাভাবিকভাবেই ধ্রুব ছিল। পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা দেখব যে, এমন কি এই সময়ের আগেও এই অনুপাত মোটামুটি ধ্রুব ছিল, যখন একক ফোটনসমূহ সৃষ্টি ও ধ্বংস হচ্ছিল।

মাইক্রোওয়েভ পটভূমি বিকিরণের পরিমাপ থেকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংখ্যাসূচক যে সিদ্ধান্ত পাওয়া যায় তা হলো আমরা মহাবিশ্বের আদি ইতিহাসের যতটা অতীতে বা পিছনে দেখতে সক্ষম হই, তাতে দেখি যে প্রতিটি নিউট্রন বা প্রোটনের বিপরীতে ১০০ মিলিয়ন ও ২০০০০ মিলিয়ন -এর মধ্যবর্তী কোন সংখ্যক ফোটন ছিল। একই কণ্ঠে সুর মিলানোর নিষ্প্রয়োজনীয় উদ্দেশ্যে নয়; আমি আমাদের আলোচনার জন্য ধরে নেব যে মহাবিশ্বের গড় উপাদান বা বস্তুতে প্রতিটি পারমাণবিক কণিকার বিপরীতে ঠিক ১০০০ মিলিয়ন ফোটন অতীতে ছিল বা বর্তমানে রয়েছে।

এই সিদ্ধান্তের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পরিণতি হলো মহাজাগতিক তাপমাত্রা কমে এতটা নিচে নেমে এলো যে, মুক্ত ইলেকট্রনগুলো নিউক্লিয়াসের সাথে যুক্ত হয়ে অণু গঠন করতে সক্ষম হলো। এই সময়ের আগে বস্তুসমূহ (Matter) পৃথক নক্ষত্র ও গ্যালাক্সী গঠন প্রক্রিয়া শুরু করতে পারে নি। নিউটন কর্তৃক আবিষ্কৃত মহাকর্ষ বল দ্বারা বস্তু জড়ো বা একত্রিত হয়ে বিচ্ছিন্ন পিন্ড (Isolated Fragment) গঠন করতে হলে যা প্রয়োজন তা হলো, মহাকর্ষ বলকে বস্তুর চাপ ও সংশ্লিষ্ট বিকিরণ অতিক্রম করতে হবে। যে কোন সদ্যজাত পিন্ডের (Clump) মধ্যে মহাকর্ষ বল এর আকারের (Size) সাথে সাথে বাড়ে। কিন্তু চাপ পিন্ডের আকারের উপর নির্ভরশীল নয়। অতএব একটি নির্দিষ্ট ঘনত্ব এবং চাপের জন্য একটি ন্যূনতম ভর রয়েছে, যা না হলে

মহাকর্ষজনিত বল কোন পিন্ড (Clump) গঠন করবে না। এটাকে বলা হয় জিনের ভর (Jean's Mass)। কারণ ১৯০২ সালে স্যার জেমস জিনস নক্ষত্র গঠনের তত্ত্বে সর্বপ্রথম একে অন্তর্ভুক্ত করেন। দেখা যায় যে, জিনস- ভর চাপের এক দশমিক পাঁচ ঘাত অনুপাতে পরিবর্তিত হয়। প্রায় ৩০০০°K তাপমাত্রায় ইলেকট্রনসমূহ যখন নিউক্লিয়াসের সাথে সংযুক্ত হয়ে অণু গঠন করছিল, তার ঠিক সামান্য আগে বিকিরণের চাপ ছিল প্রচন্ড (Enormous) এবং তার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ (Corresponding) জিনস-ভরও (Jean's mass) ছিল বিপুল। এই ভরের মান ছিল একটি বড় গ্যালাক্সীর প্রায় মিলিয়ন গুণ বেশি বা তার চেয়েও অধিক। তখন গ্যালাক্সী, এমন কি গ্যালাক্সীগুচ্ছের ভরও এতটা পর্যাপ্ত ছিল না যে ঐগুলো গঠিত হতে পারে। যা হোক একটু পরেই ইলেকট্রনসমূহ নিউক্লিয়াস -এর সাথে সংযুক্ত হয়ে অণু গঠন করলো। ইলেকট্রনসমূহ অদৃশ্য হওয়ার সাথে সাথেই মহাবিশ্ব বিকিরণের মধ্যে দৃশ্যমান হয়ে উঠলো। তাই বিকিরণের চাপ অকার্যকর হয়ে গেল। একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রা এবং ঘনত্বে বস্তুর চাপ সরলভাবে কণিকা সংখ্যার আনুপাতিক এবং বিকিরণের চাপ সরলভাবে ফোটন সংখ্যার আনুপাতিক। তাই বিকিরণের চাপ যখন অকার্যকর হয়ে গেল তখন সর্বমোট কার্যকর চাপ প্রায় ১০০০ মিলিয়ন গুণ কমে গেল। জিনস-ভরও প্রায় ১০০০ মিলিয়ন গুণনীয়কে (Factor) কমে এলো। তখন জিনস-ভর ছিল একটি গ্যালাক্সীর ভরের এক মিলিয়ন ভাগের প্রায় এক ভাগ। ঐ সময় থেকে শুধু বস্তুর চাপ এত বেশি দুর্বল হয়ে পড়লো যে, মহাকর্ষ বলের কারণে বস্তু জড়ো বা একত্রিত হয়ে পিন্ড তৈরির মাধ্যমে গ্যালাক্সীসমূহ গঠন না করে পারল না। আর এই গ্যালাক্সীগুলোই আমরা আকাশে দেখতে পাই।

এটা এ জন্য বলা নয় যে গ্যালাক্সীসমূহ কিভাবে গঠিত হয়েছে তা আমরা সত্যিকার অর্থেই বুঝি। গ্যালাক্সীসমূহ গঠনের তত্ত্ব নভোপদার্থবিদ্যার বড় সমস্যাগুলোর একটি, যা আজো সমাধান থেকে অনেক দূরে বলেই প্রতীয়মান হয়। কিন্তু সেটা হলো অন্য এক বিষয়। আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হলো এই যে, আদি মহাবিশ্বের তাপমাত্রা যখন প্রায় ৩০০০°K এর বেশি ছিল, তখনকার মহাবিশ্বে আজকের মত গ্যালাক্সী এবং নক্ষত্র ছিল না। তখনকার মহাবিশ্ব শুধু বস্তু এবং বিকিরণের আয়োনিত ও একীভূত স্যুপ দ্বারা গঠিত ছিল।

পারমাণবিক কণিকা প্রতি ফোটন সংখ্যার বিরাট অনুপাতের একটি উল্লেখযোগ্য ফলাফল হলো তুলনামূলক নিকট অতীতে অবশ্যই এমন একটা সময় ছিল যখন মহাবিশ্বে বিকিরণের শক্তি বস্তুর শক্তি অপেক্ষা বেশি ছিল। আইনস্টাইনের $E=mc^2$ সূত্র অনুযায়ী একটি পারমাণবিক কণিকার শক্তি হলো প্রায় ৯৩৯ মিলিয়ন ইলেকট্রন ভোল্ট। ৩°K তাপমাত্রার কৃষ্ণকায়া বিকিরণে একটি ফোটনের গড় শক্তি হলো অত্যন্ত কম, প্রায় ০.০০০৭ ইলেকট্রন ভোল্ট। ফলে প্রত্যেক নিউট্রন বা প্রোটনের জন্য ১০০০ মিলিয়ন ফোটন ধরা হলেও আমরা দেখতে পাই যে বর্তমান মহাবিশ্বের অধিকাংশ শক্তি রয়েছে বস্তু রূপে, বিকিরণ রূপে নয়। কিন্তু আরো দূর অতীতে মহাবিশ্বের তাপমাত্রা খুব বেশি ছিল বলে প্রত্যেকটি ফোটনের শক্তিও ছিল বেশি। অথচ নিউট্রন বা প্রোটনের ভরের মধ্যকার শক্তি সব সময়েই সমান ছিল। বস্তু-শক্তির চাইতে বিকিরণ-শক্তি বেশি হতে হলে (প্রতিটি পারমাণবিক কণিকার বিপরীতে

১০০০ মিলিয়ন ফোটন রয়েছে ধরা হলে) একটি পারমাণবিক কণিকার শক্তি থেকে প্রতিটি কৃষ্ণকায় ফোটনের গড় শক্তি দশ হাজার মিলিয়ন ভাগের একভাগ বা প্রায় এক ইলেকট্রন ভোল্ট বেশি হতে হয়। যখন বর্তমানের চেয়ে বিকিরণের তাপমাত্রা ১৩০০ গুণ বেশি ছিল বা প্রায় ৪০০০°K ছিল, তখন এমন একটি অবস্থা বিদ্যমান ছিল। এই তাপমাত্রা বিকিরণ প্রধান যুগের ক্রান্তিকাল (Transition) নির্দেশ করে- - যে সময়ে মহাবিশ্বের অধিকাংশ শক্তি ছিল বিকিরণ রূপে। অথচ বর্তমান বস্তু প্রধান যুগে মহাবিশ্বের অধিকাংশ শক্তি রয়েছে পারমাণবিক কণিকার ভরে।

এটা গুরুত্বপূর্ণ যে ৩০০০°K তাপমাত্রায় মহাবিশ্বের বস্তুসমূহ যখন বিকিরণের মধ্যে দৃশ্যমান (Transparent) হচ্ছিল, তখনই মহাবিশ্ব বিকিরণ প্রধান যুগ থেকে বস্তু প্রধান যুগে প্রবেশের ক্রান্তিকাল (Transition) অতিক্রম করছিল। কেউ আসলে জানে না কেন এমনটি হয়েছিল - যদিও এই বিষয়ে আকর্ষণীয় পরামর্শ রয়েছে। আমরাও সত্যিকার অর্থে জানি না কোন ক্রান্তিকালটি আগে এসেছিল: যদি প্রতিটি পারমাণবিক কণিকার জন্য ১০০০০ মিলিয়ন ফোটন থাকে, তাহলে তাপমাত্রা ৪০০°K -এ নেমে আসা পর্যন্ত বিকিরণ বস্তুর উপর প্রাধান্য বিস্তার করতে থাকবে এবং সেই ক্ষেত্রে মহাবিশ্বের বস্তুসমূহ বিকিরণে দৃশ্যমান (Transparent) হওয়ার পরেও বস্তুর উপর বিকিরণের প্রাধান্য চলছিল।

এই সকল অনিশ্চয়তা আমাদের আদি মহাবিশ্বের কাহিনী জানতে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে না। আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হলো মহানিশ্বের বস্তুসমূহ (Matter) দৃশ্যমান হওয়ার আগে মহাবিশ্ব প্রধানত বিকিরণ দ্বারা গঠিত ছিল বলে মনে করা যায় এবং তাতে ছিল বস্তুর সামান্য মিশ্রণ। মহাবিশ্বের প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে ফোটনের তরঙ্গদৈর্ঘ্যের লাল সরণ ঘটতে থাকে এবং আদি মহাবিশ্বের বিকিরণ বিপুল শক্তিঘনত্ব হারাতে থাকে। আর রেখে যায় পারমাণবিক কণিকা ও ইলেকট্রন-এর মিশ্রণ - যা বর্তমান মহাবিশ্বের নক্ষত্র ,পর্বত ও জীবন্ত প্রাণী গঠন করে।

একটি উত্তপ্ত মহাবিশ্বের উপাদানের তালিকা
Recipe of a Hot Universe

বিগত দুটো অধ্যায়ে যে সব পর্যবেক্ষণ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে তা থেকে এটা সুস্পষ্ট যে মহাবিশ্ব প্রসারমান এবং এটি বর্তমানে ৩°K তাপমাত্রার বৈশ্বিক (Universal) পটভূমি বিকিরণে পূর্ণ। যখন মহাবিশ্ব সম্পূর্ণ অনচ্ছ (Opaque) ছিল এবং যে সময়ে এটি বর্তমানের চেয়ে প্রায় একহাজার গুণ ছোট ও কম উত্তপ্ত ছিল, সে সময় থেকে এ বিকিরণ অবশেষ হিসেবে রয়ে গেছে বলে প্রতীয়মান হয়। (যখন আমরা বলি যে মহাবিশ্ব বর্তমানের চেয়ে এক হাজার গুণ ছোট ছিল তখন সরলভাবে এটাই বুঝানো হয়: প্রদত্ত একজোড়া প্রতিনিধিত্বমূলক কণিকার মধ্যে দূরত্ব এখনকার তুলনায় এক হাজার গুণ কম ছিল।) প্রথম তিন মিনিটের হিসাব উপস্থাপনের চূড়ান্ত প্রস্তুতি হিসেবে আমাদেরকে অবশ্যিই মহাবিশ্বের আরো প্রথম দিকের সময়ের দিকে তাকাতে হবে, যখন এটা অধিকতর ছোট ও উত্তপ্ত ছিল। এ ক্ষেত্রে ঐ সময়ে বিদ্যমান বাস্তব অবস্থা (Physical Condition) পর্যবেক্ষণের জন্য অপটিক্যাল টেলিস্কোপ বা রেডিও টেলিস্কোপ ব্যবহারের পরিবর্তে আমাদেরকে তত্ত্বের (Theory) চোখ ব্যবহার করতে হবে।

তৃতীয় অধ্যায়ের শেষ দিকে আমরা উল্লেখ করেছিলাম যে যখন মহাবিশ্ব বর্তমানের চেয়ে এক হাজার গুণ ছোট ছিল এবং এর বস্তুসমূহ (Material Contents) বিকিরণের মধ্যে সবেমাত্র স্বচ্ছতা লাভ করে তখনই মহাবিশ্ব বিকিরণ প্রধান যুগে (Radiation Dominated Era) থেকে বস্তু প্রধান যুগে (Matter Dominated Era) প্রবেশ করে। বর্তমানে প্রত্যেকটি পারমাণবিক কণিকার বিপরীতে যে বিপুল সংখ্যক ফোটন রয়েছে, বিকিরণ প্রধান যুগেও তার সমসংখ্যক ফোটন ছিল। কিন্তু প্রতিটি ফোটনের একক শক্তি এত বেশি ছিল যে মহাবিশ্বের অধিকাংশ শক্তি ছিল বিকিরণ হিসেবে, ভর হিসেবে নয়। [স্মর্তব্য : কোয়ান্টাম তত্ত্ব অনুযায়ী ফোটন হলো এমন ভরহীন কণিকা বা 'কোয়ান্টা', যা দিয়ে আলো তৈরি।] অতএব একটি ভাল অনুমান হবে এই যে মহাবিশ্ব এ যুগে বিকিরণ দ্বারাই পূর্ণ ছিল এবং অপরিহার্যভাবে এতে কোন বস্তুই (Matter) ছিল না।

একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এ সিদ্ধান্তের সাথে যোগ করতে হবে। এ অধ্যায়ে আমরা দেখবো যে মাত্র প্রথম কয়েক মিনিটের পরেই প্রকৃত বিকিরণ যুগ শুরু হয়, যখন মহাবিশ্বের তাপমাত্রা কয়েক হাজার মিলিয়ন ডিগ্রী কেলভিনে নেমে আসে। আদি সময়ে বস্তু গুরুত্বপূর্ণ ছিল; কিন্তু সে বস্তু ছিল এমন এক ধরনের পদার্থ দ্বারা তৈরি, যা বর্তমান মহাবিশ্ব যে সব পদার্থ দিয়ে তৈরি তা থেকে পৃথক। যা হোক, অনেক

পিছনে তাকানোর আগে আমরা সংক্ষেপে সত্যিকার বিকিরণ যুগের দিকে তাকাই। এ যুগটা হলো প্রথম কয়েক মিনিটের শেষের দিক থেকে শুরু করে কয়েক লক্ষ বছর পর পর্যন্ত, যখন আবার বস্তু বিকিরণ অপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হলো।

মহাবিশ্বের এই যুগের ইতিহাস বুঝতে হলে আমাদের সকলের জানা প্রয়োজন একটি নির্দিষ্ট মুহূর্তে সবকিছু কতটা উত্তপ্ত ছিল। একে অন্যভাবেও বলা যায়: মহাবিশ্ব যখন প্রসারিত হচ্ছিল তখন মহাবিশ্বের আকারের সাথে তাপমাত্রার কি সম্পর্ক ছিল?

এই প্রশ্নের জবাব দেওয়া সহজ হতো যদি বিবেচনা করা যায় যে বিকিরণ মুক্তভাবে প্রসারিত হতে পেরেছিল। মহাবিশ্ব প্রসারিত হওয়ার সাথে সাথে প্রতিটি ফোটনের তরঙ্গদৈর্ঘ্য মহাবিশ্বের আকারের সাথে আনুপাতিক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছিল বা প্রসারিত হচ্ছিল (লাল সরণের মাধ্যমে)। অধিকন্তু বিগত অধ্যায়ে আমরা দেখেছি যে কৃষ্ণকায়া (Blackbody) বিকিরণের গড় তরঙ্গদৈর্ঘ্য-এর তাপমাত্রার ব্যস্তানুপাতে পরিবর্তিত হয়। তাহলে মহাবিশ্বের আকারের সাথে তাপমাত্রা ব্যস্তানুপাতে হ্রাস পাচ্ছিল। বর্তমানেও ঠিক এমনটিই ঘটছে।

সৌভাগ্যবশত তাত্ত্বিক সৃষ্টিতত্ত্ববিদদের জন্য এই সহজ সম্পর্কের বিধিটি তখনও খাটে যখন আমরা এই বিষয়টি বিবেচনায় আনি যে, আসলে বিকিরণ মুক্তভাবে প্রসারিত হচ্ছিল না; বিকিরণ প্রধান যুগে ফোটনের তুলনায় স্বল্প সংখ্যক ইলেকট্রন ও পারমাণবিক কণিকা বিদ্যমান ছিল এবং এই সকল কণিকার সাথে ফোটনের দ্রুত সংঘর্ষ মহাবিশ্বের বস্তুসমূহকে (Contents) অনচ্ছ করে রেখেছিল। সংঘর্ষের আগে একটি ফোটন যখন মুক্ত উড্ডয়নে (Free Flight) ছিল, তখন এর তরঙ্গদৈর্ঘ্য মহাবিশ্বের আকারের অনুপাতে বৃদ্ধি পাচ্ছিল এবং প্রত্যেকটি কণিকার (ইলেকট্রন ও পরমাণু) জন্য এত বেশি সংখ্যক ফোটন বিদ্যমান ছিল যে সংঘর্ষই শুধু বস্তুর তাপমাত্রাকে বাধ্য করেছিল বিকিরণের তাপমাত্রাকে অনুসরণ করার জন্য, তার বিপরীতটি নয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যখন মহাবিশ্ব বর্তমানের চেয়ে দশ হাজার গুণ ছোট ছিল, তখনকার তাপমাত্রা ছিল বর্তমানের চেয়ে আনুপাতিকভাবে বেশি, যা প্রায় ৩০,০০০°K। সত্যিকার বিকিরণ যুগ সম্পর্কে এতটুকুই যথেষ্ট।

আমরা যদি ইতিহাসের আরো পিছনের দিকে তাকাই, তাহলে আমরা এমন একটা সময়ে আসি যখন তাপমাত্রা এত বেশি ছিল যে ফোটনসমূহ পরস্পরের সাথে সংঘর্ষের মাধ্যমে শক্তি থেকে বস্তুকণা সৃষ্টি করতে পারতো। আমরা দেখতে পাবো যে প্রথম কয়েক মিনিটে বিভিন্ন পারমাণবিক বিক্রিয়ার হার নির্ধারণ এবং মহাবিশ্বের প্রসারণের হার নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিকিরণের মত শুধু বিকিরণ শক্তি থেকে বস্তুকণা সৃষ্টি হওয়ার বিষয়টিও সমান গুরুত্বপূর্ণ। অতএব সত্যিকার আদি সময়ের ঘটনাবলী বোঝার জন্য আমাদের জানা প্রয়োজন বিকিরণ শক্তি থেকে বিপুল পরিমাণ বস্তু কণিকা সৃষ্টি হওয়ার জন্য মহাবিশ্বকে কতটা উত্তপ্ত হতে হয় এবং কত সংখ্যক কণিকা এভাবে সৃষ্টি হয়।

যে প্রক্রিয়ায় বিকিরণ থেকে বস্তু সৃষ্টি হয়, সেটা সবচেয়ে ভাল বুঝা যায় আলোর কোয়ান্টাম চিত্র থেকে। দুই কোয়ান্টা বিকিরণ বা ফোটনের মধ্যে সংঘর্ষ হতে পারে এবং এরা বিলীন হয়ে এদের সকল শক্তি ও ভরবেগ দুই বা ততোধিক বস্তুকণা সৃষ্টি

করতে পারে। (আসলে উচ্চ শক্তির পারমাণবিক পদার্থবিদ্যার পরীক্ষাগারে বর্তমানে এই প্রক্রিয়া পরোক্ষভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয়।) যা হোক আইনস্টাইনের 'আপেক্ষিকতার বিশেষ তত্ত্ব' (Special Theory of Relativity) আমাদেরকে জানায় যে, এমন কি স্থির অবস্থায় থাকলেও, একটি বস্তু কণিকার একটি নির্দিষ্ট 'স্থির শক্তি' (Rest Energy) থাকবে। এই শক্তির পরিমাণ নির্ধারণ করে বিখ্যাত সমীকরণ, $E = mc^2$। (এখানে 'c' হলো আলোর গতি। পারমাণবিক বিক্রিয়ায় পরমাণুর নিউক্লিয়াসের ভরের একাংশ বিনাশের মাধ্যমেই শক্তি নির্গত বা মুক্ত হয়ে থাকে)। অতএব দুটি ফোটনের মুখোমুখী সংঘর্ষের মাধ্যমে 'm' ভর বিশিষ্ট দুটি বস্তুকণিকা সৃষ্টি হতে হলে, প্রত্যেকটি ফোটনের শক্তি কমপক্ষে অবশ্যই প্রত্যেক কণিকার স্থির শক্তি 'mc^2'-এর সমান হতে হবে। যদি প্রত্যেকটি ফোটনের স্থির শক্তি 'mc^2'-এর চেয়ে বেশি হয় তাহলেই বিক্রিয়াটি ঘটবে এবং অতিরিক্ত শক্তি বস্তু কণিকাগুলোকে একটি উচ্চবেগ প্রদান করতে ব্যয় হবে। কিন্তু ফোটনগুলোর শক্তি যদি 'mc^2'-এর নিচে হয় তবে দুটো ফোটনের সংঘর্ষের মাধ্যমে 'm' ভরের কণিকা সৃষ্টি হবে না। কারণ তখন এসব নির্দিষ্ট কণিকার ভর সৃষ্টি করার মতো পর্যাপ্ত শক্তি থাকে না।

বাস্তবিকই বিকিরণ থেকে বস্তু কণিকা সৃষ্টি হতে পারার কার্যকারিতা নিরূপণ করার জন্য আমাদের জানা প্রয়োজন বিকিরণ ক্ষেত্রে (Radiation Field) প্রত্যেকটি ফোটনের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ শক্তি (Charecterstic Energy) কত। আমাদের বর্তমান লক্ষ্য অর্জনের জন্য একটি সরল ' থাম্ব রুল'-(Rule of Thumb) এর মাধ্যমে এটা ভালভাবেই হিসাব করে নিরূপণ করা যায়। বিকিরণের তাপমাত্রাকে বোলত্জম্যান (Boltzmann) ধ্রুবক দিয়ে শুধু গুণ করেই ফোটনের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ শক্তি (Charecterstic Energy of Photon) পাওয়া যেতে পারে। বোলত্জম্যান ধ্রুবক হলো পরিসংখ্যানগত বলবিদ্যার একটি মৌলিক ধ্রুবক (Fundamental Constant)। আধুনিক পরিসংখ্যানগত বলবিদ্যার জনক উইলার্ড গিবস (Willard Gibbs) এর সঙ্গে লুডজিগ বোলত্জম্যান (Ludwig Boltzmann) কাজ করেছিলেন। উইলার্ড গিবস ছিলেন একজন আমেরিকান। ১৯০৬ সালে লুডজিগ বোলত্জম্যান আত্মহত্যা করেন। তার কাজের দর্শনগত বিরোধিতাকে তার আত্মহত্যার অন্তত আংশিক কারণ বলে মনে করা হয়। এসব মতবিরোধ অবশ্য অনেক আগেই নিষ্পত্তি হয়ে গেছে।) বোলত্জম্যান ধ্রুবকের মান হলো প্রতি ডিগ্রী কেলভিন তাপমাত্রার জন্য ০.০০০০৮৬১৭ ইলেকট্রন ভোল্ট। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ৩০০০° K তাপমাত্রায় মহাবিশ্বের বস্তুসমূহ যখন সবেমাত্র স্বচ্ছ (Transparent) হয়ে উঠছিল, তখন প্রত্যেকটি ফোটনের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ শক্তি ছিল ৩০০০° K তাপমাত্রাকে বোলত্জম্যান ধ্রুবক দিয়ে গুণ করলে যে মান পাওয়া যায় ঠিক তাই। এই মান হলো ০.২৬ ইলেকট্রন ভোল্ট। (স্মর্তব্য ঃ এক ভোল্ট বৈদ্যুতিক শক্তি পার্থক্যের জন্য একটি ইলেকট্রন যে পরিমাণ শক্তি লাভ করে তাকে এক ইলেকট্রন ভোল্ট বলে। রাসায়নিক বিক্রিয়ায় প্রতিটি অণুতে এক ইলেকট্রন ভোল্ট মানের শক্তি থাকে। এই কারণে, ৩০০০° K-এর অধিক তাপমাত্রায় বিকিরণ এতো উত্তপ্ত থাকে যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ইলেকট্রন নিউক্লিয়াসের সাথে যুক্ত হয়ে অণু গঠন করতে পারে না।)

আমরা দেখেছি যে, ফোটনের সংঘর্ষের মাধ্যমে 'm' ভরের বস্তু কণিকা সৃষ্টি হতে হলে ফোটনের বৈশিষ্ট্যসূচক শক্তি কমপক্ষে 'mc^2' মানের হতে হবে। ফোটনের বৈশিষ্ট্যসূচক শক্তি হলো তাপমাত্রা এবং বোলতজম্যান ধ্রুবকের গুণফলের সমান। তাই বিকিরণের তাপমাত্রার ন্যূনতম মান হতে হবে স্থির শক্তি 'mc^2' কে বোলতজম্যান ধ্রুবক দিয়ে ভাগ করলে যে মান পাওয়া যায় তার সমান। প্রত্যেক ধরনের বস্তু কণিকার জন্যই একটি 'সূচন তাপমাত্রা' (Threshold Temperature) রয়েছে। স্থির শক্তি 'mc^2' কে বোলতজম্যান ধ্রুবক দিয়ে ভাগ করে এটা পাওয়া যায়। বিকিরণ থেকে ঐ সব কণিকা সৃষ্টি হতে হলে বিকিরণের তাপমাত্রা ঐ সব বস্তু কণিকার সূচন তাপমাত্রার চেয়ে বেশি থাকতে হবে।

জানা মতে সবচেয়ে বেশি হালকা বস্তু কণিকা হলো ইলেকট্রন e^- এবং পজিট্রন e^+। ইলেকট্রনের সমান ভর ও ঘূর্ণন (Spin); কিন্তু পজিট্রনের আধান হলো ইলেকট্রনের বিপরীত বা ধনাত্মক। যখন একটি ইলেকট্রন ও পজিট্রনের সংঘর্ষ ঘটে তখন এদের বিপরীত আধান পরস্পরকে বাতিল করে দুটি কণিকার শক্তি রূপান্তরিত হয় শুধু বিকিরণে। অবশ্যই এই কারণে সাধারণ জীবনে পজিট্রন এত বিরল। এরা খুব দীর্ঘ সময় টিকে থাকে না। কারণ তারা অপর ইলেকট্রনের সাক্ষাৎ পেলেই তার সাথে সংঘর্ষের মাধ্যমে দ্রুত বিনাশপ্রাপ্ত হয়। (১৯৩২ সালে নভোরশ্মির মধ্যে পজিট্রন আবিষ্কৃত হয়)। এই বিনাশ প্রক্রিয়া (Annihilation Process) বিপরীতমুখীও হতে পারে। যেমন পর্যাপ্ত শক্তি সম্পন্ন দুটো ফোটন সংঘর্ষের মাধ্যমে একজোড়া ইলেকট্রন-পজিট্রন সৃষ্টি করতে পারে এবং ফোটন দুটোর শক্তি তখন ইলেকট্রন-পজিট্রন কণিকার ভরে রূপান্তরিত হয়।

মুখোমুখী সংঘর্ষের মাধ্যমে দুটো ফোটনকে একটি ইলেকট্রন ও একটি পজিট্রন সৃষ্টি করতে হলে প্রত্যেকটি ফোটনের শক্তি ইলেকট্রন বা পজিট্রনের স্থির শক্তির (Rest Energy) চাইতে বেশি হতে হবে। এই শক্তি হলো ০.৫১১০০৩ মিলিয়ন ইলেকট্রন ভোল্ট। কোন সূচন তাপমাত্রায় ফোটনসমূহের এই পরিমাণ শক্তি পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি, তা জানতে হলে আমাদের শক্তিকে বোলতজম্যান ধ্রুবক দিয়ে ভাগ করতে হবে। (এই ধ্রুবকের মান হলো প্রতি ডিগ্রী কেলভিনে .০০০০৮৬১৭ ইলেকট্রন ভোল্ট)। এভাবে আমরা ফোটনের সূচন তাপমাত্রা পাই ছয়শত কোটি ডিগ্রী কেলভিন তাপমাত্রা (৬×১০^৯ K)। এ ধরনের উচ্চ তাপমাত্রায় প্রত্যেকটি ফোটন একে অপরের সাথে সংঘর্ষের মাধ্যমে ইলেকট্রন ও পজিট্রন সৃষ্টি করবে। অতএব এ রকম অবস্থায় বিপুল সংখ্যক ইলেকট্রন ও পজিট্রন বিদ্যমান থাকবে। [ঘটনাক্রমে বিকিরণ থেকে ইলেকট্রন ও পজিট্রন সৃষ্টি হওয়ার জন্য যে সূচন তাপমাত্রা (৬×১০^৯ K) আমরা বের করলাম তা বর্তমান মহাবিশ্বে সচরাচর আমরা যে তাপমাত্রা পাই সেটা থেকে অনেক বেশি। এমন কি সূর্যের কেন্দ্রের তাপমাত্রা দেড় কোটি ডিগ্রী কেলভিন। এই কারণে আমরা শূন্য স্থান থেকে উজ্জ্বল আলোতে ইলেকট্রন এবং পজিট্রন বের হয়ে আসতে দেখি না।]

একই ধরনের মন্তব্য সকল প্রকারের কণিকার জন্য প্রযোজ্য। আধুনিক পদার্থবিদ্যার একটি মূলনীতি এই যে প্রকৃতিতে যত 'কণিকা' রয়েছে তাদের প্রত্যেকটির একটি

'প্রতিকণিকা' রয়েছে। প্রত্যেকটি 'প্রতিকণিকার' ভর ও ঘূর্ণন (Spin) 'কণিকার' ভর ও ঘূর্ণনের সমান হয়। কিন্তু 'প্রতিকণিকার' আধান হয় 'কণিকার' বিপরীত। একমাত্র ব্যতিক্রম ঘটে ফোটনের মতো কয়েকটি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ কণিকার ক্ষেত্রে। ফোটনকেই ফোটনের নিজের প্রতিকণিকা হিসেবে মনে করা হয়। কণিকা এবং প্রতিকণিকার মধ্যকার সম্পর্ক হলো ব্যতিহার (Reciprocal)। ইলেকট্রনের প্রতিকণিকা হলো পজিট্রন; আর পজিট্রনের প্রতিকণিকা হলো ইলেকট্রন। পর্যাপ্ত শক্তিতে থাকলে একজোড়া ফোটন পরস্পরের সাথে সংঘর্ষের মাধ্যমে যে কোন প্রকারের একজোড়া কণিকা প্রতিকণিকা সৃষ্টি করতে পারে।

(কোয়ান্টাম তত্ত্ব এবং আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতার বিশেষ তত্ত্বের সরাসরি গাণিতিক বিশ্লেষণে প্রতিকণিকার অস্তিত্ব ধরা পড়ে। ১৯৩০ সালে পল আড্রিয়ান মাউরিচ ডিরাক (Paul Adrian Maurice Dirac) তাত্ত্বিকভাবে (Theoritically) প্রথম এন্টি-ইলেকট্রনের অস্তিত্ব সম্পর্কে ধারণা প্রদান করেন। তিনি তাঁর তত্ত্বে একটি অজানা কণিকার বিষয় অবতারণা করতে চান নি। তিনি সে সময়ে আবিষ্কৃত একমাত্র ধনাত্মক আধান বিশিষ্ট প্রোটন কণিকা-কেই এন্টি-ইলেকট্রন হিসেবে শনাক্ত করেন। ১৯৩২ সালে পজিট্রনের আবিষ্কারের ফলে প্রতিকণিকার তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। এতে আরো স্পষ্ট হয় যে প্রোটন ইলেকট্রনের প্রতিকণিকা নয়। প্রোটনেরই নিজস্ব প্রতিকণিকা এন্টি-প্রোটন রয়েছে। ১৯৫০ সালে বার্কলে বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাগারে এন্টি-প্রোটন আবিষ্কৃত হয়।

ইলেকট্রন ও পজিট্রনের চেয়ে ভারী পরবর্তী কণিকা হলো মিউয়ন বা μ^-। এরা এক প্রকারের অস্থায়ী ভারী ইলেকট্রন এবং এর প্রতিকণিকা হলো μ^+। ইলেকট্রন এবং পজিট্রনের মতই μ^- ও μ^+ এর বিপরীত আধান কিন্তু সমান ভর রয়েছে। দুটো ফোটনের পারস্পরিক সংঘর্ষের মাধ্যমে এরাও সৃষ্টি হতে পারে। প্রত্যেকটি মিউয়ন বা এন্টি-মিউয়নের স্থির শক্তি 'mc^2'-এর মান হলো ১০৫.৬৫৯৬ মিলিয়ন ইলেকট্রন ভোল্ট। এই শক্তিকে বোলতজম্যান ধ্রুবক দিয়ে ভাগ করলে যে সূচন তাপমাত্রা পাওয়া যায় তা হলো ১.২ মিলিয়ন মিলিয়ন ডিগ্রী কেলভিন (১.২ X $১০^{১২}$ K)। সূচন তাপমাত্রার তালিকা পরিদর্শন করে আমরা বলতে পারি, মহাবিশ্বের ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ে কোন কোন কণিকা বিপুল পরিমাণে বিদ্যমান ছিল। এগুলো হবে ঠিক সেই কণিকা যাদের সূচন তাপমাত্রা মহাবিশ্বের ঐ সময়ের তাপমাত্রার চেয়ে কম ছিল।

সূচন তাপমাত্রার উপরের তাপমাত্রায় এ সব বস্তু কণিকার কতগুলো আসলে মহাবিশ্বে বিদ্যমান ছিল? আদি মহাবিশ্বে যে উচ্চ তাপমাত্রা এবং ঘনত্ব বিদ্যমান ছিল তাতে বস্তু কণিকার সংখ্যা তাপীয় স্থিতিশীলতার মূল শর্ত দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছিল। সুনির্দিষ্টভাবে প্রতি সেকেন্ডে সর্বোচ্চ যত সংখ্যক কণিকা সৃষ্টি হতে পেরেছিল ঠিক ততগুলো কণিকা প্রতি সেকেন্ডে ধ্বংস হচ্ছিল এবং ঐ মুহূর্তে (মহাবিশ্বে) বিদ্যমান কণিকার সংখ্যা ছিল অবশ্যই নিখুঁতভাবে উক্ত সর্বোচ্চ সংখ্যা। (অর্থাৎ চাহিদা ও সরবরাহ সমান)। যে হারে কোন এক জোড়া কণিকা- প্রতিকণিকা ধ্বংস বা বিনাশপ্রাপ্ত হয়ে দুটো ফোটনে পরিবর্তিত হবে, ঠিক সে হারে সমান শক্তির একজোড়া ফোটন সংঘর্ষের মাধ্যমে তেমন একজোড়া কণিকা প্রতিকণিকা সৃষ্টি করবে। তাহলে তাপীয় স্থিতিশীলতার শর্ত পূরণ করতে হলে যে সব কণিকার সূচন

তাপমাত্রা বিদ্যমান তাপমাত্রার নিচে সে সব প্রত্যেক প্রকার কণিকার সংখ্যা হবে ঠিক প্রায় ফোটন সংখ্যার (একটি নির্দিষ্ট শক্তি স্তরের ফোটন সংখ্যার) সমান। যদি কণিকার সংখ্যা ফোটন সংখ্যার চেয়ে কম হয় তবে কণিকাসমূহ যে হারে ধ্বংস হবে ঠিক তার চেয়ে বেশি হারে সৃষ্টি হবে এবং কণিকার সংখ্যা যাবে বেড়ে। আবার যদি ফোটনের সংখ্যার চেয়ে কণিকার সংখ্যা বেশি হয় তাহলে কণিকাসমূহ যে হারে সৃষ্টি হবে তার চাইতে অধিক হারে ধ্বংস হবে। ফলে কণিকার সংখ্যা যাবে কমে। যেমন ছয়শত কোটি ডিগ্রী উপরের তাপমাত্রায় ইলেকট্রন ও পজিট্রনের (এই তাপমাত্রা ইলেকট্রন ও পজিট্রনের সূচন তাপমাত্রার উপরে) সংখ্যা অবশ্যই প্রায় ফোটন সংখ্যার সমান হতে হবে। এই সময়ে মহাবিশ্ব শুধু ফোটন দ্বারা নয়, বরং ফোটন, ইলেকট্রন, পজিট্রন দ্বারা তৈরী ছিল- এটা বিবেচনা করা যায়।

তবে সূচন তাপমাত্রার উপরের তাপমাত্রায় একটি বস্তু কণিকা অনেকটা ফোটনের মতই আচরণ করে। একটি বস্তু কণিকার গড় শক্তি হলো তাপমাত্রা এবং বোলত্জম্যান ধ্রুবকের গুণফলের মোটামুটি সমান। অতএব তাপমাত্রা সূচন তাপমাত্রার উপরে হওয়ার কারণে কণিকার ভরের শক্তির (Energy in the Particle's Mass) চাইতে এর গড় শক্তি হয় (Average Energy) অনেক বেশি এবং কণিকার ভরকে উপেক্ষা করা যায়। এ অবস্থায় একটি নির্দিষ্ট প্রকারের বস্তু কণিকা যে চাপ ও শক্তিঘনত্ব প্রদান করে তা শুধু ঐ সময়ের তাপমাত্রার চতুর্থ ঘাতের (Fourth Power) আনুপাতিক। ফোটনের ক্ষেত্রেও এমনটিই ঘটে। এভাবে আমরা ভাবতে পারি যে, যে কোন একটি নির্দিষ্ট সময়ে মহাবিশ্ব কয়েক প্রকারের বিকিরণ দ্বারা গঠিত ছিল এবং প্রত্যেক ধরনের বস্তুকণার জন্য একটি নির্দিষ্ট প্রকৃতির বিকিরণ ছিল। অবশ্যই এজন্য মহাজাগতিক তাপমাত্রা হতে হয় ঐ বস্তু কণিকার সূচন তাপমাত্রার উপরে। যে কোন সময়ে মহাবিশ্বের শক্তিঘনত্ব হলো ঐ সময়ে (মহাবিশ্বের) তাপমাত্রার চতুর্থ ঘাতের এবং যে সকল কণিকার সূচন তাপমাত্রা মহাজাগতিক তাপমাত্রা অপেক্ষা কম সে সব প্রজাতির সকল কণিকা সংখ্যার আনুপাতিক। এত বেশি তাপমাত্রার এ ধরনের অবস্থায় ও তাপীয় ভারসাম্যাবস্থায় কণিকা-প্রতিকণিকার জোড় ফোটনের মতোই বিদ্যমান থাকে। কিন্তু বর্তমান মহাবিশ্বে একমাত্র, সম্ভবত বিস্ফোরণশীল নক্ষত্রের কেন্দ্র ছাড়া অন্য কোথাও এমন অবস্থা (অর্থাৎ কণিকা-প্রতিকণিকার জোড় এবং ফোটন) দেখতে পাওয়া যায় না। যা হোক পরিসংখ্যানগত বলবিদ্যার উপর আমাদের যথেষ্ট আস্থা রয়েছে এবং আদি ঐ রকম অদ্ভুত অবস্থায় কি ঘটেছিল সে প্রসঙ্গে তত্ত্ব তৈরি করার বিষয়টি নিরাপদ (Safe) বলে আমরা বিবেচনা করতে পারি।

আরও যথাযথ হতে হলে আমাদের মনে রাখতে হবে যে পজিট্রনের (e^{+}) মতো একটি প্রতিকণিকাকে একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠী হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ফোটন এবং ইলেকট্রন কণিকা দুটো নির্দিষ্ট চক্রণ অবস্থায় বিদ্যমান থাকে এবং এদেরকে পৃথক গোষ্ঠী (Specis) হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ইলেকট্রনের মত কণিকাগুলো (কিন্তু ফোটন নয়) 'পাউলীর বর্জন' নামের একটি ধর্ম মেনে চলে। এই নীতির কারণে একই ধরনের দুটো কণিকা এক অবস্থায় থাকতে পারে না। এই নীতি কার্যকরভাবে সর্বমোট শক্তিঘনত্বের মধ্যে কণিকা শক্তির অবদানকে ৭/৮ অংশে হ্রাস করে। (বর্জন নীতির কারণেই একটা পরমাণুর সবগুলো ইলেকট্রন সর্বনিম্ন শক্তিস্তরে পতিত হয়

না। তাই মৌলের পর্যায় সারণীতে বিভিন্ন পরমাণুর যে জটিল স্তর কাঠামো দেখানো হয় তার জন্য এই বর্জন নীতিই দায়ী।) যে কোন সময়ে মহাবিশ্বের শক্তিঘনত্ব হলো ঐ সময়ে মহাবিশ্বের তাপমাত্রার চতুর্থ ঘাত এবং যে সকল কণিকার সূচন তাপমাত্রা মহাবিশ্বের তাপমাত্রা অপেক্ষা কম সে সব প্রজাতির সকল কণিকার কার্যকর সংখ্যার আনুপাতিক।

এখন আমরা জিজ্ঞেস করতে পারি কখন মহাবিশ্ব এই উচ্চ তাপমাত্রায় ছিল? মহাবিশ্বের বস্তুসমূহের (Contents) বহির্মুখী ভরবেগ এবং মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রের ভারসাম্যতা মহাবিশ্বের প্রসারণের হারকে নিয়ন্ত্রণ করে। ফোটন, ইলেকট্রন পজিট্রন ইত্যাদির সর্বমোট শক্তিঘনত্ব আদি মহাবিশ্বে মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রের উৎস হিসেবে কাজ করছে। আমরা দেখেছি যে মহাবিশ্বের শক্তিঘনত্ব শুধু মহাজাগতিক তাপমাত্রার উপর অপরিহার্যভাবে নির্ভরশীল। অতএব মহাবিশ্বের প্রসারণের সাথে সাথে মহাবিশ্বের শীতল হওয়াকে বা মহাজাগতিক তাপমাত্রাকে এক ধরনের ঘড়ি হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। আরো সুনির্দিষ্ট হতে হলে এটা দেখানো যেতে পারে যে মহাবিশ্বের শক্তিঘনত্ব একটি মান থেকে অন্য মানে পতিত হতে যে সময় লাগে তা দুটো শক্তিঘনত্বের বর্গমূলের অন্তরের ব্যস্তানুপাতিক। কিন্তু আমরা দেখেছি যে শক্তিঘনত্ব তাপমাত্রার চতুর্থ ঘাতের (Fourth Power) আনুপাতিক এবং সে সকল কণিকা গোষ্ঠীর সংখ্যার আনুপাতিক, যে সব কণিকার সূচন তাপমাত্রা মহাবিশ্বের সেই সময়ের তাপমাত্রার নীচে বিদ্যমান। অতএব যতক্ষণ পর্যন্ত তাপমাত্রা কোন সূচন তাপমাত্রা অতিক্রম না করে ততক্ষণ পর্যন্ত মহাবিশ্ব শীতল হয়ে এক তাপমাত্রা থেকে অন্য তাপমাত্রায় যেতে যে সময় নিবে সেটা এই দুটো তাপমাত্রার বর্গের অন্তরের ব্যস্তানুপাতিক। উদাহরণ হিসেবে আমরা যদি দশ কোটি ডিগ্রী তাপমাত্রা নিয়ে শুরু করি (এটা ইলেকট্রনের সূচন তাপমাত্রার বেশ নীচে) তবে দেখবো যে তাপমাত্রা এক কোটি ডিগ্রীতে নামতে সময় নিয়েছিল ০.০৬ বছর (বা ২২ দিন) এবং তারপর আরো ছয় বছর সময় লেগেছিল তাপমাত্রা দশ লক্ষ ডিগ্রীতে নেমে আসতে। এরপর আরো ৬০০ বছর লেগেছিল তাপমাত্রা এক লক্ষ ডিগ্রীতে নেমে আসতে এবং এরকম চলতেই থাকে। মহাবিশ্বের তাপমাত্রা দশ কোটি ডিগ্রী কেলভিন থেকে ৩০০০°K এ নেমে আসতে সর্বমোট সময় লেগেছিল সাত লক্ষ বছর। অবশ্যই যখন আমি এখানে সাত লক্ষ বছরের কথা বলি তখন আমি এমন কিছু পরম সময় একক (Absolute Time Unit) কথা বুঝাই যে সময়ে একটি ইলেকট্রন একটি হাইড্রোজেন পরমাণুর নিউক্লিয়াসের চতুর্দিকে ঘোরার জন্য একটি অক্ষ তৈরি করে নেয়। আমরা এমন একটা যুগ (An era) নিয়ে আলোচনা করছি যা সূর্যের চতুর্দিকে পৃথিবী ঘুরতে শুরু করার অনেক আগের।

মহাবিশ্ব যদি প্রথম কয়েক মিনিটে সুনির্দিষ্টভাবে সমান সংখ্যক কণিকা এবং প্রতিকণিকা দিয়ে গঠিত হতো তাহলে তাপমাত্রা ১০০ কোটি ডিগ্রীর নিচে নামার সাথে সাথে তারা সকলেই (কণিকা-প্রতিকণিকা) ধ্বংস হতো এবং বিকিরণ ছাড়া আর কিছুই থাকতো না। এই সম্ভাবনার বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় সাক্ষ্য এই যে আমরা এখানে রয়েছি ! বর্তমান মহাবিশ্বের বস্তু গড়ার লক্ষ্যে কণিকা-প্রতিকণিকা বিনাশিত হওয়ার পর কিছু অবশেষ অবশ্যই থাকতে হয়। আর এই অবশেষ থাকতে হলে

পজিট্রনের চাইতে কিছু অতিরিক্ত ইলেকট্রন, এন্টিপ্রোটনের চাইতে কিছু বেশি প্রোটন এবং এন্টিনিউট্রনের চাইতে কিছু বেশি নিউট্রন অবশ্যই তখনকার মহাবিশ্বে বিদ্যমান ছিল। এই অধ্যায়ের এই পর্যায় পর্যন্ত তুলনামূলক অল্প পরিমাণ এই অবশেষ পদার্থের (Left Over M atter) বিষয়টি আমি উদ্দেশ্যমূলকভাবে পরিহার করেছি। এটা অনুমান হিসেবে ভাল যদি আমরা সকলে আদি মহাবিশ্বের শক্তিঘনত্ব বা প্রসারণের হার নির্ণয় করতে চাই। আমরা আগের অধ্যায়ে দেখেছি যে মহাবিশ্বের তাপমাত্রা ৪০০০°k এ নেমে না আসা পর্যন্ত পারমাণবিক কণিকার শক্তিঘনত্ব বিকিরণের শক্তিঘনত্বের সাথে তুলনীয় পর্যায়ে আসে নি। যা হোক অবশেষ হিসেবে টিকে থাকা ইলেকট্রন ও পারমাণবিক কণিকার সামান্য পরিমাণ পরিপোক্ত (Seasoning) হওয়ার বিষয়টি বিশেষ দাবী নিয়ে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারে। কেননা তারাই বর্তমান বিশ্বের প্রধান উপাদান (Constituents) এবং তারাই বিশেষ করে গ্রন্থকার ও পাঠকদের প্রধান আকর্ষণ।

যখনই আমরা এই সম্ভাবনা স্বীকার করি যে আদি মহাবিশ্বের প্রথম কয়েক মিনিটে কণিকা প্রতিকণিকার চেয়ে বেশি ছিল, তখনই আমাদের জন্য যে সমস্যার সৃষ্টি হয় তা হলো আদি মহাবিশ্বে মিশ্র বস্তুর উপাদানের একটি বিস্তারিত তালিকা তৈরি করা। আক্ষরিকভাবে বলতে গেলে ছয় মাস পরপর লরেন্স বার্কলে ল্যাবরেটরী কর্তৃক শত শত তথাকথিত মৌলিক কণিকার তালিকা প্রকাশ করা হয়। আমাদের কি এই সব মৌলিক কণিকার প্রত্যেকটির পরিমাণ স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করার প্রয়োজন রয়েছে? এবং কেনইবা আমরা মৌলিক কণিকায় থেমে যাব? আমাদের কি বিভিন্ন প্রকারের পরমাণু, অণু, লবণ এবং মরিচ-এর সংখ্যাও স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করতে হবে? এ ক্ষেত্রে আমরা ভাবতে পারি যে বুঝবার জন্য মহাবিশ্ব খুবই জটিল এবং খুবই যাদৃচ্ছিক (Too Arbitrary) নয়।

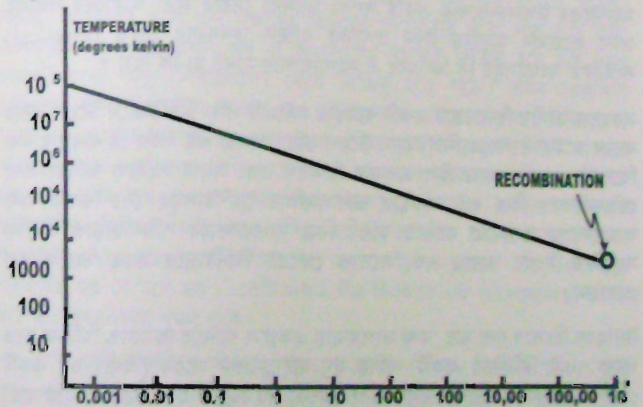

চিত্র ৮- বিকিরণ প্রধান যুগ ঃ পারমাণবিক সংশ্লেষণের ঠিক পর থেকে নিউক্লিয়াস ও ইলেকট্রন একত্রিত হয়ে পরমাণু গঠন পর্যন্ত সময়ের জন্য মহাবিশ্বের তাপমাত্রাকে সময়ের অপেক্ষক হিসেবে উপরের চিত্রে দেখানো হয়েছে।

সৌভাগ্যক্রমে মহাবিশ্ব ততটা জটিল নয়। মহাবিশ্বের উপাদানসমূহের একটি তালিকা প্রণয়ন কিভাবে সম্ভব তা দেখার জন্য তাপীয় ভারসাম্যের শর্ত দ্বারা আমরা কি বুঝি সে বিষয়ে আরো কিছুটা বেশি চিন্তা করা প্রয়োজন। মহাবিশ্ব একটি তাপীয় ভারসাম্যাবস্থার মধ্যদিয়ে অতিক্রম করার বিষয়টি কতটা গুরুত্বপূর্ণ সে সম্পর্কে আমি ইতোমধ্যে জোরালোভাবেই বলেছি। আসলে এটাই (তাপীয় ভারসাম্য) আমাদেরকে আস্থার সাথে যে কোন নির্দিষ্ট সময়ে মহাবিশ্বের উপাদান সম্পর্কে বলতে অনুমতি দেয়। এ অধ্যায়ে এ পর্যন্ত তাপীয় ভারসাম্যাবস্থায় বস্তু ও বিকিরণের জ্ঞাত ধর্মাবলীর কতগুলো প্রয়োগ সম্পর্কে আমরা আলোচনা করেছি।

যখন সংঘর্ষ বা অন্যান্য প্রক্রিয়া একটা ভৌত ব্যবস্থাকে (Physical System) তাপীয় ভারসাম্যাবস্থায় আনে তখন সর্বদাই এমন কিছু সংখ্যা থাকে যাদের মান পরিবর্তন হয় না। এরূপ সংরক্ষিত সংখ্যাগুলোর (Conserved Quantities) একটি হলো সর্বমোট শক্তি (Total Energy)। যদিও সংঘর্ষের মাধ্যমে একটি কণিকা থেকে আর একটি কণিকায় শক্তি স্থানান্তরিত হতে পারে তবু এর মাধ্যমে সংঘর্ষে অংশগ্রহণকারী কণিকাগুলোর সর্বমোট শক্তির কোন পরিবর্তন হয় না। তাপীয় ভারসাম্যাবস্থায় একটি ব্যবস্থার (System) ধর্মাবলী বের করার জন্য প্রত্যেক ধরনের সংরক্ষণ নীতিতে একটি রাশি থাকে যা অবশ্যই সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হয়। এটা সুস্পষ্ট যে যখন একটি ব্যবস্থা তাপীয় ভারসাম্যাবস্থার কাছাকাছি পৌছে তখন যদি কিছু সংখ্যার পরিবর্তন না ঘটে তাহলে ঐ গুলোর মান সাম্যাবস্থার শর্ত থেকে নির্ণয় করা যায় না ; তবে তা অবশ্যই পূর্বে উল্লেখ করতে হয়। তাপীয় সাম্যাবস্থায় থাকা একটি ব্যবস্থার প্রকৃত উল্লেখযোগ্য দিক হলো এই যে এই সংরক্ষিত সংখ্যাগুলোর মান যদি বিশেষভাবে বা স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করতে পারি তবে এর সকল ধর্ম একক বা অদ্বিতীয়ভাবে (Uniquely) নির্ধারিত হয়ে যায়। অতএব আদি মহাবিশ্বের উপাদানগুলোর একটি সম্পূর্ণ তালিকা দেয়ার জন্য আমাদের সকলের জানা প্রয়োজন মহাবিশ্ব যখন প্রসারিত হচ্ছিল তখনকার ভৌত (Physical) সংরক্ষিত সংখ্যাসমূহ কি কি এবং ঐ সংখ্যাগুলোর মানই বা কি ছিল ?

সচরাচর তাপীয় স্থিতাবস্থায় একটি ব্যবস্থার সর্বমোট শক্তি নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করার বদলে আমরা তাপমাত্রা নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করি। আমরা এই পর্যন্ত যে ব্যবস্থার কথা বিবেচনা করেছি তাতে ছিল একমাত্র বিকিরণ এবং সমান সংখ্যক কণিকা এবং প্রতিকণিকা। কিন্তু এই ব্যবস্থার ভারসাম্যতার বৈশিষ্ট্যসমূহ বের করার জন্য আমাদেরকে তাপমাত্রা জানতে হবে। কিন্তু সাধারণভাবে শক্তি ছাড়াও অন্যান্য সংরক্ষিত সংখ্যা রয়েছে এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রেই নির্দিষ্টভাবে ঘনত্ব উল্লেখ করা প্রয়োজন।

উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, কক্ষ তাপমাত্রায় একগ্লাস পানিতে ক্রমাগত বিক্রিয়া হতে থাকে। এই বিক্রিয়ায় একটি পানির অণু হাইড্রোজেন আয়ন (অর্থাৎ শুধু একটি প্রোটন নিউক্লিয়াস হিসেবে থাকে এবং ইলেকট্রনটি বিচ্যুত হয়ে পড়ে বা হয়ে যায়) এবং হাইড্রোক্সিল আয়নে (একটি অতিরিক্ত ইলেকট্রনসহ একটি অক্সিজেন পরমাণু একটি হাইড্রোজেন পরমাণুর সাথে বন্ধনে যুক্ত থাকে) বিশ্লিষ্ট হয়ে পড়ে অথবা একটি হাইড্রোজেন আয়ন এবং হাইড্রোক্সিল আয়ন পুনরায় একত্রিত হওয়ার মাধ্যমে পানির

অণু গঠন করে। লক্ষণীয় হলো এরূপ প্রত্যেকটি বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে পানির অণুটি অদৃশ্য হওয়ার সাথে সাথেই একটি হাইড্রোজেন আয়নের উদ্ভব ঘটে এবং এর বিপরীত বিক্রিয়াটিও ঘটে যখন হাইড্রোজেন আয়ন বা হাইড্রোক্সিল আয়ন সর্বদাই একত্রে দৃশ্যমান বা অদৃশ্য হয়। তাহলে সংরক্ষিত সংখ্যাগুলো হলো হাইড্রোজেন আয়ন সংখ্যাসহ পানির অণুর সর্বমোট সংখ্যা এবং হাইড্রোজেন আয়ন সংখ্যা থেকে হাইড্রোক্সিল আয়ন সংখ্যার অন্তর বা বিয়োগ ফল। (অবশ্যই পানির অণু ও হাইড্রোক্সিল আয়নের যোগফলের মতো অন্যান্য সংরক্ষিত সংখ্যাও রয়েছে। কিন্তু এগুলো হলো দুটো মৌলিক সংরক্ষিত সংখ্যার সরল যোগফল)। এক গ্লাস পানির ধর্মাবলী সম্পূর্ণরূপে আমরা নির্ধারণ করতে পারি যদি আমরা নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করি যে তাপমাত্রা হলো ৩০০°K (কেলভিন স্কেলে কক্ষ তাপমাত্রা), পানির অণুসহ হাইড্রোজেন আয়নের ঘনত্ব হলো প্রতিঘন সেন্টিমিটারে ৩.৩ X ১০²² অণু বা আয়ন (পানি যখন মোটামুটি সমুদ্রতলের চাপে থাকে) এবং হাইড্রোজেন আয়ন সংখ্যা থেকে হাইড্রোক্সিল আয়ন সংখ্যার বিয়োগফলের ঘনত্ব হলো শূন্য (মোট চার্জ শূন্য অনুযায়ী)। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় এই শর্তাধীনে প্রতি এক কোটি (১০⁷) পানির অণুর জন্য একটি হাইড্রোজেন আয়ন রয়েছে। আসলে পানির P^H -এর মান ৭ বলতে যা বুঝায় এটি তাই। লক্ষণীয় এই যে আমাদের এক গ্লাস পানির উপাদান বলার সময়ে এটা উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। তাপীয় সাম্যাবস্থার বিধি থেকে আমরা হাইড্রোজেন আয়নের অনুপাত বের করতে পারি। অপর পক্ষে তাপীয় স্থিতাবস্থা থেকে আমরা সংরক্ষিত সংখ্যাগুলোর ঘনত্ব বের করতে পারি না। উদাহরণঃ আমরা চাপ বাড়িয়ে বা কমিয়ে পানির অণুসহ হাইড্রোজেন আয়নের ঘনত্ব প্রতিঘন সেন্টিমিটারে ৩.৩ X ১০²² অণুর চেয়ে কিছু বাড়াতে বা কমাতে পারি। তাই আমাদের গ্লাসে কি আছে তা জানার জন্য আমাদেরকে এগুলো নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে।

এই উদাহরণটিও আমাদেরকে সংরক্ষিত রাশিগুলোর ভিন্ন অর্থ বুঝতে সাহায্য করবে। আমাদের পানি যদি নক্ষত্রের ভিতরের তাপমাত্রার মতো লক্ষ লক্ষ ডিগ্রী তাপমাত্রায় রাখা হয় তখন অণু বা আয়নগুলো সহজেই বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং ইলেকট্রনগুলো অণু (নিউক্লিয়াস) থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। তখন সংরক্ষিত রাশিগুলো হলো ইলেকট্রন সংখ্যা এবং অক্সিজেন ও হাইড্রোজেনের নিউক্লিয়াসের সংখ্যা। এ অবস্থায় হাইড্রোক্সিল পরমাণুসহ পানির অণুর ঘনত্ব পূর্বেই নির্দিষ্ট না করে পরিসংখ্যানগত বলবিদ্যার বিধি থেকে হিসাব করে বের করতে হবে। অবশ্যই এর মান হবে খুবই কম (নরকে তুষার পিন্ড বিরল)। সত্যিকারে এ সকল অবস্থায় পারমাণবিক বিক্রিয়া ঘটে না। যদিও প্রতিটি প্রজাতির নিউক্লিয়াসের সংখ্যা পরমভাবে (Absolutely) নির্ধারিত নয়, তবুও এই সংখ্যাগুলো এত ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয় যে মনে হয় : একটি নক্ষত্র ধীর বিবর্তনে এক ভারসাম্যাবস্থা থেকে অন্য ভারসাম্যাবস্থায় গমন করে।

শেষ পর্যন্ত আদি মহাবিশ্বে আমরা যে কয়েক হাজার মিলিয়ন ডিগ্রী তাপমাত্রা পাই তাতে এমন কি পরমাণুর নিউক্লিয়াসগুলো তাদের উপাদানে প্রোটন ও নিউট্রনে দ্রুত ভেঙে পড়ে। বিক্রিয়া এত দ্রুত ঘটে যে শুধু শক্তি থেকে সহজেই কণিকা ও প্রতিকণিকা সৃষ্টি হতে পারে বা আবার তাদের বিনাশও ঘটতে পারে। এ সকল অবস্থায় যে কোন নির্দিষ্ট প্রকারের কণিকার সংখ্যাসমূহ সংরক্ষিত রাশি নয়। বরং

প্রাসঙ্গিক সংরক্ষণ বিধিকে হ্রাস করে ঠিক এত অল্প সংখ্যায় আনা হয় যেগুলো (আমাদের জানা মতে) সম্ভাব্য সকল অবস্থায় প্রযোজ্য বা কার্যকরী থাকে। বিশ্বাস করা হয় আমাদের আদি মহাবিশ্বের উপাদানের তালিকা প্রণয়নের জন্য মাত্র তিনটি সংরক্ষিত সংখ্যা রয়েছে যাদের ঘনত্ব অবশ্যই নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে।

১। বৈদ্যুতিক আধান ঃ আমরা সমান ও বিপরীত আধান বিশিষ্ট একজোড়া কণিকা ধ্বংস বা সৃষ্টি করতে পারি। কিন্তু সর্বমোট (Net) আধান কখনও পরিবর্তন হয় না। [অন্যান্যগুলোর চেয়ে এই সংরক্ষণ বিধি সম্পর্কে আমরা অধিক নিশ্চিত, কেননা আধান যদি সংরক্ষিত না হতো তা হলে প্রচলিত ম্যাক্সওয়েল (Maxwel) -এর বিদ্যুত ও চুম্বকত্ব তত্ত্বের কোনো অর্থ হতো না।]

২। ব্যারিয়ন সংখ্যা ঃ ব্যারিয়ন বলতে পারমাণবিক কণিকা প্রোটন এবং নিউট্রনকে বুঝায়। তা ছাড়া কিছু ভারী ও হাইপেরন নামের অস্থায়ী কণিকা এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ব্যারিয়ন এবং এন্টিব্যারিয়ন জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি বা ধ্বংস হতে পারে। ব্যারিয়ন ভাঙনের মাধ্যমে অন্য ধরনের ব্যারিয়নে পরিণত হতে পারে। যেমন একটি তেজস্ক্রিয় নিউক্লিয়াস বিটা ভাঙনের মাধ্যমে নিউট্রন প্রোটনে পরিবর্তিত হয় বা প্রোটন নিউট্রনে পরিবর্তিত হয়। যা হোক সর্বমোট ব্যারিয়ন (প্রোটন, নিউট্রন, হাইপেরন) সংখ্যা থেকে সর্বমোট এন্টিব্যারিয়ন (এন্টিপ্রোটন, এন্টিনিউট্রন, এন্টি-হাইপেরন) সংখ্যা বিয়োগ করলে যে বিয়োগফল পাওয়া যায়, তা কখনও পরিবর্তিত হয়না। আমরা প্রোটন, নিউট্রন এবং হাইপেরণ-এর ব্যারিয়ন সংখ্যা +১ ধরি এবং এদের প্রতিকণিকাগুলোর ব্যারিয়ন সংখ্যা -১ ধরি। বিধি হলো, ব্যারিয়ন সংখ্যা কখনও পরিবর্তিত হয়না। বা ব্যারিয়ন সংখ্যার কখনও পরিবর্তন ঘটে না। আধানের মতো ব্যারিয়ন সংখ্যার কোন গভীর তাৎপর্য আছে বলে প্রতীয়মান হয় না। আমাদের জানা মতে ব্যারিয়ন সংখ্যা কর্তৃক সৃষ্ট কোন বৈদ্যুতিক বা চুম্বক ক্ষেত্র নেই। ব্যারিয়ন সংখ্যা হলো এক ধরনের বুক কিপিং পদ্ধতি। এর তাৎপর্য সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে এ বাস্তবতার উপর যে এটি একটি সংরক্ষিত সংখ্যা।

৩। লেপটন সংখ্যা ঃ ঋণাত্মক আধান বিশিষ্ট হালকা কণিকা ইলেকট্রন ও মিউয়ন এবং বৈদ্যুতিক আধান নিরপেক্ষ ভরহীন নিউট্রিনো নামক কণিকা ও এদের প্রতিকণিকাসমূহ যথাক্রমে পজিট্রন, এন্টিমিউয়ন এবং এন্টি নিউট্রিনো লেপটনের অন্তর্ভুক্ত। নিউট্রিনো এবং এন্টিনিউট্রিনো-এর ভর ও আধান শূন্য হলেও, তারা ফোটনের চাইতে অধিক কল্পিত নয়। এরা অন্যান্য কণিকার মতই শক্তি এবং ভরবেগ বহন করে। লেপটন সংখ্যার সংরক্ষণ আর একটি বুক কিপিং বিধি। সর্বমোট লেপটন সংখ্যা থেকে সর্বমোট এন্টি লেপটন সংখ্যা বিয়োগ করলে যে অন্তর বা বিয়োগফল পাওয়া যায় তা কখনো পরিবর্তন হয় না। (১৯৬২ সালে নিউট্রিনো বিকিরণের পরীক্ষা থেকে প্রকাশ পেলো যে প্রকৃত পক্ষে ন্যূনতম দুই প্রকারের নিউট্রিনো রয়েছে। একটি হলো ইলেকট্রন ধরনের, অপরটি মিউয়ন ধরনের এবং দুই প্রকারের লেপটন সংখ্যা রয়েছে। ইলেকট্রন লেপটন সংখ্যা হলো ইলেকট্রন ধরনের নিউট্রিনোসহ ইলেকট্রনের সর্বমোট সংখ্যা থেকে তাদের প্রতিকণিকার অন্তর বা বিয়োগফল। মিউয়ন লেপটন সংখ্যা হলো মিউয়ন ধরনের নিউট্রিনোসহ মিউয়নের সর্বমোট সংখ্যা থেকে এদের প্রতিকণিকার সংখ্যার বিয়োগফল। উভয়ই সম্পূর্ণরূপে সংরক্ষিত বলে প্রতীয়মান হয়, কিন্তু এটা বেশি নিশ্চিতভাবে জানা যায় নি।)

এই বিধিগুলো খাটে, তার একটি ভাল উদাহরণ হলো তেজস্ক্রিয় ভাঙনের ফলে একটি নিউট্রন পরিবর্তিত হয়ে একটি প্রোটন একটি ইলেকট্রন এবং একটি (ইলেকট্রন টাইপ) এন্টিনিউট্রিনোতে পরিণত হয়। প্রত্যেকটি কণিকার বৈদ্যুতিক আধান, ব্যারিয়ন সংখ্যা, লেপটন সংখ্যা নিম্নরূপ ঃ

	নিউট্রন	প্রোটন	ইলেকট্রন	এন্টিনিউট্রিনো
আধান	০	১	-১	০
ব্যারিয়ন সংখ্যা	+১	+১	০	০
লেপটন সংখ্যা	০	০	+১	-১

সহজেই যাচাই করে দেখা যায় চূড়ান্ত পর্যায়ে কণিকাগুলোর যে কোন সংরক্ষিত সংখ্যাসমূহের যোগফল হবে আদি নিউট্রনের সংরক্ষিত সংখ্যার সমান। এই সংখ্যাগুলো সংরক্ষিত বলতে আমরা এটাই বুঝি। সংরক্ষণ বিধিগুলো বাহুল্য বা অর্থহীন কিছু নয়। তারা আমাদের কে জানায় না যে বেশ অনেকগুলো বিক্রিয়া ঘটে। কেবল একটি নিউট্রন নিষিদ্ধ তেজস্ক্রিয় ভাঙন প্রক্রিয়ায় একটি প্রোটন, একটি ইলেকট্রন এবং একাধিক এন্টিনিউট্রিনোতে পরিবর্তিত হয়। একটি নির্দিষ্ট সময়ে মহাবিশ্বের উপাদানের সম্পূর্ণ তালিকা উপস্থাপন করতে হলে আমাদেরকে অবশ্যই এভাবে প্রতি একক আয়তনে আধান (Charge), ব্যারিয়ন সংখ্যা, লেপটন সংখ্যা সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে এবং সেই সঙ্গে অবশ্যই ঐ সময়ের তাপমাত্রাও উল্লেখ করতে হবে। সংরক্ষণ বিধি আমাদেরকে জানায় যে মহাবিশ্বের সাথে সাথে প্রসারিত হওয়া যে কোন আয়তন স্থানে সংরক্ষিত সংখ্যাগুলোর মান অপরিবর্তিত থাকে। এভাবে প্রতি একক আয়তনে ফোটন সংখ্যাও মহাবিশ্বের আকারের ঘনমূলের অনুপাতে পরিবর্তিত হয়। (তৃতীয় অধ্যায়ে আমরা দেখেছি একক আয়তনে ফোটন সংখ্যা তাপমাত্রার ঘনমূলের আনুপাতিক (Proportional)। অথচ এই অধ্যায়ের প্রথম দিকে উল্লেখ করা হয়েছে যে তাপমাত্রা মহাবিশ্বের আকারের বাস্তানুপাতে পরিবর্তিত হয়।) অতএব ফোটন প্রতি আধান, ব্যারিয়ন সংখ্যা, লেপটন সংখ্যা নির্ধারিত বা অপরিবর্তিত (Fixed) থাকে। তাই ফোটন সংখ্যার অনুপাতে সংরক্ষিত সংখ্যাগুলোর মান যদি একবার সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা যায় তবে মহাবিশ্বের উপাদান হিসেবে তা সবসময় কার্যকর থাকে।

[আরো যথার্থভাবে বলা যায়: মহাবিশ্বের আকারের ঘনফলের বাস্তানুপাতে যে সংখ্যাটি পরিবর্তিত হয় তা একক আয়তনে ফোটন সংখ্যা নয়, বরং এটা হলো একক আয়তনে এনট্রপি (Entropy)। এনট্রপি হলো পরিসংখ্যানগত বলবিদ্যার একটি মৌলিক সংখ্যা। এটা একটি ভৌত ব্যবস্থা এনট্রপির পরিমাণের সাথে জড়িত। 'এনট্রপি' কে কোন প্রাক্কলিত সংখ্যাসূচক উৎপাদক (Numerical Factor) প্রদান না করে তাপীয় স্থিতাবস্থায় সকল কণিকার সর্বমোট সংখ্যা দ্বারা একে একটি ভাল ও যথেষ্ট আসন্ন মান প্রদান করা হয়। এই কণিকার মধ্যে বস্তু কণিকাসমূহ (Material Particles) এবং ফোটনসমূহসহ ১৫৮ পৃষ্ঠার ১নং ছকে উল্লিখিত সকল কণিকা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আমাদের মহাবিশ্বের বৈশিষ্ট্যকে প্রকাশ করার জন্য প্রকৃতপক্ষে যে সকল ধ্রুবক আমাদের জন্য ব্যবহার করা প্রয়োজন সেগুলো হলো এনট্রপি প্রতি আধানের অনুপাত, এনট্রপি প্রতি ব্যারিয়ন সংখ্যার অনুপাত, এনট্রপি

প্রতি লেপটন সংখ্যার অনুপাত। যা হোক এমন কি অতি উচ্চ তাপমাত্রায় বস্তু কণিকার সংখ্যার মান ফোটন সংখ্যার মানের খুবই সমপর্যায়ের। অতএব আমরা খুব বড় ভুল করবো না যদি আদর্শ তুলনার জন্য আমরা এনট্রপির পরিবর্তে ফোটন সংখ্যাকে ব্যবহার করি।]

ফোটন প্রতি মহাজাগতিক আধান (Cosmic Charge) হিসাব করে নিরূপণ করা সহজ। আমাদের জানা মতে সারা মহাবিশ্বে বৈদ্যুতিক আধানের গড় ঘনত্ব হলো শূন্য। যদি পৃথিবী এবং সূর্যের ঋণাত্মক আধান থেকে ধনাত্মক আধান মিলিয়ন মিলিয়ন মিলিয়ন মিলিয়ন মিলিয়ন মিলিয়ন ($১০^{৩৬}$) ভাগের মাত্র একভাগ বেশি থাকত, তাহলে সূর্য ও পৃথিবীর মধ্যকার বিকর্ষণ হতো তাদের মাধ্যাকর্ষণের আকর্ষণের চেয়ে বেশি। যদি মহাবিশ্ব সীমিত এবং আবদ্ধ হয়ে থাকে তবে আমরা এই পর্যবেক্ষণকে একটা উপপাদ্যের স্তরে নিয়ে যেতে পারি। মহাবিশ্বের সর্বমোট আধান ধনাত্মক অবশ্যই শূন্য হবে। অন্যথায় বৈদ্যুতিক বলরেখাগুলো মহাবিশ্বকে চতুর্দিকে এবং আরো চতুর্দিকে জড়িয়ে ফেলবে এবং একটি অসীম বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র সৃষ্টি করবে। কিন্তু মহাবিশ্ব উন্মুক্ত (Open) বা আবদ্ধ (Closed) যাই হোক, নিরাপদে এটা বলা যায় যে ফোটন প্রতি মহাজাগতিক বৈদ্যুতিক আধান নগণ্য।

ফোটন প্রতি ব্যারিয়ন সংখ্যা হিসাব করে বের করাও সহজ। একমাত্র স্থায়ী ব্যারিয়নগুলো হলো পারমাণবিক কণিকা প্রোটন ও নিউট্রন এবং তাদের প্রতি কণিকা হলো এন্টিপ্রোটন ও এন্টিনিউট্রন। (প্রকৃতপক্ষে মুক্ত নিউট্রন অস্থায়ী এবং এদের গড় আয়ু হলো ১৫.৩ মিনিট। কিন্তু পারমাণবিক বল সাধারণ বস্তুর পারমাণবিক নিউক্লিয়াসে নিউট্রনকে সম্পূর্ণরূপে স্থায়ী করে রাখে।) আরো যতটুকু আমরা জানি তাতে এই মহাবিশ্বে লক্ষণীয় পরিমাণের (Appreciable Amount) প্রতিকণিকা নেই। অতএব বর্তমান মহাবিশ্বের যে কোন অংশে ব্যারিয়ন সংখ্যা অনিবার্যভাবে পারমাণবিক কণিকার সংখ্যার সমান। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা লক্ষ্য করেছি যে মাইক্রোওয়েভ বিকিরণ পটভূমিতে এমন প্রতি একশত কোটি ফোটনের জন্য একটি পারমাণবিক কণিকা রয়েছে (সঠিক সংখ্যা অনিশ্চিত)। অতএব ফোটন প্রতি ব্যারিয়ন সংখ্যা হলো প্রায় একশত কোটি ফোটনে একটি (ব্যারিয়ন)।

আসলেই এটি একটি উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্ত। এর তাৎপর্য (Implication) বোঝার জন্য আমরা অতীতের এমন একটি সময়ের কথা বিবেচনা করি যখন (মহাবিশ্বের) তাপমাত্রা ছিল নিউট্রন ও প্রোটনের সূচন তাপমাত্রার উপরে বা দশ মিলিয়ন মিলিয়ন ডিগ্রী কেলভিন-এর বেশি। এই সময়ে মহাবিশ্ব বিপুল পরিমাণ পারমাণবিক কণিকা ও প্রতিকণিকা ধারণ করেছিল এবং ফোটন সংখ্যার প্রায় সমান সংখ্যক পারমাণবিক কণিকা ও প্রতিকণিকা তখন মহাবিশ্বে বিদ্যমান ছিল। ব্যারিয়ন সংখ্যা হলো পারমাণবিক কণিকা ও প্রতিকণিকা সংখ্যার পার্থক্য। যদি এই পার্থক্য ফোটন সংখ্যার চেয়ে একশত কোটি গুণ ক্ষুদ্রতর হয়ে থাকে, তাহলে সর্বমোট পারমাণবিক কণিকার সংখ্যার চেয়েও প্রায় একশত কোটি গুণ ক্ষুদ্রতর হয়ে থাকবে। সে ক্ষেত্রে প্রতি একশত কোটি (পারমাণবিক) প্রতিকণিকার জন্য একটি করে অতিরিক্ত (পারমাণবিক) কণিকা বিদ্যমান ছিল। এই দৃষ্টিকোণ থেকে মহাবিশ্ব ঠান্ডা হয়ে যখন পারমাণবিক কণিকার সূচন তাপমাত্রার নিচে নেমে এলো তখন প্রতিকণিকাগুলো

তাদের কণিকাগুলোর সাথে সংঘর্ষের মাধ্যমে বিনাশপ্রাপ্ত হলো এবং প্রতিকণিকা থেকে সামান্য বেশি যে সব কণিকা অবশেষ হিসেবে টিকে রইলো সেগুলোই পরবর্তীতে আমাদের জন্য বিশ্ব গঠন করলো।

মহাবিশ্ব সৃষ্টিতত্ত্বে প্রতি একশত কোটিতে এক এর মতো ক্ষুদ্র ও নির্ভেজাল (Pure) সংখ্যা থাকার বিষয়টি অনেক তাত্ত্বিককে এই অনুমানের দিকে পরিচালনা করেছে যে আসলে সংখ্যাটি হলো শূন্য। অর্থাৎ মহাবিশ্বে বাস্তবে সমপরিমাণ পদার্থ (Matter) ও প্রতিপদার্থ রয়েছে। তখন প্রতি একশত কোটি ফোটনে একটি মাত্র ব্যারিয়ন থাকার বিষয়কে এমন অনুমানের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করতে হবে যে মহাজাগতিক তাপমাত্রা পারমাণবিক কণিকার সূচন তাপমাত্রার নিচে নেমে আসার আগের কোন এক সময়ে মহাবিশ্ব হয়তো কয়েকটি অঞ্চলে (Domains) বিভক্ত বা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল- তাদের মধ্যে কিছু অংশে প্রতিকণিকার চেয়ে কণিকা (প্রতি একশত কোটিতে একটি মাত্র বেশি) সামান্য বেশি এবং অন্যান্য অংশে কণিকার চেয়ে প্রতিকণিকা সামান্য বেশি হয়ে পড়ে। তাপমাত্রা যখন কমে এলো বা পড়ে গেলো তখন যত সম্ভব বেশি সংখ্যক কণিকা প্রতিকণিকার জোড়া বিনাশপ্রাপ্ত হলো। আর আমাদের জন্য অবশিষ্ট রইলো এমন এক মহাবিশ্ব যেখানকার কিছু অংশ নির্ভেজাল বা খাটি পদার্থ দ্বারা এবং বাকী অংশ খাটি প্রতিকণিকা দ্বারা গঠিত। এই ধারণার অসুবিধা হলো, কেউ এই মহাবিশ্বের কোন খানে পর্যাপ্ত পরিমাণ (Appreciable Amount) প্রতিপদার্থের চিহ্ন দেখতে পায় নি। (আমাদের পৃথিবীর উপরের আবহাওয়া মন্ডলে যে সকল নভোরশ্মি প্রবেশ করে সেগুলোর অংশ বিশেষ আমাদের গ্যালাক্সীর বিরাট দূরত্ব থেকে আসে এবং সম্ভবত অংশবিশেষ আমাদের গ্যালাক্সীর বাইরে থেকে আসে বলে বিশ্বাস করা হয়।) মহাজাগতিক রশ্মিগুলোতে থাকে বিস্ময়কর পরিমাণ পদার্থ, প্রতিপদার্থ নয়। বস্তুতপক্ষে মহাজাগতিক রশ্মিতে (Cosmic Ray) এখন পর্যন্ত কেউ এন্টিপ্রোটন বা এন্টিনিউক্লিয়াস দেখতে পায় নি। অধিকন্তু মহাজাগতিক মানদন্ডে (Cosmic Scale) পদার্থ প্রতিপদার্থের সংঘর্ষ ও বিনাশের মাধ্যমে সৃষ্ট ফোটনও আমরা দেখতে পাই না।

অপর একটি সম্ভাবনা হলো এই যে, ফোটনের ঘনত্ব (বা আরও যথাযথভাবে বলা যায় বিশৃঙ্খলা) মহাবিশ্বের আকারের ঘনফলের ব্যস্তানুপাতে থাকে নি। যদি কখনও তাপীয় ভারসাম্যতা থেকে কোন বিচ্যুতি ঘটতো তাহলে এটা হতে পারত। তখন কোন ধরনের সান্দ্র্যতা (Viscosity) মহাবিশ্বকে উত্তপ্ত করে থাকবে এবং কিছু অতিরিক্ত ফোটন সৃষ্টি করে থাকবে। এক্ষেত্রে ফোটন প্রতি ব্যারিয়ন সংখ্যা কোন এক যৌক্তিক মানে শুরু হবে যা সম্ভবত এক এর কাছাকাছি এবং তারপর যখন বেশি সংখ্যক ফোটন সৃষ্টি হলো তখন ব্যারিয়ন সংখ্যা বর্তমানের নিম্ন মানে নেমে এলো। সমস্যা হলো, এ সকল অতিরিক্ত ফোটন কিভাবে সৃষ্টি হয়েছে তার কোন বিস্তারিত ব্যাখ্যা উপস্থাপন করতে কেউ সক্ষম হয় নি। আমি কয়েক বছর আগে একটি ব্যাখ্যা বের করার জন্য চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু তা সাফল্যের মুখ দেখে নাই।

পরবর্তীতে আদর্শ মানের বাইরের এসব সম্ভাবনার বিষয় আমি পরিহার করবো এবং সহজভাবে ধরে নিব যে, প্রতি একশত কোটি ফোটনের জন্য ব্যারিয়ন সংখ্যা হবে এক। মহাবিশ্বের লেপটন সংখ্যার ঘনত্ব কত? মহাবিশ্বের কোন বৈদ্যুতিক আধান না

থাকার ঘটনা আমাদেরকে দ্রুতই জানান দেয় যে প্রত্যেকটি ধনাত্মক আধান বিশিষ্ট প্রোটনের জন্য সুনির্দিষ্টভাবে একটি করে ঋণাত্মক আধান বিশিষ্ট ইলেকট্রন রয়েছে। বর্তমান মহাবিশ্বের পারমাণবিক কণিকাগুলোর মধ্যে প্রায় শতকরা ৮৭ ভাগ হলো প্রোটন। অতএব ইলেকট্রনের সংখ্যা সর্বমোট পারমাণবিক কণিকা সংখ্যার প্রায় কাছাকাছি। যদি বর্তমান মহাবিশ্বে ইলেকট্রন একমাত্র লেপটনের অন্তর্ভুক্ত হতো তাহলে আমরা দ্রুতই এই সিদ্ধান্তে আসতে পারতাম যে ফোটন প্রতি লেপটন সংখ্যা ফোটন প্রতি ব্যারিয়ন সংখ্যার মোটামুটি সমান।

যাহোক, ইলেকট্রন ও পজিট্রন ছাড়া অন্য এক প্রকারের স্থায়ী কণিকা রয়েছে যেগুলোর লেপটন সংখ্যা শূন্য নয়। নিউট্রিনো এবং এর প্রতিকণিকা এন্টিনিউট্রিনো হলো ফোটনের মত বৈদ্যুতিকভাবে আধান নিরপেক্ষ ভরহীন কণিকা। কিন্তু এদের লেপটন সংখ্যা হলো যথাক্রমে +১ এবং -১। এভাবে বর্তমান মহাবিশ্বের লেপটন সংখ্যার ঘনত্ব নির্ধারণ করার জন্য আমাদেরকে নিউট্রিনো এবং এন্টিনিউট্রিনোসমূহের এর পরিমাণ (বা সংখ্যা) সম্পর্কে কিছুটা জানতে হবে।

দূর্ভাগ্যক্রমে এই তথ্যটি বের করা খুবই কঠিন। ইলেকট্রনের সাথে নিউট্রিনোর মিল রয়েছে যে ক্ষেত্রে তা হলো, যে প্রবল নিউক্লীয় বল অণুর নিউক্লিয়াসে প্রোটনসমূহকে একত্রে বেধে রাখে, নিউট্রিনো সেই প্রবল নিউক্লীয় বল অনুভব করে না (কোন কোন সময় আমি নিউট্রিনো এবং এন্টি নিউট্রিনো বুঝাতে নিউট্রিনো ব্যবহার করবো)। ইলেকট্রনের সাথে নিউট্রিনোর যে অমিল বা বৈসাদৃশ্য রয়েছে সেটা হলো নিউট্রিনো বৈদ্যুতিকভাবে নিরপেক্ষ, তাই যে বৈদ্যুতিক বা চুম্বক বল ইলেকট্রনসমূহকে পরমাণুর মধ্যে বেধে রাখে তেমন কোন বল নিউট্রিনো অনুভব করে না। বস্তুতপক্ষে নিউট্রিনোসমূহ কোন রকমের বলেই তেমন সাড়া দেয় না। মহাবিশ্বের সবকিছুর মতই তারা মহাকর্ষ বলে সাড়া দেয় এবং তারা (নিউট্রিনো) দুর্বল নিউক্লীয় বল অনুভব করে। দুর্বল নিউক্লীয় বলের কারণেই 'নিউট্রিনো ভাঙনের' মতো তেজস্ক্রিয় প্রক্রিয়া চলতে থাকে। কিন্তু এই বলগুলো সাধারণ বস্তুর সাথে খুব সামান্য মিথস্ক্রিয়া করে। নিউট্রিনো কত দুর্বলভাবে মিথস্ক্রিয়া করে তা দেখানোর জন্য সচরাচর যে উদাহরণ উপস্থাপন করা হয় তা হলো- যদি কোন তেজস্ক্রিয় পদ্ধতিতে সৃষ্ট যে কোন পরিমাণ নিউট্রিনোকে বিচ্ছিন্ন হওয়া বা গমনে বাধা দেয়ার মত পর্যাপ্ত সম্ভাবনা সৃষ্টি করতে হয়, তবে আমাদেরকে এর পথের কয়েক আলোকবর্ষ দূরত্ব পর্যন্ত সীসার তৈরি ইট বা ব্লক স্থাপন করতে হবে। সূর্য ক্রমাগত নিউট্রিনো বিকিরণ করছে। পারমাণবিক বিক্রিয়ায় সূর্যের কেন্দ্রে (Core) যখন প্রোটন নিউট্রনে রূপান্তরিত হয় তখন নিউট্রিনো সৃষ্টি হয়। এই নিউট্রিনোগুলো দিনে আমাদের পৃথিবীর উপর পতিত হয়ে (পৃথিবীকে ভেদ করে) নিচে চলে যায় (বা চলে গিয়ে আলোকিত করে)। রাতে যখন সূর্য পৃথিবীর অন্যদিকে থাকে তখন এই নিউট্রিনোগুলো আমাদের পৃথিবীর নিচ থেকে এসে (পৃথিবীকে ভেদ করে) উপরের দিকে চলে যায়। কারণ পৃথিবী নিউট্রিনোর নিকট সম্পূর্ণরূপে স্বচ্ছ। নিউট্রিনো আবিষ্কৃত হওয়ার বহু আগেই উলফ গ্যাংগ পাউলি (Wolf Gang Pauli) নিউট্রিনোর অস্তিত্ব সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেন। এটা করা হয়েছিল নিউট্রন ভাঙ্গন বা ক্ষয় প্রক্রিয়ায় যে শক্তি নির্গত হয় তার সাম্যতা (Balance) ব্যাখ্যা করার জন্য। মাত্র ১৯৫০ সালের শেষের দিকে পারমাণবিক চুল্লীতে বা কণিকা ত্বরকে সরাসরি ও ব্যাপক পরিমাণে নিউট্রিনো ও

এন্টিনিউট্রিনোকে সৃষ্টি করে একে শনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে। তখন কয়েকশত নিউট্রিনো বা এন্টিনিউট্রিনো কণিকা শনাক্তকরণ যন্ত্রে সত্যিকার আটকা পড়ে।

নিউট্রিনোর মিথস্ক্রিয়া অত্যন্ত দুর্বল হওয়ার কারণে এটা সহজেই বোঝা যায় যে, বিপুল সংখ্যক নিউট্রিনো বা এন্টিনিউট্রিনো তাদের অস্তিত্বের কোন আভাস বা সংকেত না দিয়েই আমাদের চতুর্দিকের মহাবিশ্বকে পূর্ণ করে রেখেছে। নিউট্রিনো এবং এন্টিনিউট্রিনোর সংখ্যার কিছুটা অনির্দিষ্ট একটি উচ্চতর সীমা পাওয়া সম্ভব। যদি কণিকাগুলো খুব বিপুল (Enormous) হতো তাহলে কোন দুর্বল পারমাণবিক ভাঙ্গণ প্রক্রিয়া সামান্য প্রভাবান্বিত হতো এবং অধিকন্তু মহাবিশ্বের যে প্রসারণ পর্যবেক্ষণ করা হয় তার চেয়ে অধিক দ্রুত মন্দনপ্রাপ্ত হতো। যা হোক এসব উচ্চতর সীমাসমূহ এই সম্ভাবনাকে বাতিল করে না যে যত সংখ্যক ফোটন রয়েছে প্রায় তার সমসংখ্যক নিউট্রিনো অথবা/এবং এন্টি নিউট্রিনো রয়েছে এবং নিউট্রিনো এবং/অথবা এন্টি নিউট্রিনোর শক্তি ফোটনের শক্তির অনুরূপ।

এই সব মন্তব্য সত্ত্বেও সৃষ্টিতত্ত্ববিদদের জন্য এমনটি অনুমান করা স্বাভাবিক যে, ফোটন প্রতি লেপটন সংখ্যা (স্মর্তব্য: লেপটন সংখ্যা হলো ইলেকট্রন, মিউয়ন ও নিউট্রিনো কণিকার সর্বমোট সংখ্যা থেকে তাদের প্রতিকণিকা যথাক্রমে পজিট্রন, এন্টিমিউয়ন, এন্টি-নিউট্রিনো কণিকার সর্বমোট সংখ্যা বিয়োগ করলে যে সংখ্যা পাওয়া যায় তাই) ক্ষুদ্র - এক এর চেয়ে বেশ ক্ষুদ্র। এটা সম্পূর্ণরূপে এই উদাহরণের উপর নির্ভরশীল যে ফোটন প্রতি ব্যারিয়ন সংখ্যা ক্ষুদ্র। অতএব ফোটন প্রতি লেপটন সংখ্যাও কেন ক্ষুদ্র হবে না। স্ট্যান্ডার্ড মডেলে ব্যবহৃত সবচেয়ে কম নিশ্চিত অনুমানগুলোর একটি হলো এটা। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে এটা যদি সঠিক নাও হয় তবে তা আমরা স্ট্যান্ডার্ড মডেলের যে সাধারণ চিত্র তৈরি করেছি তার বর্ণনাকে সামান্যই পরিবর্তন করবে।

অবশ্যই ইলেকট্রন এর সূচন তাপমাত্রার উপরের তাপমাত্রায় প্রচুর পরিমাণে লেপটন এবং এন্টিলেপটন ছিল - ফোটন সংখ্যার প্রায় সমান সংখ্যক ইলেকট্রন এবং পজিট্রন ছিল। এই সকল অবস্থায় মহাবিশ্ব এত উত্তপ্ত ও ঘন ছিল যে এমনকি কল্পিত (Ghostly) নিউট্রিনোসমূহ পর্যন্ত তাপীয় স্থিতাবস্থায় পৌছে ছিল। ফলে তখন ফোটন সংখ্যার প্রায় সমান সংখ্যক নিউট্রিনো ও এন্টিনিউট্রিনো ছিল। স্ট্যান্ডার্ড মডেলে এই অনুমান করা হয়েছে যে লেপটন কণিকার সর্বমোট সংখ্যা ও এন্টিলেপটন কণিকার সর্বমোট সংখ্যার পার্থক্য (বা লেপটন সংখ্যা) ফোটন সংখ্যার চেয়ে অনেক ক্ষুদ্র বা ছোট ছিল এবং রয়েছে। তেমনি এন্টিলেপটন কণিকা সংখ্যার চেয়ে লেপটন কণিকা সংখ্যা সামান্য বেশি থাকতে পারে (এন্টিব্যারিয়ন কণিকা সংখ্যার চেয়ে ব্যারিয়ন কণিকা সংখ্যা যেমন সামান্য বেশি রয়েছে) এবং এই কণিকাগুলো বর্তমান সময় পর্যন্ত টিকে রয়েছে। অধিকন্তু নিউট্রিনো এবং এন্টিনিউট্রিনো এত দুর্বলভাবে মিথস্ক্রিয়া করে যে তাদের একটি বিরাট সংখ্যা হয়তো ধ্বংস হওয়া এড়াতে পেরেছে এবং সে ক্ষেত্রে বর্তমানে ফোটনের মতো প্রায় সমসংখ্যক নিউট্রিনো ও এন্টিনিউট্রিনো বিদ্যমান রয়েছে। আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে দেখব যে বস্তুতপক্ষে এটাই বিশ্বাস করা হয়। তবে আমাদের চতুর্দিকের বিপুল সংখ্যক নিউট্রিনো এবং এন্টিনিউট্রিনোকে নিকট ভবিষ্যতে পর্যবেক্ষণ করতে পাওয়ার সামান্যতম সম্ভাবনা রয়েছে বলে মনে হয় না।

সংক্ষেপে এটাই হলো আমাদের আদি মহাবিশ্বের উপাদানের তালিকা। ফোটন প্রতি শূন্য সংখ্যক আধান নিন, ফোটন প্রতি ব্যারিয়ন সংখ্যা নিন প্রতি একশত কোটিতে এক এবং ফোটন প্রতি লেপটন সংখ্যা অনিশ্চিত কিন্তু ক্ষুদ্র। একটি নির্দিষ্ট সময়ে (Given Time) তাপমাত্রা নিতে হবে বিকিরণের বর্তমান পটভূমি তাপমাত্রা ৩°K-এর বেশি। এ তাপমাত্রা কতগুণ বেশি হবে সেটা নির্ভর করবে মহাবিশ্বের বর্তমান আয়তন ও মহাবিশ্বের ঐ সময়ে আয়তনের অনুপাতের উপর। এরপর ভালভাবে এমন করে ঝাকুনি বা নাড়া (Stir Well) দিন যাতে বিভিন্ন প্রকারের কণিকাসমূহের বিস্তারিত বণ্টন (Detailed Distribution) তাপীয় স্থিতাবস্থার শর্ত দ্বারা নির্ধারিত হয়। একটি প্রসারমাণ মহাবিশ্বে এদেরকে রাখুন- যে প্রসারণের হার উল্লিখিত উপাদানসমূহ কর্তৃক সৃষ্ট মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। দীর্ঘ ও পর্যাপ্ত সময় প্রতীক্ষার পর এসব বিভিন্ন উপাদানের মিশ্রণ আমাদের বর্তমান মহাবিশ্বে রূপান্তরিত হবে।

মহাবিশ্ব (Universe) সৃষ্টির প্রথম তিন মিনিটের মহাজাগতিক বিবর্তনে (Cosmic Evolution) কি ঘটেছিল, তার গতি অবলোকন করার জন্য আমরা এখন প্রস্তুত। প্রথম দিকের ঘটনা শেষের দিকের তুলনায় এত দ্রুত ঘটেছিল যে, একটি সাধারণ সিনেমার মতো সমান সময়ের ব্যবধানে এর দৃশ্য দেখালে তা ফলপ্রসু হবে না। এর বদলে আমি আমাদের ফিল্মের গতিকে মহাবিশ্বের পড়ন্ত তাপমাত্রার সাথে সমন্বিত করবো এবং মহাবিশ্বের তাপমাত্রা কমে যখন প্রত্যেকবার প্রায় এক তৃতীয়াংশে নেমে আসবে তখন চিত্র নেওয়ার জন্য প্রতিবার ক্যামেরাকে দাঁড় করাবো।

দুর্ভাগ্যবশত আমি চলচ্চিত্রটি (Film) শূন্য সময়ে এবং অসীম তাপমাত্রায় শুরু করতে পারছি না। দেড়লক্ষ কোটি ডিগ্রী কেলভিন ($১.৫ \times ১০^{১২}K$) তাপমাত্রায় মহাবিশ্ব যে বিপুল সংখ্যক 'পাইমেসন' নামক কণিকা ধারণ করে তা ওজনের দিক থেকে পারমাণবিক কণিকার প্রায় সাত ভাগের একভাগ। 'পাইমেসন' পরস্পরের সাথে এবং পারমাণবিক কণিকার সাথে খুব শক্তিশালী মিথস্ক্রিয়া (Interact) করে, যা ইলেকট্রন, পজিট্রন, মিউয়ন এবং নিউট্রিনো করে না। বস্তুত পরমাণুর নিউক্লিয়াস যে আকর্ষণ বলে একত্রে বাঁধা থাকে, সেই বলের অধিকাংশই পারমাণবিক কণিকাসমূহের মধ্যে ক্রমাগত 'পাইমেসন' বিনিময়ের কারণে সৃষ্টি হয়। এইরূপ শক্তিশালী মিথস্ক্রিয়াশীল বিপুল পরিমাণ কণিকার উপস্থিতি এবং অতি উচ্চ তাপমাত্রায় পদার্থের (মৌলিক কণিকার) আচরণ বা ধর্ম হিসাব করে বের করা খুবই কঠিন। তাই এই কঠিন গাণিতিক সমস্যা এড়ানোর জন্য আমি এই অধ্যায়ে মহাবিস্ফোরণের প্রায় এক সেকেন্ডের একশত ভাগের একভাগ সময় (১/১০০ সেকেন্ড) পরের ঘটনা থেকে শুরু করবো- যখন মহাবিশ্বের তাপমাত্রা দশ হাজার কোটি ডিগ্রী কেলভিনে নেমে এসেছে। পাইমেসন, মিউয়ন এবং অন্যান্য ভারী কণিকার 'সূচন তাপমাত্রা' (Threshold Temperature) থেকে এই দশ হাজার কোটি ডিগ্রী কেলভিন তাপমাত্রা নিরাপদে (Safely) কম। প্রারম্ভিক মুহূর্তের কাছাকাছি সময়ে যা ঘটেছিল, সে সম্পর্কে পদার্থবিদ্যার তাত্ত্বিকগণের ভাবনা নিয়ে আমি সপ্তম অধ্যায়ে কিছুটা আলোচনা করবো।

এই সব উপলব্ধি বিবেচনায় রেখে এখন আমরা আমাদের চলচ্চিত্রটি শুরু করবো।

প্রথম দৃশ্য ঃ মহাবিশ্বের তাপমাত্রা দশ হাজার কোটি ডিগ্রী কেলভিন ($১০^{১২}K$)। পরবর্তী যে কোন সময়ের তুলনায় এই সময়ে মহাবিশ্বের অবস্থা বর্ণনা করা সহজ ও

সরল। মহাবিশ্ব এই সময়ে বস্তু (Matter) ও বিকিরণের অবিচ্ছিন্ন স্যুপ (Soup) দ্বারা পূর্ণ ছিল, যার প্রতিটি কণিকা অপরগুলোর সাথে প্রচন্ড বেগে ক্রমাগত মুখোমুখি সংঘর্ষে নিপতিত হচ্ছিল। অত্যন্ত দ্রুতগতিতে প্রসারিত হওয়া সত্ত্বেও মহাবিশ্বে তখন প্রায় এক নিখুঁত তাপীয় স্থিতিশীলতা (Perfect Thermal Equilibrium) বিরাজ করছিল। প্রথম চিত্রের পূর্বে যা ঘটেছিল, তার উপর নির্ভর না করে , মহাবিশ্বের পদার্থ কণিকাসমূহ এই সময়ে পরিসংখ্যানগত বলবিদ্যার (Statistical Mechanics) বিধিবিধান মেনে চলছিল। আমাদের সকলের যা জানা প্রয়োজন তা হলো, তখনকার তাপমাত্রা ছিল দশ হাজার কোটি ডিগ্রী কেলভিন এবং সংরক্ষিত (Conserved) সংখ্যাসমূহ যেমন চার্জ, ব্যারিয়ন সংখ্যা (Baryon Number), লেপটন সংখ্যা (Lepton Number)-এগুলোর মান ছিল খুবই ক্ষুদ্র বা শূন্য।

যে সব কণিকার 'সূচন তাপমাত্রা' (Threshold Temperature) দশ হাজার কোটি ডিগ্রী কেলভিন এর নিচে, সেই সব কণিকা তখন মহাবিশ্বে বিপুল পরিমাণে ছিল। এই সব কণিকা হলো, ইলেকট্রন এবং তার প্রতিকণিকা পজিট্রন এবং অবশ্যই ফোটন , নিউট্রিনো, এন্টিনিউট্রিনো-এর মত ভরহীন কণিকাসমূহ। নিউট্রিনো হলো এমন ধরনের কণিকা যা কোন রকম বিক্ষিপ্ত না হয়ে (বা ছড়িয়ে না পড়ে) সীসার তৈরি ইটের (Lead Bricks) মধ্য দিয়ে বছরের পর বছর চলতে পারে। কিন্তু মহাবিশ্ব তখন এত ঘন ছিল যে, নিউট্রিনো কণিকাসমূহের সাথে ইলেকট্রন, পজিট্রন এবং ফোটন- এর দ্রুত ও পারস্পরিক সংঘর্ষের মাধ্যমে একটি তাপীয় ভারসাম্যতা (Thermal Equilibrium) রক্ষিত হচ্ছিল। (কোন কোন সময় আমি নিউট্রিনো এবং এন্টিনিউট্রিনো বোঝাতে শুধু 'নিউট্রিনো' উল্লেখ করবো)।

আরো একটি বড় সরলীকরণ হলো এই যে, দশ হাজার কোটি ডিগ্রী কেলভিন ($১০^{১১}$K) তাপমাত্রা ইলেকট্রন ও পজিট্রন -এর সূচন তাপমাত্রার তুলনায় অনেক বেশি। তার মানে এই কণিকাসমূহ (ইলেকট্রন ও পজিট্রন) ফোটন ও নিউট্রিনোর মতই বিভিন্ন প্রকার বিকিরণের মতো আচরণ করছিল। প্রশ্ন জাগে, তখন বিভিন্ন প্রকার বিকিরণের শক্তিঘনত্ব (Energy Density) কি ছিল ? ইলেকট্রন ও পজিট্রনের একত্রিত শক্তি হলো ফোটনের শক্তির ৭/৪ গুণ। নিউট্রিনো ও এন্টিনিউট্রিনো এর সম্মিলিত শক্তির পরিমাণ ইলেকট্রন ও পজিট্রনের সম্মিলিত শক্তির সমান। অতএব এই তাপমাত্রায় সম্পূর্ণ শক্তিঘনত্ব শুধু তড়িৎ-চুম্বক বিকিরণের (Electro Magnetic Radiation) শক্তিঘনত্বের তুলনায়, (৭/৪+৭/৪+১) ৯/২ গুণ বেশি। স্টিফেন-বোলত্জম্যান সূত্র (Stefan-Boltzmann) অনুযায়ী $১০^{১১}$K তাপমাত্রায় তড়িৎ-চুম্বক বিকিরণের শক্তিঘনত্ব হলো প্রতি লিটারে ৪.৭২ x $১০^{৪৪}$ ইলেকট্রন ভোল্ট। অতএব পুরো মহাবিশ্বের শক্তিঘনত্ব ছিল ৯/২ গুণ বেশি। অর্থাৎ প্রতি লিটারে ২১ X $১০^{৪৪}$ ইলেকট্রন ভোল্ট। এ হলো এমন একটি ঘনত্বের সমতুল্য, যার ভর প্রতি লিটারে ৩৮০০ মিলিয়ন কিলোগ্রাম। সাধারণ পানির ঘনত্বের তুলনায় এই ঘনত্ব ৩৮০০ মিলিয়ন গুণ বেশি। (যখন বলা হয় যে, একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ শক্তি একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ ভরের সমতুল্য, তখন এটাই বুঝানো হয় যে, আইনস্টাইনের বিখ্যাত সমীকরণ mc^2 অনুযায়ী যদি প্রদত্ত সমস্ত ভরকে শক্তিতে রূপান্তর করা হয় তবে ঐ

পরিমাণ শক্তি মুক্ত বা নির্গত হবে।) মাউন্ট এভারেস্ট যদি এই ঘনত্বের হতো তবে তা মাধ্যাকর্ষণের আকর্ষণে পৃথিবীকে বিচূর্ণ করে ফেলতো।

মহাবিশ্ব এই সময়ে অত্যন্ত দ্রুত প্রসারিত ও ঠান্ডা হচ্ছিল। এর প্রসারণের গতি যে শর্ত দ্বারা নির্ধারিত হচ্ছিল তা হলো, মহাবিশ্বের প্রতিটি অঞ্চল (Every Bit) এর যাদৃচ্ছিক কেন্দ্র (Arbitrary Centre) থেকে ঠিক নিষ্ক্রমণ বেগে (Escape Velocity) সরে যাচ্ছিল। প্রচন্ড ঘনত্বের কারণে প্রথম দৃশ্যে নিষ্ক্রমণ বেগও ছিল অত্যন্ত বেশি। এই সময়ে মহাবিশ্বের বৈশিষ্ট্যসূচক প্রসারণ সময় (Charecterstic Expansion Time) ছিল .০২ সেকেন্ড। [বৈশিষ্ট্যসূচক প্রসারণ সময় - কে মোটামুটি এভাবে সজ্ঞায়িত করা যায় ঃ যে সময়ে মহাবিশ্বের আকার শতকরা একভাগ বৃদ্ধি পায়,সেই সময়ের একশত গুণ সময়কে 'বৈশিষ্ট্যসূচক প্রসারণ ' সময় বলে। আরো বেশি সুনির্দিষ্টভাবে বলা যায়, যে কোন মুহূর্তে বৈশিষ্ট্যসূচক প্রসারণ সময়ের মান হলো ঐ মুহূর্তের 'হাবল- ধ্রুবক' (Hubble Constant) এর মানের বিপরীত সংখ্যা। মহাবিশ্বের বয়স সব সময়ই বৈশিষ্ট্যসূচক প্রসারণ সময়ের চেয়ে কম হয়, কেননা মহাকর্ষ ক্রমাগতভাবে প্রসারণকে শ্লথ করছে।]

এই সময়ে অল্প সংখ্যক পারমাণবিক কণিকা (Nuclear Particle) বিদ্যমান ছিল। প্রতি ১০০ কোটি ফোটন বা ইলেকট্রন বা নিউট্রিনো কণিকার বিপরীতে ছিল প্রায় একটি প্রোটন বা নিউট্রন মাত্র। প্রথম দিকের মহাবিশ্বে কি পরিমাণ রাসায়নিক উপাদান (Chemical Elements) বিদ্যমান ছিল তা জানার জন্য আমাদের প্রোটন ও নিউট্রনের তুলনামূলক অনুপাত জানা প্রয়োজন। নিউট্রন প্রোটনের তুলনায় অপেক্ষাকৃত ভারী কণিকা। এদের ভরের পার্থক্য ১.২৯৩ মিলিয়ন ইলেকট্রন ভোল্ট শক্তির সমান। দশ হাজার কোটি ডিগ্রী কেলভিন তাপমাত্রায় ইলেকট্রন ,পজিট্রন ইত্যাদির বৈশিষ্ট্যসূচক শক্তি (Charecterstic Energy) ছিল প্রায় ১০ মিলিয়ন ইলেকট্রন ভোল্ট। নিউট্রন ও প্রোটন এর সাথে বিদ্যমান অসংখ্য ইলেকট্রন, পজিট্রন ও অনুরূপ কণিকার সংঘর্ষের ফলে প্রোটনসমূহ দ্রুত নিউট্রনে (এবং তার উল্টো বিক্রিয়াটি অর্থাৎ নিউট্রনসমূহ প্রোটন- এ) রূপান্তরিত হচ্ছিল। দুটো গুরুত্বপূর্ণ বিক্রিয়া হলো ঃ

$$\text{এন্টি নিউট্রিনো} + \text{প্রোটন} \rightleftharpoons \text{পজিট্রন} + \text{নিউট্রন}$$

$$\text{নিউট্রিনো} + \text{নিউট্রন} \rightleftharpoons \text{ইলেকট্রন} + \text{প্রোটন}$$

আমাদের বিবেচনায় তখন ফোটন প্রতি সর্বমোট লেপটন সংখ্যা এবং চার্জ ছিল খুবই কম। নিউট্রিনোর প্রায় সমসংখ্যক প্রতিকণিকা এন্টি-নিউট্রিনো এবং ইলেকট্রনের প্রায় সমসংখ্যক প্রতি কণিকা পজিট্রন মহাবিশ্বে বিদ্যমান ছিল। ফলে যে গতিতে প্রোটন নিউট্রনে রূপান্তরিত হচ্ছিল ঠিক সেই একই গতিতে নিউট্রন প্রোটনে রূপান্তরিত হচ্ছিল। (এখানে নিউট্রনের Radio Active Decay-কে বিবেচনায় আনা হয়নি; কারণ এতে প্রায় ১৫ মিনিট সময় লাগে। মনে রাখতে হবে, আমরা মহাবিস্ফোরণের এক সেকেন্ডের একশত ভাগের একভাগ পরের সময়ের ঘটনাবলী নিয়ে আলোচনা করছি।) প্রথম দৃশ্যে ভারসাম্যের (Equilibrium) জন্য প্রয়োজন হলো প্রোটন এবং নিউট্রনের সংখ্যা ঠিক প্রায় সমান হওয়া। তখনও পারমাণবিক

কণিকাসমূহ নিউক্লিয়াসের (Nucleus) সাথে সংযুক্ত ছিল না। কারণ একটি আদর্শ নমুনার নিউক্লিয়াসের (Tyipical Nucleus) ছয় থেকে আট মিলিয়ন ইলেকট্রন ভোল্ট শক্তিতে ভেঙে যায়। এই শক্তি দশ হাজার কোটি ডিগ্রী কেলভিন তাপমাত্রার শক্তির তুলনায় অনেক কম। তাই এই তাপমাত্রায় একটি জটিল নিউক্লিয়াস গঠিত হওয়ার সাথে সাথেই ভেঙে যায়।

স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে, প্রথম দিকে (বা আরো সুস্পষ্টভাবে বললে প্রথম দৃশ্যে) মহাবিশ্ব কত বড় ছিল? দুর্ভাগ্যক্রমে বলতে হয়, আমরা জানি না এবং আমরা এমন কি নিশ্চিতও নই যে, এই প্রশ্নের কোন অর্থ রয়েছে কিনা। মহাবিশ্ব বর্তমানে যদি অসীম (Infinite) হয়ে থাকে, তবে প্রথম দৃশ্যেও এটি অসীমই হবে এবং তা সব সময়ই অসীম থাকবে। অপরদিকে এও সম্ভব হতে পারে যে, মহাবিশ্বের বর্তমানে সসীম পরিধি (Finite Circumference) রয়েছে। কখনও কখনও তা হিসাব করা হয়, প্রায় ১২৫ হাজার মিলিয়ন আলোকবর্ষ। [এই হিসাব হাবল ধ্রুবকের ভিত্তিতে করা হয়, যাতে এই অনুমান (Supposition) রয়েছে যে, মহাবিশ্বের ঘনত্ব এর ক্রান্তিক (Critical) মানের প্রায় দ্বিগুণ।] যেহেতু মহাবিশ্বের তাপমাত্রা এর আকারের ব্যস্তানুপাতে (Inverse Ratio) কমে,তাই প্রথম দৃশ্যে মহাবিশ্বের পরিধি ছিল মহাবিশ্বের তৎকালীন তাপমাত্রা $১০^{১১}$K ও বর্তমানে তাপমাত্রা ৩°K এই দুই সংখ্যার অনুপাতে কম। এই হিসাবে তখনকার পরিধি দাঁড়ায় ৪ আলোকবর্ষ। তবে মহাবিশ্বের পরিধি তখন কয়েক আলোকবর্ষ বা অসীম যাহাই হোক না কেন, তাতে প্রথম কয়েক মিনিটের মহাজাগতিক বিবর্তনের বর্ণনায় কোন পরিবর্তন হবে না।

দ্বিতীয় দৃশ্য ঃ মহাবিশ্বের তাপমাত্রা এখন তিন হাজার কোটি ডিগ্রী কেলভিন ($৩ X১০^{১০}$K)। প্রথম দৃশ্যের পর থেকে ০.১১ সেকেন্ড সময় অতিবাহিত হয়েছে। গুণগতভাবে কোন কিছুরই পরিবর্তন ঘটে নি। মহাবিশ্বের সবকিছুই (Contents) এখন ইলেকট্রন, পজিট্রন, এন্টিনিউট্রিনো এবং ফোটন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত (Dominate) হচ্ছিল। ইলেকট্রন, পজিট্রন, নিউট্রিনো, এন্টিনিউট্রিনো এবং ফোটন তাপীয় ভারসাম্যাবস্থায় ছিল এবং তখনকার তাপমাত্রা ছিল এদের সূচন তাপমাত্রার উপরে। তাই মহাবিশ্বের শক্তিঘনত্ব কমেছে তাপমাত্রার চতুর্থঘাত (Fourth Power) অনুযায়ী। মহাবিশ্বের ঘনত্ব ছিল তখন সাধারণ পানির তুলনায় প্রায় ৩০ মিলিয়ন গুণ বেশি। মহাবিশ্বের প্রসারণের হারও তাপমাত্রার বর্গের অনুপাতে কমে গেছে। তাই মহাবিশ্বের বৈশিষ্ট্যসূচক প্রসারণের সময় বেড়ে দাঁড়ালো প্রায় ০.২ সেকেন্ড। স্বল্প সংখ্যক পারমাণবিক কণিকা (Nuclear Particles) তখনও নিউক্লিয়াস গঠন করতে পারছিল না। কিন্তু তাপমাত্রা কমে যাওয়ার ফলে তুলনামূলক ভারী নিউট্রনসমূহের হালকা প্রোটনে পরিবর্তিত হওয়া যতটা সহজ ছিল, তার বিপরীত প্রক্রিয়াটি (অর্থাৎ প্রোটনের নিউট্রনে পরিবর্তিত হওয়া) তত সহজ ছিল না। এই অবস্থায় নিউট্রন ও প্রোটনের অনুপাত দাঁড়ালো ৩৮:৬২।

তৃতীয় দৃশ্য ঃ মহাবিশ্বের তাপমাত্রা এখন এক হাজার কোটি ডিগ্রী কেলভিন ($১০^{১০}$K)। প্রথম দৃশ্যের পর থেকে ১.০৯ সেকেন্ড সময় অতিবাহিত হয়েছে। ক্রমহ্রাসমান ঘনত্ব এবং তাপমাত্রা এই সময়ে নিউট্রিনো এবং এন্টিনিউট্রিনোসমূহের গড় মুক্ত সময়কে (Mean Free Time) এতটা বাড়িয়ে দেয় যে, তারা মুক্ত কণিকা

হিসেবে আচরণ করতে শুরু করে। নিউট্রিনো এবং এন্টিনিউট্রিনোসমূহ ইলেকট্রন, পজিট্রন বা ফোটনসমূহের সাথে আর তাপীয় ভারসাম্যতা বজায় রাখতে পারল না।এখন থেকে এরা আমাদের গল্পে কোন সক্রিয় ভূমিকা পালন করবে না, শুধু মহাবিশ্বের মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রের (Gravitational Field) শক্তির উৎসের অংশ হিসেবে তারা ক্রমাগত শক্তি যোগান দিবে। নিউট্রিনোসমূহ (এবং এন্টিনিউট্রিনো) তাপীয় স্থিতিশীলতা থেকে বের হওয়া সত্ত্বেও কোন কিছুরই বড় পরিবর্তন ঘটল না। [এই ডিকাপলিং (Decoupling)-এর আগে প্রতিনিধিত্বমূলক নিউট্রিনোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য ছিল তাপমাত্রার ব্যস্তানুপাতিক। যেহেতু মহাবিশ্বের আকারের ব্যস্তানুপাতে তাপমাত্রা কমছিল, তাই বলা যায়, মহাবিশ্বের আকারের সরাসরি অনুপাতে নিউট্রিনোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পাচ্ছিল। নিউট্রিনো ডিকাপলিং-এর পরে নিউট্রনোসমূহের তরঙ্গদৈর্ঘ্য মুক্তভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকল। লালসরণেও (Red Shift) তাদের তরঙ্গদৈর্ঘ্য মহাবিশ্বের আকারের সরাসরি অনুপাতে বৃদ্ধি পায়। এতে এটাই প্রমাণিত হয় যে, নিউট্রিনো ডিকাপলিং-এর সুনির্দিষ্ট মুহূর্তটি নির্ধারণ করা খুব গুরুত্বপূর্ণ নয়। কারণ, তা নির্ভর করে নিউট্রিনো মিথস্ক্রিয়ার (Neutrino Interaction) এ বিস্তারিত তত্ত্বের উপর, যা এখনও সম্পূর্ণরূপে মীমাংসিত হয়নি।]

দ্বিতীয় দৃশ্যে মহাবিশ্বের সর্বমোট শক্তিঘনত্ব (Energy Density) যা ছিল তা এখন হ্রাসপ্রাপ্ত তাপমাত্রার চতুর্থ ঘাত (Fourth Power) অনুপাতে কমে এলো। তখনকার মহাবিশ্বের ঘনত্ব ছিল সাধারণ পানির তুলনায় ৩,৮০,০০০ গুণ বেশি। মহাবিশ্বের বৈশিষ্ট্যসূচক প্রসারণ সময়ও যথারীতি বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় দুই সেকেন্ডে দাঁড়ালো। এখনকার তাপমাত্রা ইলেকট্রন ও পজিট্রনের 'সূচন তাপমাত্রার' মাত্র দ্বিগুণ। ফলে, বিকিরণ থেকে এরা (ইলেকট্রন ও পজিট্রন) যত তাড়াতাড়ি সৃষ্টি হতে পারছিল, তার চেয়ে অধিক দ্রুতগতিতে বিনাশ প্রাপ্ত হচ্ছিল।

তাপমাত্রা তখনও এত বেশি ছিল যে, নিউট্রন এবং প্রোটনসমূহ (অণুর) নিউক্লিয়াস গঠন করতে পারছিল না। তাপমাত্রা ক্রমাগত কমতে থাকার কারণে প্রোটন ও নিউট্রনের অনুপাত পরিবর্তিত হয়ে দাঁড়ালো ৭৬ঃ২৪।

চতুর্থ দৃশ্য ঃ মহাবিশ্বের তাপমাত্রা এখন তিন শত কোটি ডিগ্রী কেলভিন ($৩০X১০^{৯}K$)। প্রথম দৃশ্যের পর থেকে ১৩.৮২ সেকেন্ড সময় অতিবাহিত হয়েছে। এই সময়ের তাপমাত্রা ইলেকট্রন ও পজিট্রনের সূচন তাপমাত্রার নিচে (উল্লেখ্য, ইলেকট্রনের সূচন তাপমাত্রা ৫৯৩ কোটি ডিগ্রী কেলভিন)। অতএব মহাবিশ্বের প্রধান কণিকা হিসেবে এরা দ্রুত অদৃশ্য হতে শুরু করলো। তাদের বিনাশিত হওয়ার (Anihilation) মাধ্যমে যে শক্তি মুক্ত হচ্ছিল, তা মহাবিশ্বের শীতল হওয়ার গতিকে শ্লথ করে দিল। এই অতিরিক্ত তাপ না পাওয়ার কারণে নিউট্রিনোগুলোর তাপমাত্রা ইলেকট্রন, পজিট্রন এবং ফোটনসমূহের তাপমাত্রা অপেক্ষা শতকরা আট ভাগ কমে গেল। এখন থেকে মহাবিশ্বের তাপমাত্রা বলতে আমরা ফোটনের তাপমাত্রাকেই বুঝাবো। ইলেকট্রন ও পজিট্রন দ্রুত অদৃশ্য হওয়ার সাথে সাথে মহাবিশ্বের শক্তিঘনত্ব হ্রাসপ্রাপ্ত তাপমাত্রার চতুর্থঘাত অনুপাতে হ্রাস পেয়ে যা হওয়া উচিত, তার চেয়েও কিছুটা কম হলো।

এই সময়ের তাপমাত্রা হিলিয়াম (He^4) এর মতো বিভিন্ন স্থায়ী পরমাণুর নিউক্লিয়াস গঠনের অনুকূল, তবে সেটাও খুব তাড়াতাড়ি ঘটল না। কারণ, মহাবিশ্ব এত দ্রুত প্রসারিত হচ্ছিল যে শুধু দুই কণিকার দ্রুত সিরিজ বিক্রিয়ার মাধ্যমেই নিউক্লিয়াস গঠিত হতে পারত। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, একটি প্রোটন ও একটি নিউট্রন একটি ভারী হাইড্রোজেন বা ডিউটেরিয়াম-এর নিউক্লিয়াস গঠন করতে পারে এবং এদের অতিরিক্ত শক্তি ও ভরবেগ একটি ফোটন নিয়ে নেয়। তারপর ডিউটেরিয়ামের নিউক্লিয়াস প্রোটনের সাথে সংঘর্ষের মাধ্যমে হিলিয়ামের হালকা আইসোটোপ হিলিয়াম থ্রি (He^3) গঠন করতে পারে, যাতে রয়েছে দুটো প্রোটন ও একটি নিউট্রন অথবা ডিউটেরিয়ামের নিউক্লিয়াস নিউট্রনের সাথে সংঘর্ষের মাধ্যমে টিট্রিয়াম নামক হাইড্রোজেনের সবচেয়ে ভারী আইসোটোপ সৃষ্টি করতে পারে,যাতে রয়েছে দুটো নিউট্রন ও একটি প্রোটন। শেষ পর্যন্ত হিলিয়াম থ্রি (He^3) একটি নিউট্রনের সাথে সংঘর্ষের মাধ্যমে সাধারণ হিলিয়ামের নিউক্লিয়াস গঠন করতে পারে। উল্লেখ্য, একটি সাধারণ হিলিয়াম (নিউক্লিয়াস) দুটো প্রোটন ও দুটো নিউট্রন দ্বারা গঠিত। কিন্তু এই চেইন বিক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার জন্য প্রথমেই প্রয়োজন ডিউটেরিয়াম সৃষ্টি হওয়া।

একটি সাধারণ হিলিয়াম নিউক্লিয়াসের বন্ধন এত শক্ত যে তৃতীয় দৃশ্যের তাপমাত্রায়ও এটি ভেঙ্গে যায় না। কিন্তু ট্রিটিয়াম এবং হিলিয়াম^3-এর নিউক্লিয়াস অনেকটা কম শক্তভাবে বাঁধা এবং ডিউটেরিয়াম -এর নিউক্লিয়াস বিশেষ করে হালকাভাবে বাঁধা বা হালকা বন্ধন যুক্ত। (একটি হিলিয়াম নিউক্লিয়াস থেকে একটি পারমাণবিক কণিকা টেনে আনতে যে পরিমাণ শক্তি প্রয়োজন, তার মাত্র নয় ভাগের এক ভাগ শক্তি প্রয়োগ করেই ডিউটেরিয়াম -এর নিউক্লিয়াস থেকে একটি পারমাণবিক কণিকাকে বিচ্ছিন্ন করা যায়।) চতুর্থ দৃশ্যের ৩ X ১০^{9}K তাপমাত্রায় ডিউটেরিয়াম- এর নিউক্লিয়াস গঠিত হবার সাথে সাথেই ভেঙ্গে যায় ; ফলে অধিকতর ভারী নিউক্লিয়াস গঠিত হবার সুযোগ পায় না। নিউট্রনসমূহ তখনও প্রোটনে পরিবর্তিত হচ্ছিল, যদিও আগের চেয়ে তুলনামূলক ধীর গতিতে। এখন নিউট্রন ও প্রোটনের পারস্পরিক অনুপাত দাঁড়ালো ১৭:৮৩।

পঞ্চম দৃশ্য ঃ মহাবিশ্বের তাপমাত্রা (মনে রাখা প্রয়োজন, ফোটনের তাপমাত্রাকেই এখন মহাবিশ্বের তাপমাত্রা হিসেবে বিবেচনা করা হয়) এখন এক শত কোটি ডিগ্রী কেলভিন (১০^{9}K)। এই তাপমাত্রা সূর্যের কেন্দ্রের তাপমাত্রা থেকে মাত্র ৭০ গুণ বেশি। প্রথম দৃশ্যের পর থেকে তিন মিনিট দুই সেকেন্ড সময় অতিবাহিত হয়েছে। ইলেকট্রন এবং পজিট্রনসমূহ বহুলাংশে অদৃশ্য হয়েছে। এখন মহাবিশ্বের প্রধান কণিকা হলো ফোটন, নিউট্রিনো এবং এন্টিনিউট্রিনো। ইলেকট্রন- পজিট্রন বিনাশিত হওয়ার মাধ্যমে যে শক্তি মুক্ত হয়েছে, তা ফোটনের তাপমাত্রাকে নিউট্রিনোর তুলনায় ৩৫ শতাংশ বৃদ্ধি করেছে।

মহাবিশ্বে এখন ট্রিটিয়াম, হিলিয়াম থ্রি ও সাধারণ হিলিয়াম-এর নিউক্লিয়াস গঠনের জন্য অনুকূল তাপমাত্রা বিদ্যমান। কিন্তু 'ডিউটেরিয়াম বিষয়ক জটিলতা' (Deuterium Bottleneck) এখনও রয়ে গেল। ফলে ডিউটেরিয়াম -এর নিউক্লিয়াস বেশীক্ষণ টিকে থাকলো না। এই কারণে পর্যাপ্ত পরিমাণ ভারী নিউক্লিয়াস গঠিত হতে পারলো না। ইলেকট্রন, নিউট্রিনো এবং তাদের প্রতিকণিকার সাথে

নিউট্রন ও প্রোটনের সংঘর্ষ এখন অনেকটা কমে এলো (বা বন্ধ হয়ে এলো)। কিন্তু এই পর্যায়ে মুক্ত নিউট্রনের ভাঙ্গন (Decay) শুরু হওয়াটা গুরুত্বপূর্ণ হতে লাগলো। প্রতি একশত সেকেন্ড সময়ে অবশিষ্ট নিউট্রনের দশ শতাংশ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে প্রোটনে পরিবর্তিত হচ্ছিল। নিউট্রন ও প্রোটনের এখনকার অনুপাত হলো ১৪: ৮৬।

অল্প সময় পরের দৃশ্য ঃ পঞ্চম চিত্রের স্বল্প সময় পরে এক নাটকীয় ঘটনা ঘটে। তাপমাত্রা তখন এমন এক স্থানে নেমে আসে যে, 'ডিউটেরিয়াম বিষয়ক জটিলতা' দূরীভূত হওয়ার সাথে সাথেই খুব দ্রুত ভারী নিউক্লিয়াস তৈরি হতে থাকলো। চতুর্থ দৃশ্যে বর্ণিত দুই কণিকার ধারাবাহিক (Series) ও চেইন বিক্রিয়ার মাধ্যমেই 'ভারী নিউক্লিয়াস' গঠিত হতে লাগলো। তা সত্ত্বেও অন্যান্য জটিলতার কারণে হিলিয়ামের চেয়ে ভারী পরমাণুর নিউক্লিয়াস পর্যাপ্ত সংখ্যক গঠিত হলো না। কারণ পাঁচ বা আটটি পারমাণবিক কণিকা দ্বারা গঠিত নিউক্লিয়াসগুলো স্থিতিশীল (Stable) নয়। তাই তাপমাত্রা যখনই 'ডিউটেরিয়াম নিউক্লিয়াস' গঠনের অনুকূল পর্যায়ে পৌঁছে, তখন প্রায় অবশিষ্ট সব নিউট্রন দ্রুত হিলিয়ামের নিউক্লিয়াসে পরিণত হয়। যে সুনির্দিষ্ট তাপমাত্রায় এটি ঘটে তা কিছুটা নির্ভর করে ফোটন প্রতি পারমাণবিক কণিকার সংখ্যার উপর। কেননা কণিকার উচ্চ ঘনত্ব নিউক্লিয়াস গঠনের জন্য কিছুটা সহজতর। [এই কারণেই আমাকে কিছুটা অনির্দিষ্টভাবে বলতে হয়েছে পঞ্চম দৃশ্যের অল্প সময় পরে (A little latter)]। যদি প্রতিটি পারমাণবিক কণিকার জন্য ১০০০ মিলিয়ন ফোটন থাকে তবে নব্বই কোটি ডিগ্রী কেলভিন (০.৯ X ১০^{৯}K) তাপমাত্রায় পারমাণবিক সংশ্লেষণ ঘটতে শুরু করবে। ঐ মুহূর্তে প্রথম দৃশ্যের পর থেকে তিন মিনিট ছেচল্লিশ সেকেন্ড সময় অতিবাহিত হয়েছে। [এই বইয়ের নাম ' প্রথম তিন মিনিট' রাখায় যে অশুদ্ধতা (Inaccuracy) রয়েছে সেজন্য পাঠক আমাকে ক্ষমা করবেন। খুবই যথার্থ হতো যদি এই বইয়ের নাম রাখা হতো 'প্রথম পৌনে চার মিনিট' (The First Three And Three Quarter Minutes.)] পারমাণবিক সংশ্লেষণ (Nucleosynthesis) শুরু হবার আগে নিউট্রন ভাঙনের কারণে নিউট্রন ও প্রোটনের অনুপাত দাঁড়ালো ১৩:৮৭। পারমাণবিক সংশ্লেষণের পর মহাবিশ্বে ' হিলিয়াম নিউক্লিয়াস'-এর ওজন দাঁড়ালো যে সব পারমাণবিক কণিকা দ্বারা হিলিয়াম নিউক্লিয়াস গঠিত হয়েছিল তার ওজনের ঠিক সমান। হিলিয়াম নিউক্লিয়াসের অর্ধেক হলো নিউট্রন। (স্মর্তব্য : দুটি প্রোটন ও দুটি নিউট্রন নিয়ে হিলিয়াম নিউক্লিয়াস গঠিত)। যেহেতু সকল নিউট্রনই হিলিয়াম নিউক্লিয়াসে পরিণত হয়েছিল, তাই সে সময়ে বিদ্যমান সকল পারমাণবিক কণিকার মধ্যে 'হিলিয়াম নিউক্লিয়াস' গঠনকারী পারমাণবিক কণিকাসমূহের ওজন দাড়ালো নিউট্রনের দ্বিগুণ অর্থাৎ ২৬%। যদি পারমাণবিক কণিকার ঘনত্ব কিছুটা বেশি হয়ে থাকে, তবে পারমাণবিক সংশ্লেষণ আরো কিছু সময় পূর্বে শুরু হয়ে থাকবে, যখন এত বেশি পরিমাণ নিউট্রন ভাঙ্গন হয় নি। সেক্ষেত্রে আরো কিছুটা বেশি পরিমাণ হিলিয়াম নিউক্লিয়াস গঠিত হয়ে থাকবে। কিন্তু সম্ভবত তা ওজন হিসেবে ২৮% এর বেশি হবে না।

আমরা এখন আমাদের পরিকল্পিত চলমান সময়ে (Running Time) পৌঁছে গিয়েছি এবং তা অতিক্রম করেছি। কিন্তু একে আরো সুন্দরভাবে সমাপ্ত করার লক্ষ্যে মহাবিশ্বের তাপমাত্রা আরেক ধাপ কমার পর কি ঘটেছিল সে দিকে একবার তাকানো দরকার।

ষষ্ঠ দৃশ্য ঃ মহাবিশ্বের তাপমাত্রা এখন ত্রিশ কোটি ডিগ্রী কেলভিন (৩ X ১০°K)। প্রথম দৃশ্যের পর থেকে চৌত্রিশ মিনিট চল্লিশ সেকেন্ড সময় অতিবাহিত হয়েছে। ইলেকট্রন এবং পজিট্রনগুলো মুখোমুখি সংঘর্ষে এখন সম্পূর্ণরূপে বিনাশপ্রাপ্ত হয়েছে। শুধু প্রতি ১০০ মিলিয়ন ইলেকট্রনের মধ্যে একটি মাত্র ইলেকট্রন অবশিষ্ট রয়েছে বিদ্যমান প্রোটনের চার্জকে ব্যালান্স করার জন্য। ইলেকট্রন- পজিট্রন বিনাশিত হবার সময়ে যে শক্তি মুক্ত হলো, তা ফোটনের তাপমাত্রাকে নিউট্রিনোর তাপমাত্রার তুলনায় স্থায়ীভাবে ৪০.১% বাড়িয়ে দিলো। পানির ঘনত্বের তুলনায় মহাবিশ্বের শক্তিঘনত্ব দাঁড়ালো ৯.৯%। এই শক্তির ৩১% (একত্রিশ শতাংশ) রইল নিউট্রিনো এবং এন্টিনিউট্রিনো-এর মধ্যে এবং ৬৯% রইলো ফোটন হিসেবে। এই শক্তিঘনত্ব মহাবিশ্বের বৈশিষ্ট্যসূচক প্রসারণ সময়কে প্রায় এক ঘন্টা পনের মিনিটে নিয়ে গেল। পারমাণবিক বিক্রিয়াগুলো বন্ধ হয়ে গেল। পারমাণবিক কণিকাগুলোর বেশি অংশই হিলিয়াম নিউক্লিয়াস (একটি প্রোটন ও একটি নিউট্রন) তৈরি করে টিকে রইলো অথবা হাইড্রোজেনের নিউক্লিয়াস (একটি প্রোটন) হিসেবে মুক্ত থাকল। এর মধ্যে হিলিয়াম নিউক্লিয়াসের পরিমাণ দাঁড়ালো ওজন হিসেবে প্রায় ২২% থেকে ২৮%। মুক্ত বা বন্ধনে আবদ্ধ প্রত্যেকটি প্রোটনের জন্য থাকলো একটি করে ইলেকট্রন। কিন্তু মহাবিশ্ব তখনও এতো উত্তপ্ত যে স্থায়ী অণু তৈরি হতে পারল না।

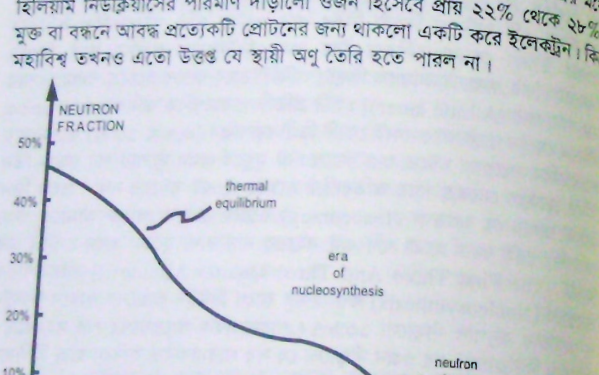

চিত্র ৯- পরিবর্তনশীল নিউট্রন- প্রোটনের স্থিতাবস্থা ঃ সকল পারমাণবিক কণিকা প্রতি নিউট্রনের অংশকে উপরের চিত্রে তাপমাত্রা ও সময়ের অপেক্ষক হিসেবে দেখানো হয়েছে। রেখাচিত্রের যে অংশে তাপীয় স্থিতাবস্থা নির্দেশ করা হয়েছে তা দ্বারা ঐ সময়কে বর্ণনা করা হয়েছে, যে সময়ে ঘনত্ব এবং তাপমাত্রা এতো বেশি ছিল যে তখন সকল কণিকার মধ্যে তাপীয় স্থিতাবস্থা বিদ্যমান ছিল। পরিসংখ্যানগত বলবিদ্যার নিউট্রন ও প্রোটনের ভরের পার্থক্য থেকে নিউট্রনের অংশ নির্ণয় করা যায়। যে সময়ে সকল নিউট্রন প্রোটনে পরিবর্তিত হওয়ার প্রক্রিয়াগুলো বন্ধ হয়ে যায়, সে সময়কে বক্ররেখার নিউট্রন ভাঙন চিহ্নিত অংশ দ্বারা দেখানো হয়েছে। মুক্ত নিউট্রনের ভাঙ্গন তখন চলছিল। বক্ররেখার মধ্যবর্তী অংশটুকু নির্ভর করে দুর্বল মিথস্ক্রিয়ার ক্রান্তিকালের হারের উপর। কোনক্রমে যদি নিউক্লিয়াস গঠন বন্ধ করা যেতো তা হলে যে অবস্থার সৃষ্টি হতো তা রেখাচিত্রের 'ড্যাশ চিহ্নিত' অংশ দ্বারা দেখানো হয়েছে। বস্তুতপক্ষে তীর চিহ্নিত পারমাণবিক সংশ্লেষণ যুগের কোন এক সময়ে নিউট্রন

প্রোটনের অনুপাত যা ছিল, ঠিক সেই মানে স্থির হয়ে গেল। এই বক্তব্যকে ব্যবহার করে মহাজাগতিকভাবে সৃষ্ট হিলিয়ামের অংশ (ওজন হিসেবে) নিরূপণ করা যায়। পারমাণবিক সংশ্লেষণের যে কোন প্রদত্ত মানের তাপমাত্রায় বা সময়ে হিলিয়াম হবে ঐ সময়ের নিউট্রনের অংশের ঠিক দ্বিগুণ।

মহাবিশ্ব এখন শুধু প্রসারিত এবং ঠান্ডা হতে থাকবে। কিন্তু সাত লক্ষ বছর পর্যন্ত খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু ঘটবে না। এই সময়ে মহাবিশ্বের তাপমাত্রা এমন এক পর্যায়ে নেমে আসবে যে, ইলেকট্রন এবং নিউক্লিয়াস স্থায়ী অণু গঠন করতে পারবে। ইলেকট্রনগুলো মুক্ত না থাকার কারণে মহাবিশ্বের অভ্যন্তরস্থ বস্তুসমূহ (Content) বিকিরণের মধ্যে স্বচ্ছ হয়ে উঠলো এবং বস্তু (Matter) ও বিকিরণের ডিকাপলিং (Decoupling)- এর মাধ্যমে নীহারিকা ও নক্ষত্রের গঠন শুরু হয়। আরও এক হাজার কোটি বছর পরে (বা তেমন কিছু সময়) এই মহাবিশ্বে বসবাসকারী প্রাণীরা এই ইতিহাস পুনর্গঠন করতে শুরু করে।

আদি মহাবিশ্বের এই গণনার একটি ফলাফল রয়েছে যা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে দ্রুতই যাচাই করা যায়। সেটা হলো প্রথম তিন মিনিট পর মহাবিশ্বে পদার্থের যে অবশেষ রইলো তা দিয়ে অবশ্যই তারাগুলো গঠিত হয়েছিল। আর অবশেষ হিসেবে ছিল ২২% থেকে ২৮ % হিলিয়াম এবং বাকী প্রায় সব হাইড্রোজেন। আমরা জানি এ ঘটনাটি নির্ভর করে এই ধারণার উপর যে, প্রতিটি পারমাণবিক কণিকার বিপরীতে বিপুল সংখ্যক ফোটন রয়েছে। এটা আবার পরিমাপ করা হয় বর্তমান মহাজাগতিক মাইক্রোওয়েভ বিকিরণের পটভূমি তাপমাত্রা ৩°K -এর উপর ভিত্তি করে। মাইক্রোওয়েভ বিকিরণের পরিমাপকৃত তাপমাত্রার উপর ভিত্তি করে মহাবিশ্বে হিলিয়ামের পরিমাণ নির্ধারণের প্রথম প্রয়াস চালান পি.জে.ই. পিবলস (P.J.E.Peebles) ১৯৬৫ সালে প্রিন্সটনে। এর অল্প আগেই পেনজিয়াস (Penzias) এবং উইলসন (Wilson) কর্তৃক মহাজাগতিক মাইক্রোওয়েভ বিকিরণের বিষয়টি আবিষ্কৃত হয়। রবার্ট ওয়াগোনার (Robert Wagoner), উইলিয়াম ফাউলার (William Fowler) এবং ফ্রেড হয়েল (Fred Hoyle) প্রায় একই সময়ে এবং স্বাধীনভাবে আরো বিস্তারিত গণনার মাধ্যমে প্রায় একই রকম ফলাফল পান। এই ফলাফল ছিল স্ট্যান্ডার্ড মডেলের (Standard Model) বিস্ময়কর সাফল্য। কারণ সম্পূর্ণ পৃথক গণনা থেকে ইতোমধ্যেই জানা গিয়েছিল যে, সূর্য এবং অন্যান্য নক্ষত্র জীবন শুরু করে প্রধানত হাইড্রোজেন দিয়ে, যার সাথে ২০%- ৩০% হিলিয়াম থাকে।

পৃথিবীতে অবশ্য খুবই কম হিলিয়াম পাওয়া যায়। কিন্তু এর কারণ হলো, হিলিয়াম অণু এতো হালকা এবং রাসায়নিকভাবে নিষ্ক্রিয় যে, তাদের অধিকাংশই পৃথিবী থেকে বহু আগে উবে চলে গেছে (Escaped The Earth)। আদি মহাবিশ্বে বা মহাবিশ্বের শুরু থেকেই হিলিয়াম প্রাচুর্যের এই যে হিসাব তার ভিত্তি হলো নাক্ষত্রিক বিবর্তনের পরিসংখ্যানগত বিশ্লেষণের বিস্তারিত গণনার তুলনা, পর্যবেক্ষণকৃত নক্ষত্রের পরিসংখ্যানগত বিশ্লেষণ এবং হিলিয়াম লাইনসমূহ, যা উত্তপ্ত নক্ষত্র ও আন্তঃনাক্ষত্রিক বস্তুর বর্ণালী (Spectra) সরাসরি পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে। প্রকৃতপক্ষে ১৮৬৮ সালে জে. নরমান লকইয়ার (J.Norman Lockyer) প্রথম সূর্যের বর্ণালী (Spectrum of The Sun's Atmosphere) পর্যবেক্ষণ করে সূর্যের উপাদান হিসেবে হিলিয়ামকে চিহ্নিত করেন।

১৯৬০ সালের প্রথম দিকে কয়েকজন জ্যোতির্বিজ্ঞানী দেখতে পেলেন যে, গ্যালাক্সীসমূহে হিলিয়ামের পরিমাণ যে শুধু বেশি তাই নয় ; মহাবিশ্বের বিভিন্ন স্থানে ভারী মৌলসমূহের পরিমাণগত পার্থক্য থাকলেও হিলিয়ামের পরিমাণে তেমন বড় কোন পার্থক্য নেই। হিলিয়াম যদি নক্ষত্র সৃষ্টির আগেই আদি মহাবিশ্বে (Early Universe) তৈরি হয়ে থাকে এবং ভারী কণিকাসমূহ যদি নক্ষত্রের মধ্যে উৎপন্ন হয়ে থাকে তবেই এমনটি হওয়া সম্ভব। পারমাণবিক কণিকার যে প্রাক্কলন (Estimate), তাতে বেশ কিছুটা ভিন্নতা রয়েছে এবং অনেকটা অনিশ্চয়তাও রয়েছে। কিন্তু আদি মহাবিশ্বে হিলিয়ামের পরিমাণ ২০% - ৩০% থাকার সাক্ষ্য (Evidence) 'স্ট্যান্ডার্ড মডেল' গ্রহণের পক্ষে একটি বিরাট উৎসাহব্যঞ্জক তত্ত্ব।

প্রথম তিন মিনিটের পর বিপুল পরিমাণ হিলিয়াম (হিলিয়াম নিউক্লিয়াস) উৎপন্ন হওয়া ছাড়াও সামান্য পরিমাণ হালকা নিউক্লিয়াস সৃষ্টি হয়েছিল যেগুলো সাধারণ হিলিয়াম নিউক্লিয়াসে একীভূত হওয়া এড়াতে পেরেছিল। এগুলো হলো প্রধানত ডিউটেরিয়াম (একটা অতিরিক্ত নিউট্রনসহ হাইড্রোজেন পরমাণুর নিউক্লিয়াস) এবং হালকা হিলিয়াম আইসোটোপ (He^3), যাতে রয়েছে দুটো প্রোটন ও একটি নিউট্রন (ওয়াগোনার, ফাউলার এবং হয়েল ১৯৬৭ সালে প্রথম হিলিয়াম ও ডিউটেরিয়াম এর পরিমাণ নিরূপণ করেন।) পারমাণবিক কণিকার ঘনত্বের বিষয়টি হিলিয়ামের পরিমাণের উপর যতটা নির্ভরশীল, তার চাইতে অনেকটা বেশি নির্ভরশীল ডিউটেরিয়ামের পরিমাণের উপর। কেননা অধিকতর ঘনত্বের ক্ষেত্রে পারমাণবিক বিক্রিয়া ক্ষুদ্রতর গতিতে অগ্রসর হয়েছিল। ফলে প্রায় সকল ডিউটেরিয়াম হিলিয়ামে পরিণত হয়ে থাকবে। আরো সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে চাইলে আদি মহাবিশ্বে উৎপন্ন ডিউটেরিয়ামের পরিমাণের তিনটি সম্ভাব্য মান উল্লেখ করা যায়। প্রতিটি পারমাণবিক কণিকার বিপরীতে সম্ভাব্য ফোটনের (ফোটন সংখ্যার) এই যে মান, তা বের করেন ওয়াগোনার (Wagoner)।

পারমাণবিক কণিকা প্রতি ফোটন সংখ্যা	ডিউটেরিয়াম-এর পরিমাণ (পিপিএম)
১০০ মিলিয়ন	০.০০০০৮
১০০০ মিলিয়ন	১৬
১০,০০০ মিলিয়ন	৬০০

নক্ষত্র সৃষ্টির আগে আদি মহাবিশ্বে কি পরিমাণ ডিউটেরিয়াম বিদ্যমান ছিল তা সঠিকভাবে নির্ধারণ করতে পারলে আমরা ফোটন ও পারমাণবিক কণিকার সুনির্দিষ্ট অনুপাত বের করতে পারতাম। বিকিরণের বর্তমান তাপমাত্রা যে তিন ডিগ্রী কেলভিন (৩°K) তা জানা থাকায় আমরা বর্তমান মহাবিশ্বের পারমাণবিক ভর ঘনত্বের (Nuclear Mass Density) সুনির্দিষ্ট মান নির্ধারণ করতে পারতাম এবং নির্ধারণ করতে পারতাম যে, মহাবিশ্ব উন্মুক্ত (Open) নাকি আবদ্ধ (Closed)।

দুর্ভাগ্যজনকভাবে আদি মহাবিশ্বে ডিউটেরিয়ামের সঠিক পরিমাণ নির্ধারণ করা খুবই কঠিন। এই পৃথিবীর পানিতে ডিউটেরিয়ামের সঠিক পরিমাণের স্বীকৃত মান হলো ওজন হিসেবে ১৫০ পিপিএম (অর্থাৎ ওজন হিসেবে প্রতি দশ লক্ষ ভাগ পানির একশত পঞ্চাশ ভাগ)। যা হোক এটা হলো একটি পক্ষপাতদুষ্ট পরিসংখ্যান

(Biased Figure)। তবে ডিউটেরিয়ামের পরমাণু হাইড্রোজেন পরমাণুর তুলনায় দ্বিগুণ ভারী হওয়ার কারণে এটাই বেশি স্বাভাবিক যে, ডিউটেরিয়াম পরমাণু ভারী পানির (HDO) অণুতে পরিণত হয়েছে। ফলে হাইড্রোজেনের তুলনায় অল্প পরিমাণ ডিউটেরিয়াম পৃথিবীর মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রের টানকে এড়াতে পেরেছিল। অপর পক্ষে বর্ণালীবীক্ষণের মাধ্যমে দেখা যায় যে সূর্যের পৃষ্ঠভাগে ডিউটেরিয়ামের পরিমাণ ৪ পিপিএম এর চেয়েও কম। এটা একটা পক্ষপাতদুষ্ট পরিসংখ্যান - কেননা সূর্যের পৃষ্ঠদেশের (বা বর্হিভাগের) ডিউটেরিয়াম -এর অধিকাংশ হাইড্রোজেনের সাথে একীভূত হয়ে (Fusing) হিলিয়ামের হালকা আইসোটোপ He^3 তে পরিণত হওয়ায় হ্রাস হয়ে গেছে।

১৯৭৩ সালে পৃথিবীর কৃত্রিম উপগ্রহ কোপারনিকাস থেকে অতিবেগুনি রশ্মি পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে মহাবিশ্বে হিলিয়ামের যে পরিমাণ বের করা হয় তা মহাবিশ্বে হিলিয়ামের পরিমাণের বিষয়ে আমাদের জ্ঞানকে একটি অনেক দৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড় করেছে। হাইড্রোজেন পরমাণুর মতো হিলিয়াম পরমাণু কয়েকটি নির্দিষ্ট (Distinct) তরঙ্গদৈর্ঘ্যের অতি বেগুনি রশ্মি শোষণ করতে পারে। একটি পরমাণু সর্বনিম্ন শক্তিস্তর থেকে পরবর্তী উচ্চতর শক্তিস্তরে যাবার ক্রান্তিকালের (বা ক্ষণস্থায়ী সময়ের) সাথে তরঙ্গদৈর্ঘ্য সঙ্গতিপূর্ণ হয়ে থাকে। এই তরঙ্গদৈর্ঘ্যগুলো কিছুটা নির্ভর করে পরমাণুর নিষ্ক্রিয়াসের ভরের উপরে। একটি নক্ষত্রের অতিবেগুনি রশ্মির বর্ণালী যখন আমাদের নিকট পৌছে তখন এর আলোকে হাইড্রোজেন এবং ডিউটেরিয়ামের আন্তঃনাক্ষত্রিক পদার্থের মিশ্রণের মধ্য দিয়ে আসতে হয়। অতিবেগুনি রশ্মিকে কয়েকটি কালো বিশোষণ রেখা (Dark Absorption Line) অতিক্রম করতে হয় বলে প্রত্যেকটি রশ্মি দুটি অংশে ভেঙে পড়ে একটি হাইড্রোজেনের কারণে, অপরটি ডিউটেরিয়ামের কারণে। যে কোন এক জোড়া বিশোষণ লাইনের উপাদানের (Components) আপেক্ষিক অন্ধকার তুলনা করে আন্তঃনাক্ষত্রিক মেঘে হাইড্রোজেন ও ডিউটেরিয়ামের তুলনামূলক পরিমাণ বের করা সম্ভব। দুর্ভাগ্য এই যে, ভূপৃষ্ঠের আবহাওয়ার কারণে ভূপৃষ্ঠ থেকে যে কোন প্রকার 'অতিবেগুনি জ্যোতির্বিদ্যা'র (Ultra Violet Astronomy) পরীক্ষা চালানো কঠিন। কৃত্রিম উপগ্রহ কোপারনিকাসে স্থাপনকৃত অতিবেগুনি বর্ণালীবীক্ষণ (Ultra Violet Spectrometer) -এর মাধ্যমে উত্তর বিজয় (B Centaurus) নক্ষত্রের বর্ণালীতে বিশোষণরেখার (Absorption Line) উপর পর্যবেক্ষণ চালানো হয়। তাদের আপেক্ষিক তীব্রতা থেকে দেখা যায় যে, আমাদের নক্ষত্র এবং B-centaurus নক্ষত্রের মধ্যবর্তী আন্তঃনাক্ষত্রিক পদার্থে (Interstellar Medium) ডিউটেরিয়াম - এর পরিমাণ ২০ পিপিএম। অন্যান্য নক্ষত্রের বর্ণালীতে অতিবেগুনি রশ্মি শোষণ লাইনের আরো সাম্প্রতিক পর্যবেক্ষণ থেকেও (ডিউটেরিয়ামের পরিমাণের) একই ধরনের ফলাফল পাওয়া গেছে।

এই ২০ পিপিএম ডিউটেরিয়াম যদি সত্যিই আদি মহাবিশ্বে সৃষ্টি হয়ে থাকে, তাহলে এতোদিন (এবং বর্তমানেও) ঠিক প্রায় ১১০ কোটি ফোটনের জন্য একটি করে পারমাণবিক কণিকা থেকে থাকবে। বর্তমান ৩°K মহাজাগতিক তাপমাত্রায় মহাবিশ্বের প্রতি লিটার স্থানে ৫,৫০,০০০ ফোটন রয়েছে। অতএব প্রতি মিলিয়ন লিটার স্থানে বর্তমানে ৫০০ পারমাণবিক কণিকা রয়েছে। একটি আবদ্ধ (Closed)

মহাবিশ্বের ন্যূনতম যে ঘনত্ব থাকা প্রয়োজন তার তুলনায় এটা অনেক কম। কারণ বর্তমানে মহাবিশ্ব আবদ্ধ হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ন্যূনতম ঘনত্ব হলো প্রতি মিলিয়ন লিটার স্থানে প্রায় ৩০০০ পারমাণবিক কণিকা। তাহলে সিদ্ধান্ত দাঁড়ায়, মহাবিশ্ব খোলা (Open) অর্থাৎ আবদ্ধ নয়। তার মানে এই গ্যালাক্সীগুলো নিষ্ক্রমণ বেগের চাইতে অধিক বেগে চলছে এবং মহাবিশ্ব চিরকালই প্রসারিত হতে থাকবে। আন্তঃনাক্ষত্রিক পদার্থের কিছুটা যদি নক্ষত্রের মধ্যে সৃষ্টি হয়ে থাকে , সে ক্ষেত্রে কিছু ডিউটেরিয়াম (যেমন হয়েছে সূর্যের মধ্যে) ধ্বংস হয়ে থাকবে। তখন আদি মহাবিশ্বে সৃষ্ট ডিউটেরিয়াম-এর পরিমাণ অবশ্যই ২০ পিপিএম (যা কৃত্রিম উপগ্রহ কোপারনিকাস -এর মাধ্যমে নিরূপণ করা হয়েছে) -এর বেশি হবে। তাহলে পারমাণবিক কণিকার ঘনত্ব (সংখ্যা) প্রতি মিলিয়ন লিটারে ৫০০ এর চেয়ে অবশ্যই কম হবে। এটি এই সিদ্ধান্তকে আরো সুদৃঢ় করে যে, আমরা এমন একটি উন্মুক্ত এবং প্রসারমাণ বিশ্বে বসবাস করছি, যা অনন্তকাল ধরে প্রসারিত হতে থাকবে।

আমি অবশ্যই বলবো যে, আমি ব্যক্তিগতভাবে এই ধরনের যুক্তিতর্ককে বড় বিশ্বাসযোগ্য নয় বলে মনে করি। ডিউটেরিয়াম হিলিয়ামের মত নয়- যদিও একটি তুলনামূলক ঘন আবদ্ধ মহাবিশ্বে যে পরিমাণ ডিউটেরিয়াম থাকা প্রয়োজন তার চেয়ে কিছুটা বেশি পরিমাণ ডিউটেরিয়াম রয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়, তবু প্রকৃত অর্থে এখন পর্যন্ত মহাবিশ্বে ডিউটেরিয়াম খুবই বিরল। আমরা ভাবতে পারি যে, এই পরিমাণ ডিউটেরিয়াম সাম্প্রতিক নভোপদার্থ বিষয়ক (Astrophysical) প্রক্রিয়ায় যেমন সুপারনোভা, নভোরশ্মি (Cosmic Ray) এমন কি সম্ভবত আধানাক্ষত্রিক বস্তুর (Quasi Stellar Objects) মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে। হিলিয়ামের ক্ষেত্রে এমনটি ঘটে না। বিপুল পরিমাণ বিকিরণ শুরু করা ব্যতিরেকে ২০%-৩০% হিলিয়াম সাম্প্রতিক কালে সৃষ্টি হতে পারে না। যদি তা ঘটতো তবে আমরা তা দেখতে পারতাম। যুক্তি হিসেবে বলা হয় যে, গ্রহণযোগ্য পরিমাণের চেয়ে অধিক পরিমাণ লিথিয়াম , বেরিলিয়াম ও বোরন সৃষ্টি ব্যতিরেকে কোন প্রচলিত নভোপদার্থ বিষয়ক (Conventional Astrophysical) প্রক্রিয়ায় ২০ পিপিএম ডিউটেরিয়াম (কোপারনিকাস উপগ্রহ কর্তৃক ডিউটেরিয়াম এর যে পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়েছে) সৃষ্টি হতে পারে না। উল্লেখ্য লিথিয়াম, বেরিলিয়াম এবং বোরন এই তিনটি মৌলই হালকা এবং বিরল। আমি বুঝি না আমরা কিভাবে চিরদিনের জন্য নিশ্চিত হই যে, এই সামান্য পরিমাণ ডিউটেরিয়াম মহাবিশ্ব সৃষ্টি প্রক্রিয়ার বাইরে অন্য কোন প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি হয় নি। অন্য কোন প্রক্রিয়ার কথা এখনও কেউ ভাবে নি।

আদি মহাবিশ্বের অপর একটি যৎসামান্য অবশেষ আমাদের চতুর্দিকে রয়েছে এবং এখন পর্যন্ত মনে হচ্ছে এর দেখা পাওয়া অসম্ভব। তৃতীয় দৃশ্যে আমরা দেখেছিলাম যে মহাবিশ্বের তাপমাত্রা প্রায় এক হাজার কোটি ডিগ্রীর নিচে নেমে যাবার পর নিউট্রিনোগুলো মুক্ত কণিকার (Free Particles) মত আচরণ করেছিল। এই সময়ে মহাবিশ্বের আকারের সাথে আনুপাতিক হারে নিউট্রিনোগুলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য শুধু বৃদ্ধি পেয়েছে। নিউট্রিনোর সংখ্যা ও শক্তির বিভাজন তাপীয় ভারসাম্যাবস্থায় যেমন থাকার কথা তেমনই ছিল। কিন্তু নিউট্রিনোর তাপমাত্রা মহাবিশ্বের আকারের বিপরীত অনুপাতে কমছিল। এই সময়ে ফোটনের ক্ষেত্রেও প্রায় এমনটিই ঘটেছিল, যদিও ফোটনসমূহ নিউট্রিনোর তুলনায় দীর্ঘ সময় তাপীয় ভারসাম্যতা বজায় রাখছিল।

অতএব, বর্তমানে নিউট্রিনোর তাপমাত্রা মোটামুটিভাবে (Roughly) এখনকার ফোটনের তাপমাত্রার সমান। অতএব বলা যায়, বর্তমান মহাবিশ্বে প্রতিটি পারমাণবিক কণিকার জন্য ১০০০ মিলিয়নের কাছাকাছি নিউট্রিনো এবং এন্টিনিউট্রিনো কণিকা রয়েছে।

এই বিষয়ে আরো অনেকটা সুনির্দিষ্ট হওয়া সম্ভব। কিছুক্ষণ পর মহাবিশ্ব নিউট্রিনোসমূহের মধ্যে স্বচ্ছ হলো ; ইলেকট্রন ও পজিট্রনসমূহ বিনাশ প্রাপ্ত হলো। এই বিনাশের মাধ্যমে সৃষ্ট শক্তিতে ফোটনসমূহ উত্তপ্ত হলো, কিন্তু নিউট্রিনোসমূহ উত্তপ্ত হলো না। এর পরিণতিতে নিউট্রিনোর বর্তমান তাপমাত্রা ফোটনের বর্তমান তাপমাত্রার চেয়ে কিছুটা কম হওয়া উচিত। নিউট্রিনোর তাপমাত্রা যে ফোটনের তাপমাত্রার ৭১.৩৮% হবে, এটা সহজেই হিসাব করে বের করা যায়। তা হলে, মহাবিশ্বে ফোটনসমূহ যে শক্তি যোগায় তার ৪৫.৪২% যোগায় নিউট্রিনো এবং এন্টিনিউট্রিনোসমূহ। যদিও ইতিপূর্বে যখন আমি মহাবিশ্ব কতগুণ প্রসারিত হয়েছে তা উল্লেখ করেছি, তখন এই বিষয়ে বিস্তারিত বলি নি। কিন্তু আমি নিউট্রিনোর এই অতিরিক্ত শক্তি ঘনত্বকে বিবেচনায় রেখেছি।

আদি মহাবিশ্ব সৃষ্টির এই স্ট্যান্ডার্ড মডেলের পক্ষে সবচেয়ে নাটকীয় ও নিশ্চিত প্রমাণ হবে যদি এই নিউট্রিনো পটভূমি বিকিরণ (Neutrino-Background) আবিষ্কার করা যায়। এর তাপমাত্রার বিষয়ে আমাদের সুনিশ্চিত ভবিষদ্বাণী রয়েছে। এটা হবে ফোটনের তাপমাত্রার ৭১.৭৮% বা ২°K। একমাত্র প্রকৃত তত্ত্বগত অনিশ্চয়তা থাকছে নিউট্রিনোসমূহের সংখ্যা ও শক্তির বিভাজনে। সেখানে প্রশ্ন হলো, আমাদের ধারণামত লেপটন সংখ্যার ঘনত্ব কম কিনা (স্মর্তব্যঃ লেপটন সংখ্যা হলো নিউট্রিনো এবং অন্যান্য লেপটনের যোগফল থেকে এন্টিনিউট্রিনো এবং অন্যান্য এন্টিলেপটনের যোগফল বিয়োগ দিলে যে সংখ্যা থাকে সেই সংখ্যা)। যদি লেপটন সংখ্যার ঘনত্ব ব্যারিয়ন সংখ্যার ঘনত্বের মতই কম হয়,তাহলে নিউট্রিনো এবং এন্টিনিউট্রিনোগুলোর সংখ্যা পরস্পরের সমান হওয়া উচিত। অপর পক্ষে লেপটন সংখ্যার ঘনত্বকে যদি ফোটন সংখ্যার ঘনত্বের সাথে তুলনা করা হয়, তখন সেখানে কণিকার ডিজেনারেসির (Degeneracy) ঘটনা ঘটে থাকবে এবং নিউট্রিনোর সংখ্যা এন্টিনিউট্রিনোর সংখ্যার তুলনায় কিছুটা বেশি (Appreciable Excess) হবে (বা এন্টিনিউট্রিনোর সংখ্যা নিউট্রিনের চাইতে বেশি)। এই ডিজেনারেসি প্রথম তিন মিনিটের নিউট্রন-প্রোটন ভারসাম্যের স্থান পরিবর্তনকে প্রভাবিত করবে এবং তা মহাজাগতিকভাবে সৃষ্ট হিলিয়াম এবং ডিউটেরিয়াম -এর পরিমাণেও পরিবর্তন আনবে। মহাবিশ্বে লেপটন সংখ্যা বেশি রয়েছে কিনা, সেই প্রশ্নটি দ্রুতই নিষ্পত্তি করা যেতো যদি নিউট্রিনো এবং এন্টিনিউট্রিনোর পটভূমি তাপমাত্রা ২°K পর্যবেক্ষণ করা যেতো। কিন্তু এর চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হলো: নিউট্রিনো এবং এন্টিনিউট্রিনোর ২°K পটভূমি তাপমাত্রা প্রমাণ করতো যে, আদি মহাবিশ্বের স্ট্যান্ডার্ড মডেল যথার্থই সত্য।

নিউট্রিনোসমূহ সাধারণ পদার্থের সাথে (পদার্থ কণিকার) এত দুর্বলভাবে মিথস্ক্রিয়া করে যে, নিউট্রিনোর পটভূমি তাপমাত্রা ২°K পর্যবেক্ষণ করার জন্য কেউ কোন পদ্ধতি বা কৌশল বের করতে সক্ষম হন নি। এটা সত্যিই নাগালের বাইরে থেকে

উত্যক্ত করার মত একটি সমস্যা। প্রতিটি পারমাণবিক কণিকার জন্য কয়েক (Some) ১০০০ মিলিয়ন নিউট্রিনো এবং এন্টিনিউট্রিনো কণিকা রয়েছে এবং এখনও কেউ জানে না, কিভাবে তাদেরকে খুঁজে বের (Detect) করতে হবে। সম্ভবত কেউ কোনো দিন পারবে।

প্রথম তিন মিনিটের হিসাবের এই বিবরণী পড়ে পাঠক হয়তো ভাবতে পারেন যে, তিনি এর মধ্যে একটি বৈজ্ঞানিক অতিবিশ্বাস (Scientific Over Confidence) খুঁজে পাচ্ছেন। হয়তো তিনি সঠিক। তবে আমি বিশ্বাস করি না যে, সর্বতোভাবে একটি খোলা মন রাখলেই সব সময় সবচেয়ে বেশি বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি অর্জন সম্ভব হয়। একজনের সন্দেহের বিষয়টি প্রায়ই ভুলে যাওয়া প্রয়োজন এবং কারো অনুমানসমূহ (Assumptions) যেখানেই নিয়ে যাক না কেন তার পরিণতিটা কি, তা লক্ষ্য করা উচিত। গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাটি হলো, তত্ত্বগত সংস্কার (Theoritical Prejudices) থেকে মুক্ত না হওয়া; কিন্তু সঠিক তত্ত্বগত সংস্কারগুলো গ্রহণ করা। সব সময়েই যে কোন তত্ত্বগত পূর্বকল্পনা (Theoritical Preconception) কোথায় নিয়ে যাচ্ছে- তা দিয়েই এটাকে যাচাই করতে হয়। আদি মহাবিশ্বের ' স্ট্যান্ডার্ড মডেল' কিছু সাফল্য অর্জন করেছে এবং এটি ভবিষ্যত গবেষণা কর্মসূচীর জন্য একটি সুসঙ্গত তত্ত্বগত কাঠামো প্রদান করে। এটা বুঝায় না যে এটি সত্য ; কিন্তু এটা বুঝায় যে, একে গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করতে হবে।

তা সত্ত্বেও স্ট্যান্ডার্ড মডেলের উপর একটি বড় অনিশ্চয়তা কালো মেঘের মত ঝুলে রয়েছে। এই অধ্যায়ে বর্ণনাকৃত সকল গণনার ভিত্তি হলো 'মহাজাগতিক তত্ত্বের সূত্র' (Cosmological Principle)। এই সূত্রে এই অনুমান (Assumption) রয়েছে যে, মহাবিশ্ব সমসত্ত্ব (Homogenous) এবং দিক-নিরপেক্ষ (Isotropic)। (সমসত্ত্ব বলতে আমরা বুঝি যে মহাবিশ্ব প্রসারণের সাথে সাথে একজন পর্যবেক্ষককে মহাবিশ্বের যে কোন স্থানেই নিয়ে যাওয়া হোক না কেন, পর্যবেক্ষক সকল অবস্থান থেকেই মহাবিশ্বকে একই রকম দেখতে পাবেন। দিক-নিরপেক্ষ মানে এই যে, অনুরূপ একজন পর্যবেক্ষক মহাবিশ্বের যে দিকেই তাকান একই রকম দেখতে পাবেন।) আমরা সরাসরি পর্যবেক্ষণ থেকে জানতে পারি যে, মহাজাগতিক মাইক্রোওয়েভ বিকিরণ খুবই দিক-নিরপেক্ষ এবং তা থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, যখন থেকে বিকিরণ এবং বস্তু (Matter) ভারসাম্যতা হারালো , তখন থেকেই এই মহাবিশ্ব উচ্চমাত্রায় সমসত্ত্ব ও দিক-নিরপেক্ষ হয়েছে। এটা ঘটলো প্রায় ৩০০০° তাপমাত্রায়। যা হোক, আমাদের কাছে কোন সাক্ষ্য নেই যে, 'মহাজাগতিক তত্ত্বের সূত্র ' আদি মহাবিশ্বে বলবৎ বা কার্যকর ছিল কি না।

এটা সম্ভব যে, মহাবিশ্ব প্রথম দিকে উচ্চমাত্রায় অসমসত্ত্ব (Inhomogenious) এবং দিক নির্ভর (Anisotropic) ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে প্রসারমাণ মহাবিশ্বের বিভিন্ন অংশ একে অপরের সঙ্গে সংঘর্ষের কারণে সৃষ্ট বলের মাধ্যমে এটি মসৃণ হয়েছে। ম্যারিল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের চার্লস মাইজনার (Charles Misner) এই ধরনের একটি মিক্সমাষ্টার (Mixmaster) মডেলের পক্ষে ওকালতি করেছেন। এমন কি এটাও সম্ভব যে, ঘর্ষণ জনিত সমসত্ত্ব ও দিক নিরপেক্ষকরণ -এর কারণে যে তাপ উৎপন্ন হয়, সে জন্যেই বর্তমান মহাবিশ্বে বিপুল সংখ্যক, যেমন প্রতি ১০০০ মিলিয়ন

ফোটনের বিপরীতে একটি করে পারমাণবিক কণিকা রয়েছে। যা হোক আমার জানা মতে কেউ বলতে পারে না, কেন আদি মহাবিশ্বে কিছুটা বেশি পরিমাণ অসমসত্ত্বতা বা দিক-নির্ভরতা থাকবে এবং কেউ জানে না কিভাবে এই তাপকে হিসাব করতে হয় যা মসৃণীকরণের কারণে সৃষ্টি হয়েছে।

আমার বিবেচনায় এই সকল অনিশ্চয়তার যথার্থ জবাব এই নয় যে, স্ট্যান্ডার্ড মডেলকে বর্জন করতে হবে। (যেহেতু কিছু সৃষ্টিতত্ত্ববিদ হয়তো এমনটিই পছন্দ করবেন।) এটাকে বরং খুব গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করতে হবে এবং এর সমস্যাগুলো পূর্ণাঙ্গভাবে সমাধানের প্রচেষ্টা চালাতে হবে এই প্রত্যাশায় যে, তত্ত্বগুলোর পরস্পর বিরোধিতা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে দূরীভূত হবে। আদি মহাবিশ্বে বড় রকমের অসমসত্ত্বতা এবং দিক-নির্ভরতা বিদ্যমান থাকলেও তা এই অধ্যায়ে উপস্থাপিত দৃশ্যের বর্ণনায় যথেষ্ট প্রভাব রাখবে কিনা - তাও কিন্তু পরিষ্কার নয়। এমন হতে পারে যে, মহাবিশ্ব প্রথম কয়েক সেকেন্ডে মসৃণ হয়েছে। এমন কি হিলিয়াম সংশ্লেষণ যুগের (Era of Helium Synthethis) পরেও যদি মহাবিশ্বে দিক-নির্ভরতা এবং অসমসত্ত্বতা বিদ্যমান থাকে, তাহলেও সুসমভাবে প্রসারমাণ বস্তুপিন্ডতে সৃষ্ট হিলিয়াম এবং ডিউটেরিয়ামের পরিমাণ শুধু নির্ভর করবে ঐ বস্তুপিন্ডের অন্তর্গত প্রসারণের হারের উপর এবং তা অবশ্যই স্ট্যান্ডার্ড মডেলে হিলিয়াম ও ডিউটেরিয়ামের যে-পরিমাণ হিসাব করা হয়েছে, তা থেকে খুব পৃথক হবে না। এটা এমনও হতে পারে যে, পারমাণবিক সংশ্লেষণ যুগের মহাবিশ্ব সীমিত পরিসরে সমসত্ত্ব এবং দিক-নিরপেক্ষ হলেও , বৃহত্তর পরিসরে এটা ছিল একটি অসমসত্ত্ব এবং দিক-নির্ভর মহাবিশ্ব।

যখন আমরা দূর অতীতের ও একেবারে আদিলগ্নের বা ভবিষ্যতের চূড়ান্ত ও অন্তিম মুহূর্তের মহাবিশ্বের দিকে তাকাই তখন 'মহাজাগতিক তত্ত্বের সূত্র'-এর অনিশ্চয়তা সত্যিই খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়। যা হোক এটা অবশ্যই সর্বদা স্বীকার করতে হবে যে, আমাদের সরল সৃষ্টিতত্ত্ব মডেল মহাবিশ্বের ক্ষুদ্র অংশের বা এর ইতিহাসের সীমিত অংশকেই বর্ণনা করতে পারে।

একটি ঐতিহাসিক বাঁক
A Historical Diversion

চলুন আমরা আদি মহাবিশ্বের ইতিহাস থেকে আমাদের দৃষ্টিকে ক্ষণিকের জন্য অন্যদিকে ফিরিয়ে নিই এবং বিগত তিন দশকে মহাবিশ্ব সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে যে গবেষণা হয়েছে তার ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করি। আমি এখানে একটি ঐতিহাসিক সমস্যাকে বিশেষভাবে আকঁড়ে (grapple) ধরতে চাই। এই সমস্যাটি আমার নিকট একই সঙ্গে হতবুদ্ধিকর ও চিত্তাকর্ষক। বিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে বেশি বৈজ্ঞানিক গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারসমূহের একটি হলো ১৯৬৫ সালে মহাজাগতিক পটভূমি বিকিরণের সন্ধান লাভের ঘটনা। এই আবিষ্কারটি কেন একটি দুর্ঘটনার মাধ্যমে হলো? বা অন্যভাবে বলা যায় ১৯৬৫ সালের আগে এই বিকিরণের জন্য কোন সুশৃংখল অনুসন্ধান চালানো হয় নি কেন ?

গত অধ্যায়ে আমরা দেখেছি যে বর্তমানে পরিমাপকৃত মহাবিশ্বের পটভূমি বিকিরণ তাপমাত্রা ও ভর ঘনত্বের (Mass Density) সাহায্যে আমরা মহাজাগতিক হালকা কণিকার পরিমাণ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারি। আর এই ভবিষ্যদ্বাণীর সাথে পর্যবেক্ষণকৃত ফলাফল বেশ ভালভাবে মিলে যাচ্ছে বলেই প্রতীয়মান হয়। ১৯৬৫ সালের অনেক আগেই সময়ের পিছনের দিকে এই হিসাব পরিচালনা করে মহাজাগতিক মাইক্রোওয়েভ পটভূমি বিকিরণ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা এবং এই বিকিরণের অনুসন্ধান শুরু করা সম্ভব ছিল। বর্তমান মহাবিশ্বে শতকরা প্রায় ২০-৩০ ভাগ হিলিয়াম এবং ৭০-৮০ ভাগ হাইড্রোজেন পর্যবেক্ষণ করা হয়। এই পর্যবেক্ষণ থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব ছিল যে পারমাণবিক কণিকার মধ্যে নিউট্রনের অংশ বা পরিমাণ যখন ১০-১৫ শতাংশে নেমে এসেছিল তখনই পারমাণবিক সংশ্লেষণ শুরু হয়েছিল। (স্মর্তব্য ঃ পারমাণবিক সংশ্লেষণ যুগের তুলনায় বর্তমান মহাবিশ্বে হিলিয়ামের পরিমাণ দ্বিগুণ।) মহাবিশ্বের তাপমাত্রা যখন প্রায় ১০০ কোটি ডিগ্রী কেলভিনে নেমে আসে, তখনই নিউট্রনের পরিমাণ এই মানে (১০-১৫%) পৌঁছে। পারমাণবিক সংশ্লেষণ যে ওই মুহূর্তে (মহাবিশ্বের তাপমাত্রা যখন ১০০০ কেলভিন) শুরু হয়েছিল এ তথ্য ব্যবহার করে আমরা ঐ তাপমাত্রার (মহাবিশ্বে) পারমাণবিক কণিকার ঘনত্ব কি ছিল তা মোটামুটি হিসাব করতে পারি। ঐ তাপমাত্রায় কৃষ্ণকায়া বিকিরণ থেকে ফোটনের ঘনত্ব বের করা যায়। তাহলে ঐ সময়ে বিদ্যমান ফোটন এবং পারমাণবিক কণিকাসমূহের অনুপাতও জানা যায়। যেহেতু এই অনুপাতের কোন পরিবর্তন ঘটে না তাই বর্তমান সময়ে ফোটন এবং পারমাণবিক কণিকার অণুপাত কি তাও বলা সম্ভব। বর্তমানে পারমাণবিক কণিকার

যে ঘনত্ব পর্যবেক্ষণ করা হয়, তা থেকে বর্তমান ফোটন কণিকার ঘনত্ব সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব ছিল। এ ছাড়া এই সিদ্ধান্তে পৌঁছা সম্ভব ছিল যে বর্তমান মহাবিশ্বে ১°K থেকে ১০° K তাপমাত্রার একটি মহাজাগতিক মাইক্রোওয়েভ পটভূমি বিকিরণ বিদ্যমান রয়েছে। মহাবিশ্বের ইতিহাসের মতো বিজ্ঞানের ইতিহাসও যদি এতো সহজ এবং প্রত্যক্ষ (Direct) হতো তা হলে চল্লিশ বা পঞ্চাশের দশকে কেউ হয়তো এসব উপাত্তের ভিত্তিতে পটভূমি বিকিরণের অস্তিত্ব সম্পর্কে এমন ভবিষ্যদ্বাণী করতেন, যার ফলে বেতার জ্যোতির্বিদগণ তা (পটভূমি বিকিরণ) অনুসন্ধান করতে উৎসাহিত হতেন। কিন্তু বাস্তবে যে ঘটনা ঘটলো তা ওই রকম কিছু ছিল না।

বস্তুতপক্ষে ১৯৪৮ সালে উল্লেখিত উপাত্তের ভিত্তিতে পটভূমি বিকিরণ সম্পর্কে একটি ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল। কিন্তু তা তখন বা পরে বিকিরণ অনুসন্ধানে কোন অগ্রণী ভূমিকা রাখে নি। চল্লিশের দশকের শেষের দিকে জর্জ গ্যামো এবং তার সহকর্মী র‍্যালফ এ. আলফার এবং রবার্ট হেরম্যান 'মহাবিস্ফোরণের' ভিত্তিতে মহাজাগতিক সৃষ্টিতত্ত্বের সম্ভাব্যতা পরীক্ষা করে দেখছিলেন। তারা অনুমান করছিলেন যে, মহাবিশ্বের যাত্রা শুরু হয়েছিল খাটি নিউট্রন নিয়ে এবং তারপর নিউট্রনসমূহ সুপরিচিত তেজস্ক্রিয় ভাঙ্গন প্রক্রিয়ায় প্রোটনে রূপান্তরিত হয়েছিল। তেজস্ক্রিয় ভাঙ্গন প্রক্রিয়ায় একটি নিউট্রন স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভেঙ্গে একটি প্রোটন, একটি ইলেকট্রন ও একটি এন্টি নিউট্রিনোয় রূপান্তরিত হয়। প্রসারণের কোন এক পর্যায়ে মহাবিশ্ব পর্যাপ্ত শীতল হয়ে দ্রুত নিউট্রন গ্রাস প্রক্রিয়ায় নিউট্রন ও প্রোটন একত্রিত হয়ে ভারী কণিকাসমূহ গঠন করে। আলফার এবং হেরম্যান দেখালেন যে, হালকা কণিকার (পারমাণবিক কণিকার) পর্যবেক্ষণকৃত বর্তমান পরিমাণের হিসাব মিলতে হলে, প্রতিটি পারমাণবিক কণিকার বিপরীতে ফোটন সংখ্যা ধরতে হয় ১০০ কোটি। পারমাণবিক কণিকার বর্তমান মহাজাগতিক ঘনত্বের (Cosmic Density) হিসাব ব্যবহার করে তারা এই ভবিষ্যদ্বাণী করতে সক্ষম হন যে আদি মহাবিশ্বের অবশেষ হিসেবে বর্তমান মহাবিশ্বের পটভূমি বিকিরণের অস্তিত্ব বিদ্যমান রয়েছে এবং এই বিকিরণের বর্তমান তাপমাত্রা হলো ৫° K।

আলফার, হেরম্যান এবং গ্যামোর আদি গণনাসমূহ সকল খুটিনাটিসহ নির্ভুল ছিল না। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা লক্ষ্য করেছি যে মহাবিশ্ব সম্ভবত সম সংখ্যক নিউটন ও প্রোটন নিয়ে যাত্রা শুরু করেছিল; শুধু নিউট্রন নিয়ে যাত্রা শুরু করে নি। নিউট্রনসমূহের তেজস্ক্রিয় ভাঙনের কারণে নয়, বরং ইলেকট্রন, পজিট্রন, নিউট্রিনো এবং এন্টি নিউট্রিনোর সঙ্গে নিউট্রনসমূহের সংঘর্ষের কারণেই নিউট্রনসমূহ প্রোটনে পরিবর্তিত হচ্ছিল। [আবার প্রোটনসমূহের সঙ্গে ইলেকট্রন, পজিট্রন, নিউট্রিনো এবং এন্টি নিউট্রিনো এর সঙ্গে প্রোটনসমূহের সংঘর্ষের কারণেই তারা (প্রোটনসমূহ) নিউট্রনে পরিবর্তিত হচ্ছিল।] সি. হায়াশী (C.Hayashi) ১৯৫০ সালের আগে এই বিষয়গুলো উল্লেখ করেছিলেন এবং ১৯৫৩ সালের আগেই আলফার এবং হেরম্যান (জে.ডব্লিউ. ফলিনসহ) তাঁদের মডেল সংশোধন ও পুনর্বিন্যাস করেন এবং নিউট্রন-প্রোটন সংখ্যার ভারসাম্যতায় যে স্থান পরিবর্তন ঘটে তা যথেষ্ট নির্ভুলভাবে হিসাব করেন। বস্তুত এটাই ছিল মহাবিশ্বের আদি ইতিহাসের সর্বপ্রথম ও বিস্তারিত আধুনিক ব্যাখ্যা।

তবু ১৯৪৮ অথবা ১৯৫৩ সালের আগে কেউ পূর্বাভাষকৃত পটভূমি বিকিরণের সন্ধান শুরু করে নি। বস্তুতপক্ষে ১৯৬৫ সালের আগে নভোপদার্থবিদগণের নিকট সাধারণভাবে এই তথ্য জানা ছিল না যে মহাবিস্ফোরণ তত্ত্ব মডেলে হাইড্রোজেন ও হিলিয়ামের পরিমাণের সঙ্গে বর্তমান মহাবিশ্বে একটি মহাজাগতিক পটভূমি বিকিরণের অস্তিত্ব (বিদ্যমান) থাকা প্রয়োজন এবং এই পটভূমি বিকিরণ বাস্তবে দৃষ্টিগোচর হওয়া বাঞ্ছনীয়। এখানে বিস্ময়কর বিষয়টি এই নয় যে নভোপদার্থবিদগণ সাধারণভাবে আলফার ও হেরম্যানের পটভূমি বিকিরণ সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণী জানতেন না। কেননা বিজ্ঞান সাহিত্যের মহাসমুদ্রে একটি বা দুটো বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ সব সময়েই দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারে। যে বিষয়টি অনেক বেশি বিহ্বলকর তা হলো এক যুগ সময়ে কেউই একই ধরনের যুক্তিতর্কের মাধ্যমে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার অব্যাহত প্রচেষ্টা চালান নি। তত্ত্বগত সকল উপাদানই বিদ্যমান ছিল। ১৯৬৪ সালে রাশিয়াতে ইয়া. বি. জেলডোভিচ (Ya.B.Zeldovich), ইংল্যান্ডে হয়েল (Hoyle) ও আর. জে. টেলর (R.J.Talor) যুক্তরাষ্ট্রে নিরলসভাবে মহাবিস্ফোরণ মডেলে পারমাণবিক সংশ্লেষণের হিসাব শুরু করেন। প্রত্যেকেই স্বতন্ত্রভাবে কাজ করছিলেন। যাহোক এই সময়ের মধ্যে পেনজিয়াস এবং উইলসন হলমডেলে (Holmodel) পটভূমি বিকিরণ পর্যবেক্ষণ শুরু করেন এবং কোন মহাবিশ্ব সৃষ্টিতাত্ত্বিকের উস্কানি ব্যতিরেকেই মাইক্রোওয়েভ পটভূমি বিকিরণের আবিষ্কার ঘটলো।

এটাও বিস্ময়কর যে আলফার হেরম্যান-এর ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে যারা জানতেন তারাও একে যথেষ্ঠ গুরুত্ব দেননি। ১৯৫৩ সালে আলফার কলিন (Alpher Collin) এবং হেরম্যান (Herman) তাদের ১৯৫৩ সালের প্রবন্ধে পারমাণবিক সংশ্লেষণের সমস্যাটি ভবিষ্যত পরীক্ষার জন্য রেখে দেন। তাদের সংশোধিত উন্নততর মডেলের ভিত্তিতে মাইক্রোওয়েভ পটভূমি বিকিরণের প্রত্যাশিত তাপমাত্রা তারা আবার হিসাব করতে সক্ষম হন নি। (এমন কি তাঁরা তাদের পূর্বোক্ত এই ভবিষ্যদ্বাণী অর্থাৎ ৫°K তাপমাত্রার একটি পটভূমি বিকিরণ যে প্রত্যাশা করা যায়, তাঁরা তা উল্লেখও করলেন না। আমেরিকান ফিজিক্যাল সোসাইটির ১৯৫৩ সালের সভায় পারমাণবিক সংশ্লেষণের হিসাবের উপর তাঁরা কিছু প্রতিবেদন (Report) পেশ করেন। কিন্তু তাঁরা তিনজন বিভিন্ন পরীক্ষাগারে পরীক্ষা করছিলেন এবং তাঁদের কাজের ফলাফল চূড়ান্ত প্রবন্ধরূপে লিপিবদ্ধ করা হয় নি।) মাইক্রোওয়েভ পটভূমি বিকিরণ আবিষ্কারের কয়েক বছর পর গ্যামো পেনজিয়াসকে লেখা এক পত্রে উল্লেখ করেন যে, ১৯৫৩ সালে 'প্রসিডিংস অব দি রয়াল ডেনিস একাডেমী'-তে প্রকাশিত এক প্রবন্ধে তিনি ৭° K তাপমাত্রার পটভূমি বিকিরণের ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। এটা ছিল মোটামুটি সঠিক মাত্রার। যাহোক ১৯৫৩ সালের এই প্রবন্ধটি পড়লে বুঝা যায় যে এটা ছিল গাণিতিকভাবে বিভ্রান্তিকর যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং মহাবিশ্বের বয়সের সাথে সংশ্লিষ্ট। এই ভবিষ্যদ্বাণী তাঁর (মহাবিশ্বের) নিজস্ব মহাজাগতিক পারমাণবিক সংশ্লেষণের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না।

এভাবেও যুক্তি উপস্থাপন করা যেতে পারে ঃ পঞ্চাশের দশকে এবং ষাটের দশকের প্রথম দিকে মহাবিশ্বে হালকা কণিকার পরিমাণ সম্পর্কে ভালভাবে জানা ছিল না, যাতে পটভূমি বিকিরণ তাপমাত্রা সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে পৌছা যায়। এটা সত্য

যে মহাবিশ্বে হিলিয়ামের পরিমাণ ২০%-৩০% এর মধ্যে। যদিও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো ১৯৬০ সালের অনেক আগে থেকে এমনটি বিশ্বাস করা হতো যে মহাবিশ্বের ভরের অধিকাংশই রয়েছে হাইড্রোজেন রূপে। (উদাহরণসরূপ বলা যায়, ১৯৫৬ সালের হ্যানস সুয়েজ এবং হ্যারল্ড উরে কর্তৃক পরিচালিত এক জরিপের মাধ্যমে জানা যায় যে, ভর হিসেবে মহাবিশ্বে ৭৫% হাইড্রোজেন রয়েছে)। নক্ষত্রের মধ্যে হাইড্রোজেন তৈরি হয় না, হাইড্রোজেন হলো আদি জ্বালানী (Primitive Fuel)। নক্ষত্রগুলো হাইড্রোজেন থেকে শক্তি আহরণ করে ভারী মৌলসমূহ গঠন করে। এই তথ্য আমাদেরকে ভালভাবে একথাই জানায় যে, সমস্ত হাইড্রোজেন পুড়ে যাতে হিলিয়াম ও ভারী মৌলে পরিণত হতে না পারে, তার জন্য আদি মহাবিশ্বে প্রতিটি পারমাণবিক কণিকার বিপরীতে বিপুল সংখ্যক ফোটন ছিল।

কেউ হয়তো প্রশ্ন করতে পারেন ৩° K তাপমাত্রার দিক-নিরপেক্ষ পটভূমি বিকিরণ পর্যবেক্ষণ করা প্রযুক্তিগত দিক থেকে বাস্তবে কখন সম্ভব হয়েছিল? এই প্রশ্নের যথাযথ জবাব দেওয়া কঠিন। কিন্তু পরীক্ষাভিত্তিক গবেষণাকারী আমার সহকর্মীগণ আমাকে বলেছেন যে ১৯৬৫ সালের অনেক আগেই এই পর্যবেক্ষণ চালানো যেতো। সম্ভবত পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি, এমনকি চল্লিশের দশকের মাঝামাঝি হয়তো এই পর্যবেক্ষণ সম্ভব ছিল। ১৯৪৬ সালে এম আই টি বিকিরণ গবেষণাগারে রবার্ট ডিকের (Robert Dicke) নেতৃত্বে একটি দল পৃথিবী বর্হিভূত দিক-নিরপেক্ষ পটভূমি বিকিরণের একটি উচ্চসীমা নির্ধারণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ১.০০, ১.২৫ এবং ১.৫০ সেমি তরঙ্গদৈর্ঘ্যে সমতুল্য তাপমাত্রা ছিল ২০° K-এর চেয়ে কম। এই পরিমাপ ছিল বায়ুমন্ডলীয় শোষণ পর্যবেক্ষণের উপজাত এবং নিশ্চিতভাবেই এটা মহাজগতের সৃষ্টিতাত্ত্বিক কোন পর্যবেক্ষণ কর্মসূচীর অংশ ছিল না। (বস্তত ডিক আমাকে জানান যে সম্ভাব্য মহাজাগতিক পটভূমি বিকিরণ সম্পর্কে যখন তিনি বিস্মিত হতে শুরু করেন তখন তিনি প্রায় দুই দশক আগের তারই পরিমাপকৃত পটভূমি বিকিরণের তাপমাত্রার উচ্চসীমা ২০° K সম্পর্কে ভুলে গিয়েছিলেন!)

৩°K তাপমাত্রার দিক-নিরপেক্ষ মাইক্রোওয়েভ পটভূমি বিকিরণ সুনির্দিষ্টভাবে কোন মুহূর্তে শনাক্ত করা সম্ভব হয়েছিল তা নির্ধারণ করা ঐতিহাসিক দিক থেকে খুব গুরুত্বপূর্ণ বলে আমার মনে হয় না। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হলো বেতার জ্যোতির্বিদগণ জানতেন না তাদের কি বিষয়ে চেষ্টা করা উচিৎ। এর বিপরীতে নিউট্রিনো আবিষ্কারের ইতিহাস বিবেচনা করা যাক। ১৯৩২ সালে পাউলি যখন নিউট্রিনোর অস্তিত্ব সম্পর্কে প্রথম প্রস্তাব করেন তখন এটা নিশ্চিত ছিল যে ঐ সময়ে কোন পরীক্ষার মাধ্যমে নিউট্রিনোকে পর্যবেক্ষণ করার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা নেই। যাহোক নিউট্রিনো শনাক্তকরণ পদার্থবিদদের কাছে একটি চ্যালেঞ্জযুক্ত ব্যাপার হিসেবেই রয়ে গেল। পঞ্চাশের দশকে যখন এই ধরনের পরীক্ষা চালানোর উপযোগী পারমাণবিক চুল্লী তৈরি করা সম্ভব হলো তখন পারমাণবিক চুল্লীতে নিউট্রিনোকে দেখতে পাওয়া ও শনাক্ত করা গেল। এন্টিপ্রোটন আবিষ্কারের ইতিহাস একেবারে অন্যরকম। ১৯৩২ সালে মহাজাগতিক রশ্মিতে যখন পজিট্রন আবিষ্কৃত হলো তখন তাত্ত্বিকগণ সাধারণভাবে আশা করেছিলেন যে ইলেকট্রনের মতো প্রোটনেরও একটি প্রতিকণিকা থাকা উচিত। ত্রিশের দশকে পারমাণবিক গবেষণাগারে যে সব যন্ত্র বা চুল্লী ব্যবহৃত হতো তাতে এন্টি প্রোটন তৈরি হওয়ার কোন সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু পদার্থবিদরা

সমস্যাটি সম্পর্কে সজাগ রইলেন। পঞ্চাশের দশকে (বার্কলের বেভাট্রন ল্যাবরেটরীতে) এন্টি প্রোটন তৈরির জন্য পর্যাপ্ত শক্তি সম্পন্ন বিশেষভাবে একটি কণিকাত্বরক নির্মাণ করা হলো। ডিক এবং তার সহযোগীবৃন্দ ১৯৬৪ সালে মহাজাগতিক পটভূমি বিকিরণ শনাক্তকরণ শুরু করার আগে পটভূমি বিকিরণের ক্ষেত্রে তেমন কিছু ঘটে নি। তা সত্ত্বেও প্রিন্সটন গ্রুপ গ্যামো, আলফার এবং হেরম্যান এক দশকের বেশি সময় পূর্বের গবেষণা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না।

তখন তাহলে কি ভুল হয়েছিল? ৩° K তাপমাত্রার মাইক্রোওয়েভ পটভূমি বিকিরণ সন্ধানের বিষয়টি পঞ্চাশের দশকে এবং ষাটের দশকের প্রথম দিকে সাধারণভাবে কেন গুরুত্বলাভ করে নি- সেই বিষয়ে কমপক্ষে তিনটি আকর্ষণীয় যুক্তি এখানে উপস্থাপন করা সম্ভব।

প্রথমত এটা অবশ্যই অনুধাবন করতে হবে যে গ্যামো আলফার,হেরম্যান এবং ফলিন মহাবিশ্বের সৃষ্টি বিষয়ক তত্ত্বের বিস্তৃততর প্রেক্ষিতে কাজ করছিলেন। তাদের মহাবিস্ফোরণ তত্ত্বে শুধু হিলিয়ামেরই নয়, অপরিহার্যভাবে সকল জটিল নিউক্লিয়াসই দ্রুত নিউট্রন সংযোজন দ্বারা আদি মহাবিশ্বে গঠিত হয়েছে বলে মনে করা হতো। যাহোক এই তত্ত্ব মহাবিশ্বে কয়েকটি ভারী কণিকার পরিমাণের অনুপাত সম্পর্কে নির্ভুল ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল। তা সত্ত্বেও অন্য কোন ভারী কণিকা কেন মোটেই নেই এই তত্ত্ব সেই সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিতে ব্যর্থ হয়। ইতোপূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে পাঁচ বা আটটি পারমাণবিক কণিকা দ্বারা গঠিত কোন স্থায়ী নিউক্লিয়াস নেই। তাই হিলিয়াম নিউক্লিয়াসের সঙ্গে নিউট্রন বা প্রোটন সংযোজন বা একজোড়া হিলিয়ামের নিউক্লিয়াস গলে একীভূত হওয়ার মাধ্যমে হিলিয়ামের চেয়ে ভারী কোন কণিকা গঠন করা সম্ভব নয়। (এনরিকো ফার্মি এবং এন্থনী টার্কেভিচ সর্বপ্রথম এই প্রতিবন্ধকতার বিষয়টি উল্লেখ করেন।) এই প্রতিবন্ধকতা বিদ্যমান থাকার কারণে সহজেই বুঝা যায় কেন তাত্ত্বিকগণ মহাবিস্ফোরণ তত্ত্বে হিলিয়াম তৈরির হিসাব গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করতে অনিচ্ছুক ছিলেন।

ভারী কণিকাসমূহ নক্ষত্রের মধ্যে সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় গঠিত হয় নাই- এই বিকল্প তত্ত্বের উন্নতি ঘটার সঙ্গে সঙ্গে মহাজাগতিক সৃষ্টিতত্ত্বের ভিত্তিতে ভারী কণিকা সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি হওয়ার তত্ত্ব আরো বেশি গ্রহণযোগ্যতা হারালো। ১৯৫২ সালে ই,ই সলপিটার দেখান যে ঘন হিলিয়াম সমৃদ্ধ নক্ষত্রের কেন্দ্রে পাঁচ বা আটটি কণিকা বিশিষ্ট নিউক্লিয়াসের শূন্যস্থানসমূহ পূর্ণ হয়ে যেতে পারে। দুটো হিলিয়াম নিউক্লিয়াসের সংঘর্ষের মাধ্যমে একটি অস্থায়ী বেরিলিয়াম (Be^8) নিউক্লিয়াসের সৃষ্টি হয় এবং এরূপ উচ্চ ঘনত্বের কারণে বেরিলিয়াম ক্ষয়প্রাপ্ত হবার আগেই আবার একটি হিলিয়াম নিউক্লিয়াসের সংঘর্ষের মাধ্যমে একটি স্থায়ী কার্বনের (C^{12}) নিউক্লিয়াস সৃষ্টি করে। (মহাবিশ্বের উৎপত্তিকালে যে পারমাণবিক সংশ্লেষণ ঘটে সেই সময়ে মহাবিশ্বের ঘনত্ব এত কম ছিল যে এই প্রক্রিয়া সংঘটিত হতে পারে নি।) ১৯৫৭ সালে জিওফ্রে এবং মার্গারেট বারবিজ, ফাউলার এবং হয়েল একটি বিখ্যাত প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এই প্রবন্ধে বলা হয় যে ভারী মৌলিক কণিকাসমূহ নক্ষত্রের মধ্যে বিশেষকরে তারকার বিস্ফোরণ যেমন- সুপারনোভার মধ্যে প্রচন্ড নিউট্রন প্রবাহের সময়ে সৃষ্টি হয়ে থাকবে। তবে এমন কি পঞ্চাশের দশকের আগে নভোপদার্থবিদগণ

জোরালোভাবেই বিশ্বাস করতেন যে হাইড্রোজেন ছাড়া সকল মৌলিক কণিকা তারার মধ্যে তৈরি হয়। হয়েল আমার নিকট মন্তব্য করেছেন যে তারার মধ্যে যে শক্তি সৃষ্টি হয় তার উৎস কি সেটা অনুধাবন করার জন্য এই শতাব্দীর শুরুর দশকগুলোতে নভোবিজ্ঞানীগণ যে আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালান তার কারণেই এমনটি ঘটেছিল। ১৯৪০ সালের মধ্যে হ্যানস ব্যাথে এবং অন্যরা তাদের প্রবন্ধে সুস্পষ্টভাবে বলেন যে, তারার মধ্যকার মূল প্রক্রিয়াটি হলো চারটি হাইড্রোজেন নিউক্লিয়াস ফিউশনের মাধ্যমে একটি হিলিয়াম নিউক্লিয়াসে পরিণত হওয়া। এই তথ্যই চল্লিশ এবং পঞ্চাশের দশকে নক্ষত্রের বিবর্তন বুঝবার ক্ষেত্রে দ্রুত অগ্রগতি সাধন করে। হয়েল আরো বলেন যে তারাগুলোই যে মৌলিক কণিকা গঠনের স্থান তাতে সন্দেহ সৃষ্টিতে অনেক পদার্থবিদকে (মোটের উপর) এই সব সাফল্য উদ্বুদ্ধ করে।

কিন্তু নাক্ষত্রিক তত্ত্বের পারমাণবিক সংশ্লেষণেরও নিজস্ব সমস্যা ছিল। তারাগুলো কিভাবে ২৫- ৩০% পরিমাণের হিলিয়াম গঠন করতে পারলো তা বুঝতে পারা কঠিন। বস্তুত এই ফিউশন প্রক্রিয়ায় যে শক্তি মুক্ত হয় তা হবে তারাদের সম্পূর্ণ জীবনকালে নির্গত শক্তির চেয়ে অনেক বেশি। মহাবিশ্ব সৃষ্টিতত্ত্ব এই শক্তি সম্পর্কে অত্যন্ত সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা প্রদান করে। এতে বলা হয় যে, এই শক্তি সাধারণ লালসরণের মাঝে পুরোপুরি বা একেবারে হারিয়ে যায়। ১৯৬৪ সালে হয়েল এবং আর.জে টেলর এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে বর্তমান মহাবিশ্বে যে বিপুল পরিমাণ হিলিয়াম রয়েছে তা সাধারণ তারার মধ্যে সৃষ্টি হতে পারে নি। মহাবিস্ফোরণের আদি অবস্থায় কি পরিমাণ হিলিয়াম সৃষ্টি হতে পারে তা গণনা করে তারা দেখতে পান যে ভর হিসেবে হিলিয়ামের পরিমাণ হলো ৩৬%। বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে পারমাণবিক সংশ্লেষণ কোন মুহূর্তে ঘটতে পারে তারা তা নির্ধারণ করেন এবং অযৌক্তিক কমবেশি ৫০০ কোটি ডিগ্রী কেলভিন তাপমাত্রায় এই পারমাণবিক সংশ্লেষণ ঘটতে পারে বলে তারা সাব্যস্ত করেন- যদিও প্রকৃত পক্ষে এই অনুমান তখনকার দিনের অজ্ঞাত একটি প্যারামিটার এর বেছে নেওয়া মানের উপর নির্ভরশীল। আর তা হলো পারমাণবিক কণিকা প্রতি ফোটন সংখ্যার অনুপাত। হিলিয়ামের পর্যবেক্ষণকৃত পরিমাণের উপর ভিত্তি করে যদি তারা পারমাণবিক কণিকা প্রতি ফোটন সংখ্যার অনুপাত গণনা করতেন তাহলে মাইক্রোওয়েভ পটভূমি বিকিরণের বর্তমান তাপমাত্রা সম্পর্কে তারা মোটামুটি প্রায় সঠিক ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারতেন। তথাপি এটা উল্লেখযোগ্য যে স্থিতাবস্থা বিশ্ব তত্ত্বের অন্যতম উদ্ভাবক হয়েল উপরোক্ত যুক্তি অনুসরণ করতে ইচ্ছুক ছিলেন। তিনি (হয়েল) আরো স্বীকার করেছিলেন যে মহাবিস্ফোরণ মডেলের মতো কোন কিছুর জন্য এটাই (নাক্ষত্রিক তত্ত্বের পারমাণবিক সংশ্লেষণ) সাক্ষ্যপ্রমাণ যুগিয়েছিল।

বর্তমানে সাধারণত বিশ্বাস করা হয় যে মহাবিশ্ব সৃষ্টি প্রক্রিয়ায় ও তারার মধ্যে, উভয় ক্ষেত্রেই পারমাণবিক সংশ্লেষণ ঘটে থাকে। হিলিয়াম এবং সম্ভবত অন্য কয়েকটি হালকা নিউক্লিয়াসের সংশ্লেষণ আদি মহাবিশ্বে হয়েছে। অপর দিকে তারার মধ্যে হালকা এবং ভারী উভয় প্রকার মৌলের নিউক্লিয়াসের সংশ্লেষণ হয়েছিল। হিলিয়াম সংশ্লেষণ তত্ত্ব হিসেবে মহাবিস্ফোরণ তত্ত্বের সত্যিকার যতটুকু গ্রহণযোগ্যতা কাঙ্ক্ষিত ছিল, তা না হয়ে পারমাণবিক সংশ্লেষণের মহাবিস্ফোরণ তত্ত্ব অনেক কিছুই করার চেষ্টা করে আপাত গ্রাহ্যতা হারায়।

দ্বিতীয়ত এটা ছিল তাত্ত্বিক বিজ্ঞানী ও পরীক্ষাভিত্তিক বিজ্ঞানীদের মধ্যে যোগাযোগ ভেঙে পড়ার একটি অতি উচ্চমানের উদাহরণ। অধিকাংশ তাত্ত্বিক কখনও অনুধাবন করেন নি যে একটি ৩° K তাপমাত্রার দিক-নিরপেক্ষ পটভূমি বিকিরণ কখনো শনাক্ত করা যাবে। ১৯৬৭ সালের ২৩ জুন পিবল্‌সকে লিখা এক পত্রে গ্যামো জানান যে মহাবিস্ফোরণের পর থেকে অবশেষ হিসেবে টিকে থাকা বিকিরণ শনাক্ত করতে পারার সম্ভাবনা রয়েছে বলে তিনি (গ্যামো) নিজে, আলফার এবং হেরম্যান মনে করেন নি। কারণ তাদের মহাবিশ্ব সৃষ্টি বিষয়ক গবেষণাকালে বেতার জ্যোতির্বিদ্যা তার শৈশব অবস্থায় ছিল। (আলফার এবং হেরম্যান আমাকে বলেছেন বস্তুত তারা জন হপকিনস বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যাভাল রিসার্চ ল্যাবরেটরীতে এবং ন্যাশনাল ব্যুরো অব স্ট্যান্ডার্ড-এর রাডার বিশেষজ্ঞদের মহাজাগতিক পটভূমি বিকিরণ পর্যবেক্ষণ করতে পারার সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। কিন্তু তাদেরকে বলা হয়েছিল যে তখনকার উদ্ভাবিত প্রযুক্তির মাধ্যমে এত নিম্নমানের যথা ৫° K বা ১০° K তাপমাত্রার পটভূমি বিকিরণ শনাক্ত করা সম্ভব নয়।) অপর দিকে মনে হয় কয়েকজন সোভিয়েট নভোপদার্থবিদ অনুধাবন করেছিলেন যে মাইক্রোওয়েভ তরঙ্গের একটি পটভূমি বিকিরণ শনাক্ত করা সম্ভব। কিন্তু আমেরিকান টেকনিক্যাল জার্নালসমূহের দৃষ্টিভঙ্গী তাকে বিপথে পরিচালিত করে। ১৯৬৪ সালে পর্যালোচনামূলক এক প্রবন্ধে ইয়া.বি.জেলডোভিচ বর্তমান বিকিরণ তাপমাত্রার দুটো সম্ভাব্য মানের জন্য মহাবিশ্বে হিলিয়ামের পরিমাণের নির্ভুল হিসাব উপস্থাপন করেন। সঠিকভাবে গুরুত্ব প্রদান করে এই প্রবন্ধে তিনি বলেন যে, এই সকল সংখ্যা সম্পর্কযুক্ত; কেননা সময়ের সঙ্গে পারমাণবিক কণিকা প্রতি ফোটন সংখ্যার কোন পরিবর্তন হয় না (বা পারমাণবিক কণিকা প্রতি এনট্রপির কোন পরিবর্তন নেই)। ১৯৬৩ সালে বেল সিস্টেম টেকনিক্যাল জার্নালে প্রকাশিত এক প্রবন্ধে ই.এ.ওহম এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে বিকিরণের তাপমাত্রা পরিমাপ করে যে মাত্রা পাওয়া গেছে তার মান ১° K-এর নিচে (বিস্ময়কর হলো এই যে পেনজিয়াস এবং উইলসন মাইক্রোওয়েভ পটভূমি বিকিরণ আবিষ্কার করার জন্য এন্টেনায় যে ২০-০'' লম্বা হর্ন প্রতিফলক ব্যবহার করেছিলেন ওহমের ব্যবহৃত এন্টেনাতেও তেমন একটি ২০-০'' লম্বা হর্ন প্রতিফলক ছিল) এবং তিনি একে ' আকাশের তাপমাত্রা' হিসেবে অভিহিত করেন। যাই হোক এই বিষয়টি ইয়া.বি.জেলডোভিচকে বিভ্রান্ত করেছে বলে মনে হয়। এটা এবং এর সাথে মহাবিশ্বে হিলিয়ামের পরিমাণের কতিপয় নিম্নমান জেলডেভিচকে পরীক্ষামূলকভাবে একটি উত্তপ্ত আদি মহাবিশ্বের ধারণা পরিত্যাগে উৎসাহিত করে।

অবশ্যই ঐ সময়ে গবেষকদের কাছ থেকে তাত্ত্বিকদের কাছে এবং তাত্ত্বিকদের কাছ থেকে গবেষকদের কাছে তথ্যের আদান প্রদান বাজেভাবেই ঘটেছে। পেনজিয়াস এবং উইলসন ১৯৬৪ সালে যখন তাদের এন্টেনা পরীক্ষা করতে শুরু করেন, তখনও তারা আলফার হেরম্যানের ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে কিছুই জানতেন না।

তৃতীয়ত সর্বাধিক গুরুত্ব সহকারে আমি বিশ্বাস করি যে ৩° K তাপমাত্রার মাইক্রোওয়েভ পটভূমি বিকিরণ অনুসন্ধানে মহাবিস্ফোরণ তত্ত্ব কোন অগ্রণী ভূমিকা পালন করেনি। কারণ আদি মহাবিশ্ব সম্পর্কিত কোন তত্ত্ব ঐকান্তিকভাবে গ্রহণ করা পদার্থবিদদের জন্য অস্বাভাবিক রকম কঠিন ছিল। (১৯৬৫ সালের আগে এই বিষয়ে

আমার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী স্মরণ করে আমি এখানে অংশত এই মন্তব্য করছি)। উপরে যে সব বিঘ্ন বা সংকটের উল্লেখ করা হয়েছে- একটু প্রচেষ্টা চালালেই সেগুলো অতিক্রম করা যেতো। যাহোক সময়ের হিসাবে প্রথম তিন মিনিট আমাদের কাছ থেকে এতদূরে এবং ঐ সময়ের তাপমাত্রা ও ঘনত্বের অবস্থা এতটা অজানা যে পরিসংখ্যানগত বলবিদ্যা ও পারমাণবিক পদার্থবিদ্যার সাধারণতত্ত্বসমূহ সেখানে প্রয়োগ করতে আমরা অস্বস্তি বোধ করি।

পদার্থবিদ্যার ক্ষেত্রে প্রায়ই যা ঘটে তা হলো এরকম : আমাদের ভুল এই নয় যে, আমরা আমাদের তত্ত্বগুলোকে খুব গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করি। বরং আমাদের ভুল এই যে আমরা তত্ত্বগুলোকে যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করি না। এটা অনুধাবন করা সর্বদাই কঠিন যে আমাদের টেবিলে আমরা যে সব সংখ্যা এবং সমীকরণ নিয়ে কাজ করি বাস্তব বিশ্ব গঠনে সেগুলোর কি-ই বা ভূমিকা রয়েছে। প্রায়ই আমাদের মধ্যে এই সাধারণ মতৈক্য রয়েছে বলে মনে হয় যে কয়েকটি বিষয়ের তত্ত্বগত ফলাফল ও গবেষণালব্ধ ফলাফল পরস্পরের সঙ্গে মানানসইভাবে বা পুরোপুরি মিলে না। বস্তুত এটা হলো একটি অধিকতর মন্দ অবস্থা। আদি মহাবিশ্বকে আন্তরিকভাবে, গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করতে ইচ্ছুক হওয়া এবং প্রথম তিন মিনিটের প্রাকৃতিক নিয়ম সংক্রান্ত বিধি নিয়ে গবেষণা করার জন্য গ্যামো, আলফার এবং হেরম্যান অসাধারণ কৃতিত্বের দাবী করতে পারেন। মাইক্রোওয়েভ পটভূমি বিকিরণ সন্ধান করার জন্য বেতার জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের যে প্রচেষ্টা চালানো উচিত, সেই বিষয়ে তাদেরকে প্রত্যয়ী করার জন্য তবু তারা (গ্যামো, আলফার, হেরম্যান) চূড়ান্ত পদক্ষেপ নিলেন না। ১৯৬৫ সালে ৩° K তাপমাত্রার মাইক্রোওয়েভ পটভূমি বিকিরণের আবিষ্কার আমাদের সকলকে গুরুত্ব সহকারে এই ধারণা গ্রহণ করতে বাধ্য করলো যে মহাবিশ্ব কোন এক সময়ে আদি অবস্থায় ছিল।

আমি এখানে এই সব হারানো সুযোগ নিয়ে আলোচনা করেছি। কারণ আমার কাছে মনে হয় যে এগুলো হলো বিজ্ঞানের ইতিহাসের সবচেয়ে বেশি আলোকোজ্জ্বল অংশ। দেখা যায় যে বিজ্ঞানের ইতিহাসের অনেকটাই জুড়ে রয়েছে তার সাফল্য ও দৈবক্রমে অপ্রত্যাশিত আবিষ্কারসমূহের বর্ণনা অথবা একজন নিউটন বা আইনস্টাইনের যাদুকরী ও বিরাট আবিষ্কারের বিবরণ। কিন্তু আমি মনে করি যে, বিজ্ঞানের সাফল্যগুলো সম্পর্কে সত্যিকারভাবে অনুধাবন করতে হলে প্রয়োজন- এই সাফল্য অর্জন কত কঠিন তা হৃদয়ঙ্গম করা; বা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের যাত্রা বিপথগামী হওয়া কত সহজ তা বুঝতে পারা অথবা যে কোন সময়ে পরবর্তী মুহূর্তের করণীয় কি তা জানতে পারা কত যে কঠিন তা উপলব্ধি করা।

প্রথম সেকেন্ডের শতাংশ সময়ের ঘটনাবলী
The First One Hundredth Second

পঞ্চম অধ্যায়ে আমরা প্রথম তিন মিনিটের একটি বর্ণনা দিয়েছি। আমরা একেবারে প্রথম থেকে শুরু করি নি। এর পরিবর্তে মহাবিশ্বের তাপমাত্রা দশ হাজার কোটি ডিগ্রী কেলভিনে নেমে আসার পরের অবস্থাকে প্রথম দৃশ্য হিসেবে বর্ণনা করেছি। ঐ সময়ে শুধু যে সব কণিকা বিপুল পরিমাণে বিদ্যমান ছিল, তাহলো-ফোটন, ইলেকট্রন, নিউট্রিনো এবং এদের প্রতিকণিকাসমূহ। বস্তুতপক্ষে একমাত্র এসব কণিকাই যদি তখনকার মহাবিশ্বে বিদ্যমান থাকে তাহলে আমরা মহাবিশ্বের প্রসারণকে সময়ের পিছনের দিকে হিসাব করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে মহাবিশ্বের প্রসারণের অবশ্যই একটি সত্যিকার শুরু রয়েছে। শুরুতে এর তাপমাত্রা ও ঘনত্ব ছিল অসীম এবং আমাদের বর্ণিত প্রথম দৃশ্যের ০.০১০৮ সেকেন্ড পূর্বে একটি মহাবিস্ফোরণ ঘটেছিল।

যাহোক এসব কণিকা ছাড়াও আধুনিক পদার্থবিদ্যায় অন্যান্য অনেক প্রকার কণিকা আবিষ্কৃত হয়েছে। যেমন মিউয়ন, পাইমেসন, প্রোটন,নিউট্রন এবং এমনি ধরনের আরো অনেকগুলো কণিকা। মহাবিশ্বের একেবারে শুরুর দিকে তাকালে আমরা এত উচ্চ তাপমাত্রা ও ঘনত্ব পাই যে তাতে তাপীয় সাম্যাবস্থায় এই সব কণিকা বিপুল পরিমাণে বিদ্যমান থাকতে পারে। তখন এমন একটি অবস্থা ছিল যে সকল কণিকার মধ্যেই একটি অবিরাম ও পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া চলছিল। আমি সুস্পষ্টভাবে বলতে চাই যে এরূপ একটি মিশ্রণের (Melange) বৈশিষ্ট্য নিশ্চিতভাবে গণনা করে বের করার জন্য মৌলিক কণিকার পদার্থ বিজ্ঞান সম্পর্কে যে পর্যাপ্ত জ্ঞান থাকা দরকার তা আমাদের নেই। এভাবে পদার্থবিদ্যার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়াবলী (Microscopic Physics) সম্পর্কে আমাদের অজ্ঞতা একটি অবগুণ্ঠন হয়ে মহাবিশ্বের শুরুর দিকে আমাদের দৃষ্টিকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে রাখে।

এই অবগুণ্ঠনের পেছনের দিকে উঁকি দিয়ে তাকানোর চেষ্টা করা স্বভাবতই প্রলুব্ধকর। বিশেষ করে আমার মতো তাত্ত্বিক, যাদের কাজ নভোপদার্থবিদ্যার চাইতে পদার্থবিদ্যার মৌলিক কণিকা সম্পর্কেই অনেক বেশি, তাঁদের কাছে এই প্রলোভন আরো শক্তিশালী। মৌলিক কণিকার সমসাময়িক পদার্থবিজ্ঞানে অনেক চিত্তাকর্ষক ধারণা রয়েছে। সেগুলোর অতিসূক্ষ্ম (Subtle) ফলাফল রয়েছে এবং সেগুলো গবেষণাগারে পরীক্ষা করা খুবই কঠিন ; কিন্তু একেবারে আদি মহাবিশ্বের ক্ষেত্রে ঐ সব ধারণা প্রয়োগ করা হলে অত্যন্ত নাটকীয় ফলাফল পাওয়া যায়। দশ হাজার

কোটি ডিগ্রীর (কেলভিন) বেশি তাপমাত্রার দিকে তাকালে আমাদেরকে প্রথম যে সমস্যায় পড়তে হয় তা হলো মৌলিক কণিকার শক্তিশালী নিউক্লীয় বল। যে বল একটি পরমাণুর নিউক্লিয়াসে নিউট্রন ও প্রোটনকে একত্রে বেঁধে রাখে তাকে শক্তিশালী নিউক্লীয় বল বলে। তড়িৎ-চুম্বক বল এবং মহাকর্ষ বলের মতো দৈনন্দিন জীবনে এই বল তত সুপরিচিত নয়। কারণ এই বলের পাল্লা (Range) খুবই ক্ষুদ্র, প্রায় এক সেন্টিমিটারের দশ লক্ষ কোটি ভাগের একভাগ (১০$^{-১৩}$সেন্টিমিটার)। এমন কি অণুর মধ্যে যেখানে নিউক্লিয়াসসমূহ (Nuclei) সচরাচর এক সেন্টিমিটারের দশ কোটি ভাগের একভাগ (১০$^{-৮}$ সেন্টিমিটার) দূরত্বে অবস্থান করে, সেখানে নিউক্লিয়াসসমূহের মধ্যে শক্তিশালী নিউক্লীয় বলের কার্যত কোন প্রভাব থাকে না। তবুও এর নাম থেকেই বুঝা যায় যে,শক্তিশালী নিউক্লীয় বলের মিথস্ক্রিয়া খুবই শক্তিশালী। দুটো প্রোটনকে ধাক্কা দিয়ে যখন বেশ কাছাকাছি নিয়ে আসা হয় তখন তাদের মধ্যকার শক্তিশালী নিউক্লীয় বলের আকর্ষণ বৈদ্যুতিক বিকর্ষণের চেয়ে প্রায় একশত গুণ বেশি হয়। এই কারণেই শক্তিশালী নিউক্লীয় বল প্রায় একশটি প্রোটনের বিকর্ষণ বলকে অতিক্রম করে পরমাণুর নিউক্লিয়াসে একশটি প্রোটনকে একত্রে বেঁধে রাখতে পারে। নিউট্রন ও প্রোটনের পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমেই একটি হাইড্রোজেন বোমার বিস্ফোরণ ঘটে থাকে। এই পুনর্বিন্যাসের ফলে পরমাণুর নিউক্লিয়াসে নিউট্রন ও প্রোটনসমূহ শক্তিশালী নিউক্লীয় বল দ্বারা অধিকতর শক্তভাবে একত্রে আবদ্ধ থাকতে পারে। নিউট্রন ও প্রোটনের পুনর্বিন্যাসের কারণে যে অতিরিক্ত শক্তি মুক্ত হয় ঠিক তাই হলো একটি হাইড্রোজেন বোমার শক্তি।

শক্তিশালী নিউক্লীয় বলের প্রবল শক্তির কারণে তড়িৎ-চুম্বক বলের তুলনায় এর (শক্তিশালী নিউক্লীয় বলের) গাণিতিক বিশ্লেষণ অনেক বেশি কঠিন। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, দুটো ইলেকট্রনের মধ্যে তড়িৎ-চুম্বক বলের বিকর্ষণের ফলে সৃষ্ট (দুটো ইলেকট্রনের) বিক্ষেপের হার আমরা যখন গণনা করি তখন আমাদেরকে অবশ্যই অসীম সংখ্যক সহায়ক বলের (Infinite Numbers of Contribution) যোগফল বের করতে হয়। এই সহায়ক বলের প্রত্যেকটিই হলো ফোটন এবং ইলেকট্রন-পজিট্রন জোড়ের নিঃসরণ ও বিশোষণের একটি নির্দিষ্ট ফলাফল বা পরিণতি। এরকম প্রত্যেকটি যুগলকে 'ফাইন ম্যান ডায়াগ্রাম' বা এক প্রকার রেখাচিত্র দ্বারা প্রতীকায়ন করা হয়। [চল্লিশের দশকের শেষ দিকে কর্নেলে রিচার্ড ফাইনম্যান (Richard Feynman) রেখাচিত্রকে ব্যবহার করে সহায়ক বলসমূহ গণনার একটি পদ্ধতি বের করেন। সুস্পষ্টভাবে বলা যায়, প্রত্যেকটি সহায়ক বলের জন্য একটি রেখাচিত্র ধরে প্রত্যেকটি বলের সমষ্টিকে বর্গ করে বিক্ষেপণের হার (Scattering) নিরূপণ করা যায়।] যে কোন একটি রেখাচিত্রে যদি অতিরিক্ত একটি অভ্যন্তরস্থ রেখা অংকন করা হয়, তবে তা রেখাচিত্রের সহায়ক শক্তিকে কমিয়ে ফেলে। যে কোন ডায়াগ্রামে (রেখাচিত্রে) প্রত্যেকটি অভ্যন্তরস্থ রেখার জন্য সহায়ক শক্তি মোটামুটি যে পরিমাণে কমে তা পেতে হলে সহায়ক শক্তিকে প্রতিটি রেখার জন্য অত্যন্ত ক্ষুদ্র একটি উৎপাদক ১/১৩৭.০৩৬ দ্বারা গুণ করতে হয়। এই উৎপাদকটি হলো প্রকৃতির একটি মৌলিক ধ্রুবক। এটা ফাইন ষ্ট্রাকচার ধ্রুবক (Fine Structure Constant) নামে পরিচিত। এতএব জটিল রেখাচিত্রগুলো থেকে অল্প সহায়ক শক্তি পাওয়া যায় এবং শুধু কয়েকটি সহজ রেখাচিত্রকে যোগ করে আমরা পর্যাপ্ত আসন্ন মানের বিক্ষেপ

প্রক্রিয়ার হার গণনা করতে পারি। (এই কারণেই আমাদের এই আস্থা রয়েছে যে পারমাণবিক বর্ণালীকে আমরা প্রায় অসীম শুদ্ধতায় ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারি।) তবে প্রবল নিউক্লীয় বলের মিথস্ক্রিয়ার ক্ষেত্রে 'ফাইনম্যান স্ট্রাকচার ধ্রুবক' -এর যে ধ্রুবকটি ব্যবহৃত হয় তার মান হলো মোটামুটি এক এর সমান, ১/১৩৭ নয়। সুতরাং জটিল রেখা চিত্রগুলো যত বেশি সহায়ক বলের প্রতিনিধিত্ব করে সরল রেখাচিত্রসমূহও ততবেশি সহায়ক বলের প্রতিনিধিত্ব করে। প্রবল নিউক্লীয় বলের প্রক্রিয়ার হার গণনা করতে পারার অসুবিধা বিগত পঁচিশ বছর ধরে পদার্থবিদ্যার মৌলিক কণিকার গবেষণার অগ্রগতির ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় একক প্রতিবন্ধক হিসেবে বিরাজ করছে।

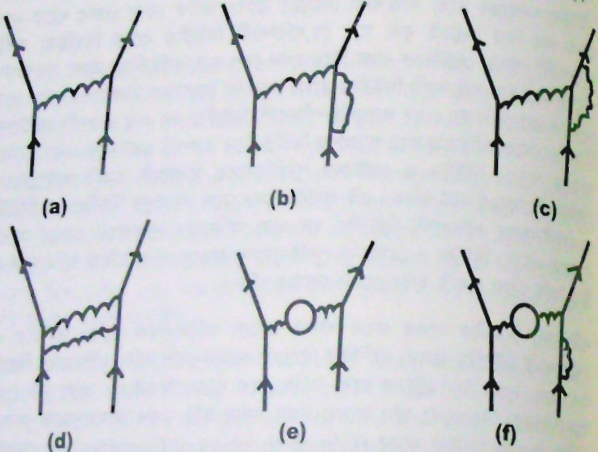

চিত্র ১০- কয়েকটি ফাইনম্যান ডায়াগ্রাম : ইলেকট্রন- ইলেকট্রন বিক্ষেপণ প্রক্রিয়ার জন্য ফাইনম্যান ডায়াগ্রামের কয়েকটি উপরে দেখানো হলো। সরল রেখাগুলো ইলেকট্রন বা পজিট্রন নির্দেশ করে। তরঙ্গায়িত রেখাগুলো ফোটন নির্দেশ করে। প্রত্যেকটি চিত্র একটি নির্দিষ্ট সংখ্যাসূচক পরিমাণের প্রতিনিধিত্ব করে। এই পরিমাণ নির্ভর করে ভিতরে আসা এবং বাইরে যাওয়া (In Coming And Out Coming) ইলেকট্রনের গতিশীলতা (Momenta) এবং ঘূর্ণনের (Spin) উপর। বিক্ষেপণ প্রক্রিয়ার হার হলো সকল ফাইনম্যান ডায়াগ্রামের সাথে যুক্ত এসব সংখ্যার বর্গের সমষ্টি। এই সমষ্টিতে ডায়াগ্রামের সহায়ক বলের অবদান হলো ১/১৩৭ মানের কয়েকটি উৎপাদকের আনুপাতিক। (১/১৩৭ কে বলা হয় ফেইনম্যান স্ট্রাকচার ধ্রুবক) ১/১৩৭ মানের ফাইনম্যান স্ট্রাকচার ধ্রুবককে ফোটন রেখার সংখ্যা দ্বারা বুঝানো হয়। ডায়াগ্রাম 'a' একটি ফোটন বিনিময় এবং ১/১৩৭ এর সমানুপাতিক ও প্রধান সহায়ক বলের অবদান রাখাকে নির্দেশ করে। ডায়াগ্রাম b,c,d,e দ্বারা সব ধরনের সে সব ডায়াগ্রাম কে বুঝানো হয়, যে সব ডায়াগ্রাম 'a' এর প্রধান ও রেডিয়েটিভ সংশোধন করে। এসব ডায়াগ্রামের সহায়ক বলের অবদান হলো $(১/১৩৭)^২$ মানের। ডায়াগ্রাম f -এর সহায়ক বলের অবদান হলো আরো ক্ষুদ্র মানের, যেমন তা $(১/১৩৭)^৩$ -এর সমানুপাতিক।

সকল প্রক্রিয়ায় প্রবল নিউক্লীয় বলের মিথস্ক্রিয়া ক্রিয়াশীল থাকে না। শুধু হ্যাড্রন নামক এক শ্রেণীর কণিকার ক্ষেত্রে প্রবল নিউক্লীয় বলের মিথস্ক্রিয়া ক্রিয়াশীল থাকে। পারমাণবিক কণিকাসমূহ ও পাইমেসন এবং অন্যান্য অস্থায়ী কণিকাসমূহ যেমন কে মেসন, ইটা মেসন , লামবডা হাইপেরন, সিগমা হাইপেরন ইত্যাদি

কণিকা হ্যাড্রন শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। সাধারণত হ্যাড্রন শ্রেণীর কণিকা লেপটন শ্রেণীর কণিকার চেয়ে ভারী। লেপটন এসেছে গ্রীক শব্দ 'লাইট' থেকে। লেপটন ও হ্যাড্রন শ্রেণীর কণিকার মধ্যে প্রকৃত গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য হলো হ্যাড্রন শ্রেণীর কণিকাসমূহ প্রবল নিউক্লীয় বল অনুভব করে, অপরপক্ষে লেপটন যেমন নিউট্রন,ইলেকট্রন, মিউয়ন ইত্যাদি প্রবল নিউক্লীয় বলের মিথষ্ক্রিয়ার প্রভাব অনুভব করে না। ইলেকট্রন কর্তৃক কোন পারমাণবিক বল অনুভূত না হওয়ার বাস্তবতাটি বিস্ময়করভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এও কম বিস্ময়কর নয় যে,ক্ষুদ্র ভর বিশিষ্ট ইলেকট্রন একটি পরমাণু বা অণুর চারদিকে পরমাণুর নিউক্লিয়াসের ব্যাস থেকে প্রায় এক লক্ষ গুণের চেয়ে বড় ইলেকট্রনের মেঘ সৃষ্টি করে। পরমাণুর নিউক্লিয়াসে যে বলে নিউট্রন এবং প্রোটন একত্রে বাঁধা থাকে অর্থাৎ প্রবল নিউক্লীয় বলের (Strong Nuclear Force) তুলনায় রাসায়নিক বল মিলিয়ন মিলিয়ন গুণ দুর্বল এবং এই রাসায়নিক বলই অণুর মধ্যে পরমাণুসমূহকে বন্ধনে রাখে। পরমাণু ও অণুর মধ্যকার ইলেকট্রন যদি পারমাণবিক বল অর্থাৎ প্রবল নিউক্লীয় বল অনুভব করতো,তাহলে শুধু পারমাণবিক পদার্থবিদ্যা ছাড়া রসায়ন শাস্ত্র বা জীববিদ্যা বা ক্রিস্টালোগ্রাফি (Crystalography) হিসেবে কোন বিষয় থাকত না। [পঞ্চম অধ্যায়ে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে আমরা দশ হাজার কোটি ডিগ্রী কেলভিন তাপমাত্রা বাছাই করেছিলাম। এই তাপমাত্রা হলো সকল হ্যাড্রনের সূচন তাপমাত্রার (Thresh Hold) নিচে। (পৃষ্ঠা নং ১৫৮ এর এক নং ছক অনুযায়ী সবচেয়ে হালকা হ্যাড্রন পাইমেসনের সূচন তাপমাত্রা হলো প্রায় ১.৬ মিলিয়ন মিলিয়ন ডিগ্রী কেলভিন)। পঞ্চম অধ্যায়ে বর্ণিত কাহিনীতে যে সব কণিকা বিপুল সংখ্যায় ক্রিয়াশীল ছিল সেগুলো হলো লেপটন ও ফোটন। তাদের মধ্যকার মিথষ্ক্রিয়া নিরাপদেই অগ্রাহ্য করা যায়।]

উচ্চতর তাপমাত্রায় যখন বিপুল সংখ্যক হ্যাড্রন এবং এন্টিহ্যাড্রন ক্রিয়াশীল ছিল-তখনকার অবস্থাকে আমরা কিভাবে ব্যাখ্যা করবো। হ্যাড্রনের আচরণ সম্পর্কে দুটি ভিন্ন ধরনের জবাব পাওয়া যায় এবং এতে হ্যাড্রনের প্রকৃতি সম্পর্কে দুটি ভিন্ন মতবাদের প্রতিফলন ঘটে।

একটি মতবাদ অনুযায়ী প্রাথমিক (Elementary) হ্যাড্রন বলে প্রকৃতপক্ষে কোন কিছু নেই। প্রত্যেকটি হ্যাড্রনই অপর যে কোন একটি হ্যাড্রনের মতো মৌলিক। প্রত্যেকটি হ্যাড্রন শুধু যে স্থায়ী তাই নয়, বরং প্রায় প্রোটন ও নিউট্রনের মতো স্থায়ী। আবার প্রত্যেকটি হ্যাড্রন যে পাইমেসন, কে-মেসন, ইটামেসন এবং হাইপেরনের মতো শুধু মাঝারি গোছের অস্থায়ী তাই নয়, এমনকি রো মেসন কণিকার মতো সম্পূর্ণরূপে অস্থায়ী। উল্লেখ্য, পাইমেসন, ইটামেসন, হাইপেরন কণিকাসমূহের জীবনকাল এতটা দীর্ঘস্থায়ী হয় যে এরা ফটোগ্রাফিক ফিল্ম অথবা বাবল চেম্বারে পরিমাপযোগ্য দাগ বা রেখা সৃষ্টি করে। তবে রো মেসন এর মতো সম্পূর্ণ অস্থায়ী কণিকাসমূহের জীবনকাল বা স্থায়িত্ব হলো আলোর গতির কাছাকাছি গতিতে একটি পরমাণুর নিউক্লিয়াস অতিক্রম করতে কণিকার যে সময় লাগে তাই। পঞ্চাশের দশকের শেষের দিকে এবং ষাটের দশকের প্রথম দিকে বিশেষ ভাবে বার্কলের জিওফ্রে চিউ (Geoffrey Chew) এই মতবাদ উদ্ভাবন করেন এবং এই মতবাদ কখনো কখনো 'পারমাণবিক গণতন্ত্র' (Nuclear Democracy) হিসেবে পরিচিত।

হ্যাড্রনের এই উদার সংজ্ঞার্থ বিবেচনা করা হলে দেখা যাবে যে আক্ষরিকভাবে জ্ঞাত শত শত হ্যাড্রন রয়েছে। এদের সূচন তাপমাত্রা ১০০ মিলিয়ন মিলিয়ন ডিগ্রী কেলভিনের নীচে। সম্ভবত আরো শতশত হ্যাড্রন আবিষ্কারের অপেক্ষায় রয়েছে। কোন কোন তত্ত্ব অনুসারে সীমাহীন সংখ্যক প্রজাতির হ্যাড্রন বিদ্যমান রয়েছে। যখন আমরা উচ্চ থেকে উচ্চতর স্তরের কণিকা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করতে থাকি তখন কণিকার প্রকারের সংখ্যা দ্রুত এবং ক্ষুদ্রতর বৃদ্ধি পেতে থাকে। এমন এক জগতের মধ্য থেকে অর্থবহ কিছু বের করতে পারার প্রচেষ্টা চালানোকে নৈরাশ্যব্যঞ্জক বলে প্রতীয়মান হতে পারে। তবে কণিকার বর্ণালীর দুর্বোধ্যতাই এক ধরনের সহজবোধ্যতা সৃষ্টি করতে পারে। যেমন রো মেসন হলো একটি হ্যাড্রন- যাকে দুটো পাই মেসনের অস্থায়ী যৌগিক (কম্পোজিট) হিসেবে বিবেচনা করা যায়। যখন আমরা আমাদের গণনায় শুধু দুটো রো মেসন সুনির্দিষ্টভাবে অন্তর্ভুক্ত করি তখন আমরা কিছুটা হলেও পাইমেসন-এর মধ্যে প্রবল নিউক্লীয় বলের মিথষ্ক্রিয়া বিবেচনা করি। সম্ভবত আমাদের তাপীয় বলবিদ্যার গণনায় সুনির্দিষ্টভাবে সব হ্যাড্রনকে অন্তর্ভুক্ত করে আমরা প্রবল নিউক্লীয় বলের অন্যান্য সকল প্রভাব অগ্রাহ্য করতে পারি।

প্রকৃতপক্ষে যদি সীমাহীন সংখ্যক প্রজাতির হ্যাড্রন বিদ্যমান থাকে এবং আমরা যখন একটি নির্দিষ্ট আয়তনের স্থানে শক্তি অধিক থেকে অধিকতর পরিমাণে বাড়াতে থাকি তখন শক্তিকণিকাসমূহের গতি যাদৃচ্ছিকভাবে বাড়তে থাকে না। বরং এর পরিবর্তে ঐ নির্দিষ্ট ঘন আয়তনে বিদ্যমান কণিকার প্রজাতি বা রকমের সংখ্যা বাড়তে থাকে। হ্যাড্রন প্রজাতির সংখ্যা অপরিবর্তিত থাকলে শক্তিঘনত্ব বৃদ্ধির সাথে সাথে তাপমাত্রা যত দ্রুত বৃদ্ধি পায় এক্ষেত্রে তেমনটি ঘটে না। বস্তুত এসব তত্ত্বে একটি সর্বোচ্চ মানের তাপমাত্রা থাকতে পারে এবং এই তাপমাত্রায় শক্তিঘনত্ব হয় অসীম। সর্বনিম্ন তাপমাত্রার ক্ষেত্রে পরম শূন্য যেমন একটি নিম্ন সীমা তেমনি সর্বোচ্চ তাপমাত্রার ক্ষেত্রে এটা অনতিক্রম্য উচ্চসীমা। জেনেভায় অবস্থিত সার্ন (CERN) গবেষণাগারের আর.হেজড্রন (R.Hagedron) হ্যাড্রন পদার্থ বিদ্যায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রার ধারণা প্রবর্তন করেন। পরবর্তীতে আমি এম.আই. টি-র কারসেন হুয়াং (Kerson Huang) এবং অন্য তাত্ত্বিকগণ এই তত্ত্বের অধিকতর উন্নতি সাধন করেছি। এমন কি সর্বোচ্চ তাপমাত্রা কি হবে তার একটি অত্যন্ত নিখুঁত গণনা বা প্রাক্কলন রয়েছে। এই তাপমাত্রা বিস্ময়করভাবে কম- প্রায় দুই মিলিয়ন মিলিয়ন ডিগ্রী কেলভিন (২ X $১০^{১২}$K)। আমরা যতই সৃষ্টির আদি মুহূর্তগুলোর দিকে তাকাই, তাপমাত্রা ততই উচ্চতর হয় এবং ততই অধিকতর সংখ্যক প্রজাতির হ্যাড্রন বিদ্যমান দেখতে পাই। যা হোক,এরূপ বিচিত্র অবস্থার মধ্যেও এমন একটা প্রারম্ভিক মুহূর্ত ছিল, যখন শক্তিঘনত্ব ছিল অসীম এবং এই অসীম মুহূর্তটি হলো পঞ্চম অধ্যায়ের প্রথম চিত্রের মোটামুটি এক সেকেন্ডের শতাংশ সময় আগের।

হ্যাড্রন সম্পর্কে অপর যে মতবাদটি রয়েছে তা হলো অনেকটা গতানুগতিক এবং পারমাণবিক গণতন্ত্র মতবাদের চেয়ে তা সাধারণ স্বজ্ঞার (Intuition) অনেক নিকটবর্তী এবং আমার মতে- এই মতবাদটি যথার্থতার কাছাকাছি। এই মতবাদ অনুযায়ী সকল কণিকা সমান নয়। কতগুলো কণিকা সত্যিই মৌলিক এবং অন্য কণিকাসমূহ মৌলিক কণিকার সমন্বয়ে গঠিত শুধু যৌগিক কণিকা। মৌলিক

কণিকাসমূহ ফোটন এবং সকল জ্ঞাত লেপটন কণিকা দ্বারা গঠিত বলে ধারণা করা হয়; তবে এগুলো (মৌলিক কণিকাসমূহ) কোন জ্ঞাত হ্যাড্রন কণিকা দ্বারা গঠিত নয়। মনে করা হয় হ্যাড্রনসমূহ বরং কোয়ার্ক (Quark)-এর মতো অধিকতর মৌলিক কণিকার সমন্বয়ে গঠিত যৌগিক কণিকা। মারে গ্যালম্যান (Murray Gell-Mann) এবং স্বতন্ত্রভাবে জর্জ উইগ (George Zweig) সর্বপ্রথম কোয়ার্ক তত্ত্বের অবতারণা উপস্থাপন করেন। বিভিন্ন প্রকার কোয়ার্কের নামকরণে তাত্ত্বিক পদার্থবিদদের কাব্যিক ভাবনার পরিচয় মেলে। বিভিন্ন রকমের বা গন্ধের কোয়ার্ক রয়েছে। এগুলোর নাম দেওয়া হয়েছে আপ (UP), ডাউন (Down), ষ্ট্রেঞ্জ (strange) এবং চার্মড (Charmed)। অধিকন্তু প্রত্যেক গন্ধের (Flavour) কোয়ার্কের রয়েছে সুনির্দিষ্ট তিনটি রঙের নামে নাম। মার্কিন পদার্থবিদরা সাধারণত লাল, সাদা ও নীল নামে এদেরকে চিহ্নিত করেন। পিকিং-এর তাত্ত্বিক পদার্থবিদদের একটি ছোট দল দীর্ঘদিন ধরেই কোয়ার্ক তত্ত্বের ভাষ্যকে সমর্থন করেছেন। তবে তারা কোয়ার্ককে ষ্ট্রাটন (Straton) নামে অভিহিত করেন। কেননা এই কণিকাগুলো সাধারণ হ্যাড্রনের চেয়ে গভীরতর স্তরের বাস্তবতাকে ব্যাখ্যা করে।

কোয়ার্ক তত্ত্ব যদি সঠিক হয় তা হলে আদি মহাবিশ্বের পদার্থবিদ্যা যেমনটি ভাবা হয়েছিল তার চেয়ে সহজতরই হবে। একটি পারমাণবিক কণিকার অভ্যন্তরে কোয়ার্কের স্থানিক বণ্টন থেকে এদের (কোয়ার্কের) মধ্যে ক্রিয়াশীল বল সম্পর্কে কিছু সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভব। (কোয়ার্ক মডেল যদি সত্যি হয়) অপর পক্ষে পারমাণবিক কণিকার সাথে উচ্চ শক্তির ইলেকট্রনের সংঘর্ষ পর্যবেক্ষণ করে কোয়ার্কের এই বণ্টন নির্ধারণ করা সম্ভব। এভাবে কয়েক বছর আগে এম.আই.টি ও স্ট্যানফোর্ড লিনিয়ার এক্সিলারেটর সেন্টার কর্তৃক যুগ্মভাবে পরিচালিত এক পরীক্ষায় দেখতে পাওয়া যায় যে, কোয়ার্কসমূহ যখন একে অপরের খুব কাছাকাছি আসে তখন তাদের মধ্যকার বল অদৃশ্য হয় বলে মনে হয়। এ থেকে যে পরামর্শ পাওয়া যায় তা হলো, প্রায় কয়েক মিলিয়ন মিলিয়ন ডিগ্রী কেলভিন তাপমাত্রায় হ্যাড্রনগুলো সহজেই তাদের গঠনকারী উপাদান কোয়ার্কে ভেঙে যায় ঠিক যেমন কয়েক হাজার ডিগ্রী কেলভিন তাপমাত্রায় পরমাণু তার নিউক্লিয়াস ও ইলেকট্রনে ভেঙে পড়ে। আবার একইভাবে কয়েক হাজার মিলিয়ন ডিগ্রী কেলভিন তাপমাত্রায় নিউক্লিয়াস নিউট্রন ও প্রোটনে ভেঙে পড়ে। এই চিত্র অনুযায়ী একেবারে আদি মুহূর্তে মহাবিশ্ব ফোটন, লেপটন, এন্টিলেপটন , কোয়ার্ক এবং এন্টিকোয়ার্ক কণিকায় গঠিত ছিল বলে বিবেচনা করা যায়। অনিবার্যভাবে এরা সকলেই মুক্ত কণিকা হিসেবে চলাচল বা ভ্রমণ করছিল এবং প্রত্যেক প্রজাতির কণিকা অতিরিক্ত ঠিক এক প্রকারের কৃষ্ণকায়া বিকিরণের যোগান দিচ্ছিল।তাই এটা হিসাব করা সহজ যে প্রথম চিত্রের এক সেকেন্ডের প্রায় এক শতাংশ সময় আগে অসীম ঘনত্ব ও অসীম তাপমাত্রায় মহাবিশ্বের অবশ্যই একটি প্রারম্ভ ছিল।

এসব স্বজ্ঞামূলক (Intuitive) তত্ত্বসমূহ সম্প্রতি অনেকটা দৃঢ়তর গাণিতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ১৯৭৩ সালে তিন জন তরুণ তাত্ত্বিক হার্ভার্ডের হিউগ ডেভিড পলিটজার (Hugh David Politzer), প্রিসটনের ডেভিড গ্রস (David Gross) এবং ফ্রাংক উইলজেক (Frank Wilczek) দেখান যে, কোয়ান্টাম ফিল্ড তত্ত্বের একটি বিশেষ শ্রেণীতে কোয়ার্কগুলোকে যখন ধাক্কা দিয়ে খুব কাছাকাছি

নেওয়া হয়, তখন কোয়ার্কের মধ্যকার বল সত্যিকারভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে। (এই ধরনের তত্ত্ব নন-এবেলিয়ান গেজ থিয়োরী নামে পরিচিত এবং তা এত বেশি টেকনিক্যাল যে এখানে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়)। এই তত্ত্বগুলোর 'অসীমতটী' (Asymptotic) স্বাধীনতার উল্লেখযোগ্য ধর্ম রয়েছে। স্বল্প দূরত্ব বা উচ্চ শক্তিতে কোয়ার্কগুলো অসীমতটীয়ভাবে মুক্ত কণিকার মতো আচরণ করে। এমনকি ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের জে.সি.কলিনস (J.C.Collins) এবং এম.জে.পেরি (M.J.Perry) দেখান যে, যে কোন অসীমতটীয় মুক্ত তত্ত্বে পর্যাপ্ত উচ্চমাত্রা এবং উচ্চঘনত্বে একটি মাধ্যম অনিবার্যভাবে এমন ধর্মাবলী প্রদর্শন করে যেন তা (মাধ্যমটি) শুধু মুক্ত কণিকার দ্বারা গঠিত। এসব নন-এবেলিয়ান গেজ তত্ত্বের অসীমতটী স্বাধীনতা প্রথম সেকেন্ডের শতাংশ সময়ের ও অত্যন্ত সরল চেহারার মহাবিশ্বকে এভাবে একটি দৃঢ় পাণ্ডিত্যিক ব্যাখ্যা প্রদান করে যে, ঐ সময়ে মহাবিশ্ব মুক্ত সব মৌলিক কণিকা দ্বারা গঠিত ছিল।

বহু ধরনের প্রয়োগ ক্ষেত্রেই কোয়ার্ক মডেল অত্যন্ত ভালভাবে কাজ করে। প্রোটন এবং নিউট্রন সত্যিই এমন আচরণ করে যেন তারা তিনটি কোয়ার্ক দিয়ে গঠিত। মেসনের আচরণ এমন যেন তারা একটি কোয়ার্ক ও একটি এন্টিকোয়ার্কের সমন্বয়ে গঠিত এবং অন্যান্য কণিকার ক্ষেত্রেও এক রকমই ঘটে। তবে এসব সাফল্য সত্ত্বেও কোয়ার্ক মডেল আমাদের কাছে এক বিরাট দুর্বোধ্য প্রশ্ন উত্থাপন করে। বর্তমানে বিদ্যমান সর্বোচ্চ শক্তির কণিকা ত্বরক (Accelerator) ব্যবহার করেও কোন হ্যাড্রনকে এর গঠনকারী উপাদান কোয়ার্কে ভাঙা বা বিশ্লিষ্ট করা সম্ভব হয় নি।

আমরা মহাবিশ্ব সৃষ্টিতত্ত্বেও মুক্ত কোয়ার্কে বিশ্লিষ্ট করার অক্ষমতা দেখতে পাই। আদি মহাবিশ্ব যে উচ্চ তাপমাত্রায় ছিল সেই তাপমাত্রায় যদি হ্যাড্রনসমূহ সত্যিই কোয়ার্কে বিশ্লিষ্ট হয়ে থাকে বা ভেঙে গিয়ে থাকে তাহলে তার অবশেষ হিসেবে কিছু মুক্ত কোয়ার্ক বর্তমান সময়ে দেখতে পাওয়া যাবে- এমনটি যে কেউই আশা করতে পারেন। সোভিয়েত নভোপদার্থবিদ ওয়াই. বি. জেলডোভিচের (Ya.B.Zeldvich) হিসাব অনুযায়ী অবশেষ হিসেবে টিকে থাকা মুক্ত কণিকার সংখ্যা বর্তমান মহাবিশ্বে মোটামুটি ভাবে সোনার পরমাণুর মতই সহজলভ্য হওয়া উচিত। বলার অপেক্ষা রাখে না যে সোনার প্রাচুর্য না থাকলেও এক আউন্স কোয়ার্ক ক্রয় করতে পারার চেয়ে এক আউন্স সোনা ক্রয় করতে পারা সহজতর।

তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যা (Theoritical Physics) বর্তমানে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ যে সমস্যাটি মোকাবিলা করছে তা হলো, একক বা পৃথকভাবে মুক্ত কোয়ার্কের অস্তিত্ব খুঁজে না পাওয়া। গ্রস, উইন জেক এবং আমি প্রস্তাব করি যে 'অসীমতটী স্বাধীনতা' তত্ত্ব একটি সম্ভাব্য ব্যাখ্যা উপস্থাপন করতে পারে। দুটো কোয়ার্ককে ধাক্কা দিয়ে খুব কাছাকাছি নেওয়া হলে যদি কোয়ার্কের মধ্যকার মিথষ্ক্রিয় বলের শক্তি হ্রাস পেতে থাকে, তাহলে কোয়ার্কসমূহকে টেনে পরস্পর থেকে দূরে সরিয়ে নিলে তাদের মধ্যে ক্রিয়াশীল মিথষ্ক্রিয় বলের শক্তি বৃদ্ধি পেতে থাকবে। সুতরাং একটি সাধারণ হ্যাড্রনে একটি কোয়ার্ক থেকে অপর একটি কোয়ার্ককে টেনে সরাতে যে শক্তির প্রয়োজন হয়, তা দুটো কোয়ার্কের মধ্যকার দূরত্ব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে থাকে। এই শক্তি বৃদ্ধি পেতে পেতে অবশেষে এত প্রবল হয় যে তখন তা শূন্যস্থান (Vaccum) থেকেই

নতুন কোয়ার্ক- এন্টিকোয়ার্কের জোড়া সৃষ্টি করতে পারে। শেষ পর্যন্ত কয়েকটি মুক্ত কোয়ার্ক সৃষ্টির মাধ্যমে নয়, বরং কয়েকটি সাধারণ হ্যাড্রন সৃষ্টির মাধ্যমে বিষয়টির নিষ্পত্তি ঘটে। এটা বস্তুত এক টুকরা রশির (String) এক প্রান্তকে পৃথক বা বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা চালানোর মত একটি প্রয়াস। রশিটিকে যদি খুব জোড়ে টানা হয় তবে ছিড়ে যাবে। কিন্তু চূড়ান্ত ফলাফল হলো দুই টুকরা রশি এবং এই প্রত্যেক টুকরা রশির রয়েছে আবার দুটো প্রান্ত ! আদি মহাবিশ্বে কোয়ার্কগুলো পরস্পরের এত বেশি কাছাকাছি ছিল যে তারা এসব বল অনুভব করে নি এবং তারা মুক্ত কণিকার মত আচরণ করতে সক্ষম হয়। তবে আদি মহাবিশ্বে বিদ্যমান প্রত্যেকটি মুক্ত কোয়ার্ক মহাবিশ্ব প্রসারিত ও শীতলতর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অবশ্যই হয়তো একটি এন্টিকোয়ার্কের সাথে সংঘর্ষে সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়েছে, নয় তো একটি প্রোটন বা নিউট্রনের অভ্যন্তরে বিশ্রামের স্থান খুঁজে পেয়েছে।

শক্তিশালী নিউক্লীয় বলের মিথস্ক্রিয়া প্রসঙ্গে আলোচনা এই পর্যন্তই যথেষ্ট। ঘড়ির কাটা ঘুড়িয়ে মহাবিশ্বের একেবারে শুরুর দিকে তাকালে দেখতে পাই যে, আমাদের জন্য আরো সমস্যা মজুদ রয়েছে।

মৌলিক কণিকার আধুনিক তত্ত্বসমূহের একটি সত্যিকার চিত্তাকর্ষক পরিণতি হলো মহাবিশ্ব হয়তো একটি দশা পরিবৃত্তি বা পর্যায় ক্রান্তিকাল (Phase Transition) অতিক্রম করেছে। ২৭৩° K এর নিচের তাপমাত্রায় বা ০°c তাপমাত্রায় পানি যেমন বরফে পরিণত হয় এটা তেমন অবস্থা। এই দশা পরিবৃত্তি শক্তিশালী নিউক্লীয় বলের সঙ্গে জড়িত বা সম্পর্কিত নয়। তবে তা দুর্বল নিউক্লীয় বলের সঙ্গে জড়িত। দুর্বল নিউক্লীয় বল হলো কণা পদার্থবিদ্যার অপর এক শ্রেণীর ক্ষুদ্র পাল্লার মিথস্ক্রিয় (Short Range Interaction) বল।

দুর্বল নিউক্লীয় বল মুক্ত নিউট্রনের ভাঙ্গনের মতো কতিপয় তেজস্ক্রিয় ভাঙ্গন বা ক্ষয় প্রক্রিয়ার জন্য দায়ী। আরো সাধারণভাবে বলা যায়, নিউট্রিনো সংশ্লিষ্ট যে কোন বিক্রিয়ার জন্যই দুর্বল নিউক্লীয় বল দায়ী। দুর্বল নিউক্লীয় বলের নাম থেকেই ইংগিত পাওয়া যায় যে, এই বল তড়িৎ-চুম্বক বল বা প্রবল নিউক্লীয় বলের তুলনায় অনেক দুর্বল। যেমন এক মিলিয়ন ইলেকট্রন ভোল্ট শক্তিতে দুটো ইলেকট্রনের মধ্যে সংঘর্ষের সময়ে যে পরিমাণ তড়িৎ- চুম্বক বলের সৃষ্টি হয়, সেই বলের তুলনায় একই শক্তিতে (এক মিলিয়ন ইলেকট্রন ভোল্ট) একটি নিউট্রিনো ও একটি ইলেকট্রনের মধ্যে সংঘর্ষের সময়ে সৃষ্ট দুর্বল নিউক্লীয় বলের পরিমাণ হয় প্রায় এক কোটি ভাগের এক ভাগ ($১০^{-৭}$)।

দুর্বল নিউক্লীয় বলের মিথস্ক্রিয়া দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও দীর্ঘদিন ধরে এমনটি ভাবা হয়েছে যে, দুর্বল নিউক্লীয় বল এবং তড়িৎ-চুম্বক বলের মধ্যে একটি গভীর সম্পর্ক থাকতে পারে। ১৯৬৭ সালে আমি একটি ক্ষেত্র তত্ত্বের (Field Theory) প্রস্তাব করেছিলাম যা এ দুটি বলকে একীভূত করে। ১৯৬৮ সালে স্বতন্ত্রভাবে আবদুস সালাম এই দুটি বলকে একীভূত করে ফিল্ড তত্ত্বের প্রস্তাব করেন। এই তত্ত্ব একটি নতুন শ্রেণীর দুর্বল নিউক্লীয় বলের মিথস্ক্রিয়ার ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল- এ হলো তথাকথিত নিরপেক্ষ বিদ্যুৎ প্রবাহ। ১৯৭৩ সালে পরীক্ষার মাধ্যমে এই বলের অস্তিত্বের বিষয়টি নিশ্চিত করা

হয়। নতুন হ্যাড্রন -এর একটি পুরো প্রজাতি আবিষ্কৃত হবার পর ১৯৭৪ সাল থেকে এই তত্ত্ব আরো সমর্থন লাভ করে। এই ধরনের তত্ত্বের মূল ধারণাটি হলো, প্রকৃতির রয়েছে একটি অতি উচ্চমাত্রার প্রতিসাম্য- যা বিভিন্ন কণিকা ও বলসমূহকে আত্মীয়তার বন্ধনে বেঁধে রাখে। তবে সাধারণ বাস্তব ঘটনায় (Ordinary Physical Phenomena) এই বন্ধন গুপ্ত বা অস্পষ্ট থাকে। ১৯৭৩ সাল থেকে প্রবল নিউক্লীয় বলের মিথষ্ক্রিয়াকে বর্ণনা করার জন্য যে সব ক্ষেত্র তত্ত্ব ব্যবহার করা হয়, সেগুলোও একই ধরনের গাণিতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত (নন এবেলিয়ান গেজ তত্ত্ব)। অনেক পদার্থবিদ এখন বিশ্বাস করেন যে, গেজ তত্ত্ব প্রকৃতির সবগুলো বলকে, যেমন দুর্বল নিউক্লীয়, তড়িৎ-চুম্বক, প্রবল নিউক্লীয় এবং সম্ভবত মহাকর্ষ বলকে বোঝার জন্য একটি একীভূত ভিত্তি যোগাতে পারে। এই ধারণাটি একীভূত গেজতত্ত্বের একটি ধর্ম দ্বারা সমর্থিত। সালাম ও আমি প্রথমে একীভূত গেজ তত্ত্বের বিষয়ে অনুমান করি। জিরার্ড হুফট (Gerard't Hooft) ও বেনজামিন লী (Benjamin Lee) ১৯৭১ সালে প্রমাণ করেন যে, জটিল ফাইনম্যান রেখাচিত্রগুলোর সহায়ক শক্তি আপাতদৃষ্টিতে অসীম হলেও সকল বাস্তব প্রক্রিয়ার হারের ক্ষেত্রে সসীম ফলাফল প্রদান করে।

মস্কোর লেবেদেভ ফিজিক্যাল ইনস্টিটিউটের ডি,এ,কিরজনিতস (D.A.Kirzhnits) এবং এডি লিনডে (A.D.Linde) ১৯৭২ সালে আদি মহাবিশ্ব নিয়ে গবেষণার ক্ষেত্রে গেজ তত্ত্বসমূহের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি সম্পর্কে আলোকপাত করেন। এসব গেজ তত্ত্ব একটি দশা পরিবর্তন প্রদর্শন করে। এটা হলো প্রায় ৩০০০ মিলিয়ন মিলিয়ন ডিগ্রী কেলভিন ($3 \times 10^{15}K$) ক্রান্তিক তাপমাত্রায় এক রকমের 'জমে যাওয়া' বা 'ফ্রিজিং'। এই ক্রান্তিক তাপমাত্রার নীচের তাপমাত্রায় মহাবিশ্ব এখন যেমন রয়েছে তেমনই ছিল এবং দুর্বল নিউক্লীয় বলের মিথষ্ক্রিয়া দুর্বল ও ক্ষুদ্র পাল্লার ছিল। এই ক্রান্তিক তাপমাত্রার উপরের তাপমাত্রায় দুর্বল নিউক্লীয় এবং তড়িৎ-চুম্বক বলের মিথষ্ক্রিয়ার মধ্যে অপরিহার্য ঐক্য প্রদর্শিত হচ্ছিল। তড়িৎ-চুম্বক বলের মিথষ্ক্রিয়ার মত দুর্বল নিউক্লীয় বলের মিথষ্ক্রিয়া একই ধরনের ব্যস্ত বর্গসূত্র (Inverse Square Law) মেনে চলছিল এবং উভয় প্রকার বলের শক্তি ছিল প্রায় সমান।

সদৃশ হিসেবে এখানে এক গ্লাস পানি জমে বরফে পরিণত হওয়ার বিষয়টিকে আলোচনা করা যেতে পারে। হিমাংকের উপরের যে কোন তাপমাত্রায় তরল পানি উচ্চমাত্রার সমসত্ত্বতা (Homogeneity) প্রদর্শন করে। একটি গ্লাসের অভ্যন্তরের যে কোন বিন্দুতে পানির একটি অণু পাওয়ার সম্ভাবনা (গ্লাসের মধ্যস্থিত) অন্য যে কোন বিন্দুর ঠিক সমান। কিন্তু পানি যখন বরফে পরিণত হয়, তখন গ্লাসের মধ্যস্থিত স্থানে বিভিন্ন বিন্দুর এই প্রতিসাম্য (Symmetry) আংশিক ভেঙ্গে পড়ে ও বরফ স্ফটিক আকৃতি ধারণ করে এবং সন্দেহাতীতভাবে পানির অণুসমূহ কোন একটি নির্দিষ্ট ব্যবধানে স্থান দখল করে। তখন যে কোন বিন্দুতে পানির একটি অণু পাওয়ার সম্ভাবনা দাঁড়ায় প্রায় শূন্য। একইভাবে মহাবিশ্বের তাপমাত্রা কমে যখন ৩০০০ মিলিয়ন মিলিয়ন ডিগ্রীর নিচে নেমে এসে এক ধরনের হিমায়িত অবস্থার সৃষ্টি করল তখন প্রতিসাম্যটি ভেঙে পড়ল। এটা অবশ্য সমসত্ত্বতা বিষয়ক প্রতিসাম্যটি স্থানে ভেঙে পড়া নয়, বরং এটা হলো দুর্বল নিউক্লীয় বল ও বিদ্যুৎ-চুম্বক বলের মিথষ্ক্রিয়ার প্রতিসাম্য ভেঙে পড়া।

এই মিল বা তুলনাটিকে এমনকি আরো সামনে নিয়ে যাওয়া সম্ভব। আমরা সবাই জানি যে পানি জমে যখন বরফে পরিণত হয় তখন বরফ সচরাচর নিখুঁত স্ফটিকাকার ধারণ করে না। যে আকার ধারণ করে তা বরং অনেক বেশি জটিল। এই আকারটি হলো 'কেলাসিত এলাকা' (Crystal Domain)- এর এক বিরাট তালগোল পাকানো বা বিশৃঙ্খল অবস্থা এবং তা বিভিন্ন প্রকারের অনিয়মিত স্ফটিক দ্বারা বিযুক্ত (Separated)। মহাবিশ্বও কি জমে কতগুলো ডোমেইন বা অঞ্চলে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল ? আমরা কি এমন একটা ডোমেইনে বসবাস করছি, যার মধ্যে দুর্বল নিউক্লীয় বল এবং তড়িৎ-চুম্বক বলের মিথষ্ক্রিয়ার প্রতিসাম্য একটি বিশেষ পদ্ধতি বা পথে (Particular Way) ভেঙে পড়েছে এবং শেষ পর্যন্ত আমরা কি অন্যান্য 'ডোমেইনে' এই প্রতিসাম্য দেখতে পাবো?

আমাদের ভাবনা আমাদেরকে দূর অতীত মহাবিশ্বের ৩০০০ মিলিয়ন মিলিয়ন ডিগ্রী তাপমাত্রায় নিয়ে গিয়েছিল এবং আমাদেরকে প্রবল নিউক্লীয় বল, দুর্বল নিউক্লীয় বল এবং তড়িৎ-চুম্বক বলের মিথষ্ক্রিয়া নিয়ে ভাবতে হয়েছে। কিন্তু পদার্থবিদ্যার অপর একটি প্রধান শ্রেণীর বল যথা মহাকর্ষ বলের মিথষ্ক্রিয়া কি রকম ছিল ? আমাদের মহাবিশ্ব সৃষ্টির ইতিহাসে মহাকর্ষ অবশ্যই একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। কেননা এটা মহাবিশ্বের ঘনত্ব ও তার প্রসারণের হার নিয়ন্ত্রণ করে। তবে মহাকর্ষ বল আদি মহাবিশ্বের কোন অংশের অভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্যকে প্রভাবিত করেছে বলে এখনও জানা যায় নি। এর কারণ হলো মহাকর্ষ বলের চরম দুর্বলতা। যেমন একটি হাইড্রোজেন পরমাণুতে ইলেকট্রন এবং প্রোটনের মধ্যকার মহাকর্ষ বল এদের মধ্যকার তড়িৎ-চুম্বক বলের তুলনায় $১০^{৩৯}$ গুণ কম।

[মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রের মধ্যে কণিকা সৃষ্টির প্রক্রিয়ার দ্বারা মহাবিশ্ব সৃষ্টি প্রক্রিয়ায় মহাকর্ষ বলের দুর্বলতার একটি চিত্র উপস্থাপন করা হয়। উইজকনসিন (Wisconsin) বিশ্ববিদ্যালয়ের লিওনার্দ পারকার (Leonard Parkar) উল্লেখ করেন যে,মহাবিস্ফোরণের $১০^{-৪৪}$ সেকেন্ড সময় পর মহাবিশ্বের মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রের স্রোতের প্রভাব এত প্রবল ছিল যে তা শূন্যস্থান থেকে জোড়ায় জোড়ায় কণিকা ও প্রতিকণিকা সৃষ্টি করতে পারতো। তবু এই সব তাপমাত্রায় মহাকর্ষ বল তখনও এতো দুর্বল ছিল যে এভাবে যত সংখ্যক কণিকা সৃষ্টি হতো তা ছিল তাপীয় ভারসাম্যাবস্থায় ইতোমধ্যে বিদ্যমান কণিকা সংখ্যার তুলনায় নগণ্য।]

তথাপি আমরা কমপক্ষে এমন একটি সময়ের কথা ভাবতে পারি, যখন মহাকর্ষ বল উপরে আলোচিত প্রবল নিউক্লীয় বলের মিথষ্ক্রিয়ার মতই শক্তিশালী ছিল। মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র শুধু কণিকার ভরের দ্বারা সৃষ্টি হয় না, বরং তা সকল প্রকারের শক্তি দ্বারা সৃষ্টি হয়। সূর্য যদি উত্তপ্ত না হতো তা হলে পৃথিবী সূর্যের চতুর্দিকে বর্তমানে যে বেগে ঘুরছে তার চেয়ে সামান্য কমবেগে ঘুরতো। কেননা মহাকর্ষ বলের উৎসের সঙ্গে সামান্য সূর্যতাপের শক্তি যুক্ত হয়েছে। অতি উচ্চ তাপমাত্রায় ও তাপীয় ভারসাম্যাবস্থায় কণিকার শক্তি এতো প্রবল হতে পারে যে তাদের মধ্যকার মহাকর্ষ বল অন্য কোন প্রকার বলের মতই শক্তিশালী হতে পারে। আমরা হিসাব করে পাই যে প্রায় ১০০০ মিলিয়ন মিলিয়ন মিলিয়ন মিলিয়ন মিলিয়ন ($১০^{৩২}$) ডিগ্রী কেলভিন তাপমাত্রায় এরকম ধরনের একটি অবস্থা বিদ্যমান ছিল।

এই তাপমাত্রায় সব ধরনের বিচিত্র ঘটনা ঘটছিল। মহাকর্ষ বল শুধু প্রবল ছিল না এবং মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র যে প্রচুর কণিকা সৃষ্টি করতো তাও নয়। কণিকা সম্পর্কিত ধারণা তখন পর্যন্ত কোনো অর্থ বহন করতো না। তাপীয় ভারসাম্যাবস্থায় একটি প্রতিনিধিত্বমূলক কণিকার তরঙ্গদৈর্ঘ্যের চেয়ে সেই সময়ে 'দিগন্ত' ছিল নিকটতর। এখানে 'দিগন্ত' বলতে এমন একটি দূরত্ব বুঝায় যার বাইরের কোন সংকেত তখন পর্যন্ত গ্রহণ করা অসম্ভব ছিল। ঢিলেঢালা ভাবে বলা যায়, প্রত্যেকটি কণিকা ছিল প্রায় দৃশ্যমান মহাবিশ্বের মতই বৃহৎ!

এই সময়ের আগের মহাবিশ্বের ইতিহাসকে বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে অনুমান করার জন্য মহাকর্ষ বলের কোয়ান্টাম প্রকৃতি সম্পর্কে আমাদের যথেষ্ট জ্ঞান নেই। আমরা একটি স্থূল হিসাব করে বলতে পারি যে, মহাবিস্ফোরণের $১০^{-৪৩}$ সেকেন্ড পরে মহাবিশ্বের তাপমাত্রা মোটামুটি $১০^{৩২}$ ডিগ্রী কেলভিনে পৌঁছেছিল। তবে এটা যথার্থ অর্থে সুস্পষ্ট নয় যে এই হিসাবের কোন অর্থ রয়েছে কিনা। এভাবে অন্যান্য পর্দা উন্মোচিত হলেও $১০^{৩২}$ ডিগ্রী কেলভিন তাপমাত্রায় একটি অবগুণ্ঠন থেকেই যায়- যা মহাবিশ্ব সৃষ্টির একেবারে প্রথম মুহূর্তের দৃশ্যকে আমাদের কাছে এখনও অস্পষ্ট করে রাখে।

তবুও এ সব অনিশ্চয়তার কোনটিই ১৯৭৬ সালের জ্যোতির্বিজ্ঞানে তেমন কোন পরিবর্তন ঘটায় না। বিষয়টি হলো, প্রথম সেকেন্ডের পুরো সময়টিতে মহাবিশ্ব একটি তাপীয় ভারসাম্যাবস্থায় ছিল বলে অনুমান করা যায়। এই অবস্থায় সকল কণিকা, এমনকি নিউট্রিনোর সংখ্যা এবং বন্টন তাদের ইতোপূর্বে সংঘটিত ঘটনা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হয়ে পরিসংখ্যানগত বলবিদ্যার বিধি (Laws of Statistical Mechanics) দ্বারা নির্ধারিত বা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছিল। আজ আমরা যখন হিলিয়াম বা মাইক্রোওয়েভ বিকিরণ বা এমন কি নিউট্রিনোর পরিমাণ গণনা করি তখন আমরা তাপীয় ভারসাম্যাবস্থার ধ্বংসাবশেষ হিসেবেই তা পর্যবেক্ষণ করি এবং প্রথম সেকেন্ডের পরই এই তাপীয় ভারসাম্যাবস্থা বিলুপ্ত হয়। আমাদের জানা মতে ঐ সময়ের আগে সংঘটিত ঘটনাবলীর উপর নির্ভরশীল কোন কিছুই আমরা পর্যবেক্ষণ করতে পারি না। (বিশেষ করে প্রথম সেকেন্ডের আগে মহাবিশ্ব দিক- নিরপেক্ষ (Isotropic) এবং সমসত্ত্ব (Homogenous) ছিল কিনা তার উপর নির্ভরশীল, সম্ভবত পারমাণবিক কণিকা প্রতি ফোটন সংখ্যার অনুপাত ছাড়া,কোন কিছুই আমরা পর্যবেক্ষণ করি না। একমাত্র ব্যতিক্রম হলো সম্ভবত পারমাণবিক কণিকা প্রতি ফোটন সংখ্যার অনুপাত)। এটা যেন অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে তৈরি একটি ডিনার। সবচেয়ে টাটকা উপকরণসমূহ (Ingredients), সর্বাধিক সতর্কতার সঙ্গে বাছাইকৃত মসলা, সর্বোচ্চমানের মদ (Wine) নেওয়ার পর সবগুলো একত্র করে একটি বিরাট পাত্রের মধ্যে কয়েক ঘন্টা ধরে ফুটানো হলো। এই খাবার কাউকে পরিবেশন করা হলে এর উপাদান নিরূপণে সর্বাধিক সক্ষম ভোজনকারীর পক্ষেও বলা সম্ভব নয় যে তাকে কি পরিবেশন করা হয়েছে।

একটি সম্ভাব্য ব্যতিক্রমও রয়েছে। তড়িৎ-চুম্বক বলের মত মহাকর্ষ বলও তরঙ্গ আকারে ক্রিয়াশীল থাকে। মহাকর্ষ বলের অধিক পরিচিত রূপটি হলো দূরত্বে অবস্থানকারী দুটো বস্তুর মধ্যে স্থির ক্রিয়া। স্থির অবস্থায় দুটো ইলেকট্রন একে অপরকে যে স্থির বৈদ্যুতিক বলে বিকর্ষণ করে তা নির্ভর করে ইলেকট্রন দুটোর

মধ্যবর্তী দূরত্বের উপর। আমরা যদি একটি ইলেকট্রনকে নাড়াচাড়া করে সামনে পিছনে অবস্থানের পরিবর্তন করতে থাকি তাহলে অপর ইলেকট্রনটি তার উপর ক্রিয়াশীল বলের কোন পরিবর্তন ততক্ষণ পর্যন্ত বুঝতে পারবে না, যতক্ষণ অবস্থান পরিবর্তনকারী ইলেকট্রন কণিকা থেকে অবস্থান পরিবর্তনের একটি বার্তা তড়িৎ চুম্বক তরঙ্গের মাধ্যমে স্থির ইলেকট্রন কণিকার নিকট না পৌঁছে। এখানে বলার অপেক্ষা রাখে না যে এই তরঙ্গগুলো আলোর বেগে গমন করে। এ তরঙ্গগুলোও আলো, যদিও তারা অবশ্যম্ভাবীরূপে দৃশ্যমান আলো নয়। একই পদ্ধতিতে কোন দৈত্য যদি ইচ্ছা করে কু-মন্ত্রণায় সূর্যকে নাড়াচাড়া করে সামনে পিছনে এর অবস্থানের পরিবর্তন ঘটায় তাহলে আমরা পৃথিবীতে আট মিনিট পর্যন্ত এই পরিবর্তন সম্পর্কে জানতে পারবো না। কেননা আলোর বেগে একটি তরঙ্গকে সূর্য থেকে পৃথিবী পর্যন্ত পৌঁছতে এই সময় লাগবে। এটি কোন আলোক তরঙ্গ নয়- আলোক তরঙ্গ হলো একটি দোলায়মান তড়িৎ-চুম্বক ক্ষেত্রের তরঙ্গ। বরং এটি হলো মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রে দোলায়মান একটি মহাকর্ষীয় তরঙ্গ। ঠিক তড়িৎ-চুম্বক তরঙ্গের মতো, আমরা সব তরঙ্গদৈর্ঘ্যের মহাকর্ষীয় তরঙ্গকে একত্রিত করে 'মহাকর্ষীয় বিকিরণ' বলি।

তড়িৎ-চুম্বক বিকিরণ বা এমন কি নিউট্রিনোর চেয়েও মহাকর্ষীয় বিকিরণ বস্তুর সাথে অধিকতর দুর্বলভাবে মিথস্ক্রিয়া করে। (এই কারণে মহাকর্ষীয় বিকিরণের অস্তিত্বের তত্ত্বগত ভিত্তি সম্পর্কে আমরা যদিও যুক্তিসঙ্গতভাবে নিশ্চিত, তবু সর্বোচ্চ শ্রমসাধ্য প্রচেষ্টায় এই পর্যন্ত কোন উৎস থেকে মহাকর্ষীয় বিকিরণ শনাক্ত করার প্রয়াস আপাত দৃষ্টিতে ব্যর্থ হয়েছে।) ওই সময়ের আদি মহাবিশ্বের মহাকর্ষীয় বিকিরণ অন্যান্য উপাদানের সঙ্গে তাপীয় ভারসাম্যতার বাইরে চলে গিয়েছিল এবং তখনকার তাপমাত্রা ছিল ১০[৩২] ডিগ্রী কেলভিন। তখন থেকে মহাকর্ষীয় বিকিরণের কার্যকর তাপমাত্রা মহাবিশ্বের আকারের ব্যস্তানুপাতে কমছিল। এই বিধি অনুযায়ী মহাবিশ্বের অবশিষ্ট সকল বস্তুর তাপমাত্রা যেমন হ্রাস পাচ্ছিল, এটা ছিল ঠিক তেমন অবস্থা। ব্যতিক্রম শুধু কোয়ার্ক -এন্টিকোয়ার্ক এবং লেপটন-এন্টিলেপটন জোড়ায় জোড়ায় বিনাশ প্রাপ্ত হয়ে মহাবিশ্বের অবশিষ্ট সকল বস্তুর তাপমাত্রা বাড়িয়েছে- বাড়ায় নি শুধু মহাকর্ষীয় বিকিরণের তাপমাত্রা। অতএব আজকের মহাবিশ্ব (নিউট্রিনো বা ফোটনের মত) মহাকর্ষীয় বিকিরণে পূর্ণ হওয়া উচিত। এই বিকিরণের তাপমাত্রা নিউট্রিনো বা ফোটনের তাপমাত্রার চেয়ে সামান্য কিছুটা কম হবে- সম্ভবত প্রায় ১° K। এই বিকিরণ যদি শনাক্ত করা যেত তাহলে মহাবিশ্বের ইতিহাসের একেবারে প্রথম মুহূর্তের প্রতিনিধি হিসেবে তা হতো সরাসরি পর্যবেক্ষণ। এমন কি আজকের দিনের তত্ত্বগত পদার্থবিদ্যার প্রত্যাশাও তাই। দুঃখজনক এই যে ১° K তাপমাত্রার মহাকর্ষীয় পটভূমি বিকিরণ নিকট ভবিষ্যতে শনাক্ত করতে পারার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা রয়েছে বলে মনে হয় না।

অত্যন্ত অনুমানমূলক তত্ত্বের সাহায্যে গণনা করে আমরা মহাবিশ্বের ইতিহাসের দূর অতীতে যেতে সক্ষম- যে মুহূর্তে মহাবিশ্বের ঘনত্ব ছিল অসীম। কিন্তু এটা আমাদেরকে তৃপ্তি দেয় না। আমরা স্বাভাবিকভাবেই জানতে চাই, এই মুহূর্তের আগে অর্থাৎ যে মুহূর্তে মহাবিশ্ব প্রসারিত ও শীতল হতে শুরু করল, তার আগে কি অবস্থা বিদ্যমান ছিল?

একটা সম্ভাবনা হলো মহাবিশ্ব কখনও অসীম ঘনত্বাবস্থায় ছিল না। পূর্ববর্তী সংকোচনের একেবারে শেষ মুহূর্তে মহাবিশ্বের বর্তমান প্রসারণ শুরু হতে পারে। মহাবিশ্বের ঘনত্ব তখন অত্যন্ত উচ্চ কোন মানে পৌঁছেছিল- তবে একটি সসীম মানে। পরবর্তী অধ্যায়ে এই সম্ভাবনা সম্পর্কে আমি আরো কিছু আলোচনা করবো।

অন্তত যুক্তির দিক থেকে একটা সূচনা (Begining) থাকা সম্ভব- যদিও আমরা জানি না যে সত্যিই তা ছিল কি না এবং ঐ মুহূর্তের আগে 'সময়' বা 'কাল' কোন অর্থ বহন করে কি না। আমরা সবাই পরমশূন্য তাপমাত্রার ধারণার সঙ্গে পরিচিত। - ২৭৩.১৬° C তাপমাত্রার নীচে কোন কিছুকে শীতল করা অসম্ভব। এর কারণ এই নয় যে এই কাজটি অত্যন্ত কঠিন বা কেউ এখনও অত্যন্ত শক্তিশালী রেফ্রিজারেটর যন্ত্র তৈরি করার কথা ভাবে নি। কারণটি হলো তাপমাত্রা পরম শূন্যের নিচে- এ কথার কোন মানে বা অর্থ নেই। কিছুতেই আমরা শূন্য তাপের চেয়ে কম তাপ পেতে পারি না। একই ভাবে আমরা 'পরম শূন্য সময়ের' একটি ধারণার সঙ্গে অভ্যস্ত হতে পারি। পরমশূন্য সময়ের আগের কোন মুহূর্তকে কারণ এবং ফলাফলের শৃঙ্খল দ্বারা শনাক্ত করা নীতিগতভাবে অসম্ভব। প্রশ্নটি উন্মুক্ত এবং সব সময়েই উন্মুক্ত থাকতে পারে।

আদি মহাবিশ্বের প্রথম মুহূর্ত সম্পর্কে এসব অনুমান থেকে আমার কাছে সবচেয়ে সন্তোষজনক যে বিষয়টি বেরিয়ে এসেছে তা হলো মহাবিশ্বের ইতিহাস ও তার যৌক্তিক কাঠামোর সম্ভাব্য তুলনা। প্রকৃতি এখন কণিকার শ্রেণী ও মিথস্ক্রিয়ায় শ্রেণীর মধ্যে ব্যাপক বহুমুখিতা প্রদর্শন করে। তবুও আমরা এই বহুমুখিতার গভীরে তাকাতে শিখেছি। শিখেছি একটি সরল একীভূত গেজ তত্ত্বের আলোকে কিভাবে বিভিন্ন কণিকা এবং মিথস্ক্রিয়া পর্যবেক্ষণের প্রচেষ্টা চালাতে হয়। বর্তমান মহাবিশ্ব এতো শীতল যে বিভিন্ন কণিকা ও মিথস্ক্রিয়ার মধ্যকার প্রতিসাম্য এক ধরনের জমাটবদ্ধতার কারণে বিলুপ্ত হয়েছে। সাধারণ ঘটনায় প্রতিসাম্য প্রদর্শিত হয় না। কিন্তু আমাদের 'গেজ ফিল্ড তত্ত্বে' তাদেরকে গাণিতিকভাবে প্রকাশ করতে হবে। গণিত শাস্ত্রের মাধ্যমে আমরা আজ অতীতের বিভিন্ন অবস্থা নির্ণয় করি। অথচ আদি মহাবিশ্বে তাপই এসব অবস্থার সৃষ্টি করছিল। বাস্তব ঘটনায় সরাসরি প্রদর্শিত হচ্ছিল প্রকৃতির অপরিহার্য সরলতা। তবে তা প্রত্যক্ষ করার জন্য কেউ সেখানে উপস্থিত ছিল না।

শেষ সংলাপ: আগামী দিনের সম্ভাবনা
Epilogue : The Prospect Ahead

আরো কিছু সময় ধরে মহাবিশ্ব নিশ্চিতভাবে প্রসারিত হতে থাকবে। তারপর এর ভাগ্যে কি ঘটবে সেই সম্পর্কে স্ট্যান্ডার্ড মডেলের ভবিষ্যদ্বাণী দ্ব্যর্থবোধক। সম্পূর্ণ নির্ভর করে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা দেখেছি যে মহাজাগতিক ঘনত্ব যদি একটি ক্রান্তিক মানের চেয়ে কম হয়, তাহলে বর্তমান মহাবিশ্বের আয়তন অসীম এবং এটা অনন্তকাল ধরে প্রসারিত হতে থাকবে। আমাদের উত্তরসূরী হিসেবে তখন যদি কেউ বেঁচে থাকে তাহলে দেখতে পাবে যে, নক্ষত্রসমূহে তাপ পারমাণবিক বিক্রিয়া ধীরে ধীরে শেষ হয়ে আসছে। নক্ষত্রগুলো অবশেষ হিসেবে পিছনে রেখে যাবে বিভিন্ন ধরনের ভস্ম (Cinder)- যেমন কালো বামন তারা, নিউট্রন তারা, সম্ভবত কৃষ্ণগহ্বর। গ্রহগুলো তাদের কক্ষপথে চলমান থাকতে পারে, তবে তাদের গতি কিছুটা শ্লথ হয়ে আসবে। কেননা তারা মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রের তরঙ্গ বিকিরণ করে। কিন্তু কোন সসীম সময়ে তারা স্থির অবস্থান গ্রহণ করবে না। মহাজাগতিক পটভূমি বিকিরণ এবং নিউট্রিনোর তাপমাত্রা হ্রাস পেতেই থাকবে এবং মহাবিশ্বের আকারের ব্যস্তানুপাতে তা হ্রাস পেতে থাকবে। তবে এই বিকিরণ হারিয়ে যাবে না। যদিও আমরা এখন নামমাত্র ৩° K তাপমাত্রার মাইক্রোওয়েভ পটভূমি বিকিরণ শনাক্ত করতে পারি।

অপরপক্ষে মহাজাগতিক ঘনত্ব যদি একটি ক্রান্তিক মানের চেয়ে বেশি হয়, তাহলে বর্তমান মহাবিশ্বের আয়তন সসীম এবং শেষ পর্যন্ত এর প্রসারণ বন্ধ হয়ে যাবে। ফলে ত্বরান্বিত সংকোচনের প্রক্রিয়া সৃষ্টি হবে। উদাহরণস্বরূপ মহাজাগতিক ঘনত্ব যদি এর ক্রান্তিক মানের দ্বিগুণ হয় এবং হাবল ধ্রুবকের বর্তমান প্রচলিত মান (প্রতি সেকেন্ডে প্রতি মিলিয়ন আলোকবর্ষে ১৫ কি.মি.) যদি শুদ্ধ হয়, তাহলে মহাবিশ্বের বর্তমান বয়স দাড়ায় ১০০০ কোটি বছর। সে ক্ষেত্রে মহাবিশ্ব আরো ৫০০০ কোটি বছর পর্যন্ত প্রসারিত হতে থাকবে এবং তারপর শুরু হবে সংকোচন। সংকোচন হলো প্রসারণের ঠিক পিছন দিকে দৌড়ানো। ৫০০০ কোটি বছর পর মহাবিশ্ব এর বর্তমান আকার ফিরে পাবে এবং আরো ১০০০ কোটি বছর পর এটা অসীম ঘনত্বের অনন্য (Singular) অবস্থা ধারণ করবে।

সংকোচন পর্যায়ের প্রাথমিক স্তরে জ্যোতির্বিদগণ (যদি কেউ থাকেন) লালসরণ এবং নীলসরণ উভয়ই দেখে মজা পাবেন। নিকটবর্তী গ্যালাক্সীসমূহ থেকে নিঃসৃত আলো

যখন দেখা যাবে তখন মহাবিশ্বের আকার হবে যে সময়ে গ্যালাক্সী থেকে আলো নি:সৃত হয়েছে সেই সময়ের আকার অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর। তাই আলোক বর্ণালীর ক্ষুদ্রতর তরঙ্গদৈর্ঘ্যের প্রান্তে সরে যেতে দেখা যাবে। অর্থাৎ সরণ হবে নীলের দিকে। অপরপক্ষে একেবারে দূরবর্তী বস্তু থেকে আলো এমন এক সময়ে নিঃসৃত হয়ে থাকবে, যখন পর্যন্ত মহাবিশ্ব তার প্রসারণের প্রাথমিক পর্যায়ে ছিল এবং যখন মহাবিশ্বের আকার আলো দেখতে পাওয়ার সময়ের আকার অপেক্ষা ছোট ছিল। তাই যখন আলো দেখা যাবে তখন আলো বর্ণালীর বৃহত্তর তরঙ্গদৈর্ঘ্যের প্রান্তে সরে যাবে অর্থাৎ লালের দিকে সরণ হবে।

মহাবিশ্বের প্রসারণ ও সংকোচনের সঙ্গে সঙ্গে ফোটন এবং নিউট্রিনোর মহাজাগতিক পটভূমি বিকিরণের তাপমাত্রা যথাক্রমে কমবে এবং তারপর বাড়তে থাকবে। মহাবিশ্বের আকারের ব্যস্তানুপাতে পটভূমি বিকিরণের এই তাপমাত্রা সবসময় পরিবর্তিত হবে। এখনকার মহাজাগতিক ঘনত্ব যদি ক্রান্তিক মানের দ্বিগুণ হয় তাহলে আমাদের গণনা অনুযায়ী মহাবিশ্বের সর্বোচ্চ প্রসারণ হবে বর্তমান আকারের দ্বিগুণ। তাই তখনকার মাইক্রোওয়েভ পটভূমি বিকিরণের তাপমাত্রা হবে বর্তমান ৩° K তাপমাত্রার অর্ধেক অর্থাৎ প্রায় ১.৫° K। তারপর মহাবিশ্বের সংকোচন শুরু হবে এবং তাপমাত্রা বাড়তে শুরু করবে।

প্রথম দিকে কোন সতর্কতা সংকেত শুনতে পাওয়া যাবে না। হাজার হাজার মিলিয়ন বছর ধরে পটভূমি বিকিরণের তাপমাত্রা কমে এত শীতল হবে যে তাকে শুধু শনাক্ত করতেই বিরাট প্রচেষ্টার প্রয়োজন হবে। তবে পুনরায় সংকুচিত হয়ে মহাবিশ্ব যদি বর্তমান আকারের এক শতাংশ আকার ধারণ করে তাহলে পটভূমি বিকিরণ আকাশকে শাসন (Dominate) করতে শুরু করবে। রাতের আকাশের তাপমাত্রা হবে ৩০০° K, এখনকার দিনের আকাশের তাপমাত্রার মতো। সাত কোটি বছর পর মহাবিশ্ব আরো দশগুণ সংকুচিত হবে। আমাদের কোন উত্তরাধিকারী বা প্রতিনিধি যদি বেঁচে থাকে তাহলে দেখতে পাবেন যে আকাশ অসহ্য রকম উজ্জ্বল। গ্রহ ও নক্ষত্রের আবহাওয়া মন্ডলের এবং আন্তনাক্ষত্রিক স্থানের অণুগুলো তাদের গঠনকারী পরমাণুতে বিচ্ছিন্ন হতে শুরু করবে এবং পরমাণুগুলো মুক্ত ইলেকট্রন ও পরমাণুর নিউক্লিয়াসরূপে পৃথক হয়ে পড়বে। আরো সাত লক্ষ বছর পর মহাজাগতিক তাপমাত্রা ১০ মিলিয়ন ডিগ্রীতে পৌঁছবে। তখন নক্ষত্র ও গ্রহসমূহ নিজে নিজে গলে বিকিরণ ইলেকট্রন এবং নিউক্লিয়াসের মহাজাগতিক স্যুপ তৈরি করবে। আরো ২২ দিন পর তাপমাত্রা পৌঁছবে দশ হাজার মিলিয়ন ডিগ্রী কেলভিনে। তখন নিউক্লিয়াস তার উপাদান প্রোটন এবং নিউট্রনে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। ফলে নাক্ষত্রিক ও সৃষ্টিতাত্ত্বিক উভয় প্রকার পারমাণবিক সংশ্লেষণ বন্ধ হয়ে যাবে। এর অল্প পরেই ফোটনের সঙ্গে ফোটনের সংঘর্ষে বিপুল সংখ্যক ইলেকট্রন এবং পজিট্রন সৃষ্ট হতে থাকবে এবং নিউট্রিনো ও এন্ট্রিনিউট্রিনো মহাবিশ্বের বাকী অংশের সঙ্গে পুনরায় তাপীয় ভারসাম্যাবস্থা সৃষ্টি করবে।

আসলে কি আমরা এই দুঃখজনক (Sad) ইতিহাসকে পুরোপুরি (All the Way) এর শেষ প্রান্তে অর্থাৎ অসীম ঘনত্ব ও অসীম তাপমাত্রার অবস্থায় নিয়ে যেতে পারি? তাপমাত্রা এক হাজার মিলিয়ন ডিগ্রীতে পৌঁছার তিন মিনিট পর সময়কে কি

বাস্তবিকই থেমে যেতে হয় ? পরিষ্কার করেই বলতে হয় যে আমরা নিশ্চিত হতে পারি না। প্রথম এক শতাংশ সেকেন্ডের ঘটনাবলী অনুসন্ধানের চেষ্টা করতে গিয়ে পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা যে সব অনিশ্চয়তার মুখোমুখি হয়েছি , সর্বশেষ এক সেকেন্ডের ঘটনাবলীর দিকে তাকালে সেসব অনিশ্চয়তা হতবুদ্ধির কারণ হয়ে আমাদের নিকট ফিরে আসে। সর্বোপরি এক শত মিলিয়ন মিলিয়ন মিলিয়ন মিলিয়ন ডিগ্রী (10^{32} K) তাপমাত্রার উপরের সম্পূর্ণ মহাবিশ্বকে অবশ্যই কোয়ান্টাম বলবিদ্যার ভাষায় বর্ণনা করতে হবে। তখন কি ঘটে সেই সম্পর্কে কারো কোন ধারণা নেই। আবার মহাবিশ্ব যদি দিক- নিরপেক্ষ এবং সুসম না হয় তাহলে কোয়ান্টাম সৃষ্টিতত্ত্বের সমস্যাবলীতে পৌঁছার অনেক আগেই আমাদের পুরো কাহিনী বা বর্ণনা তার বৈধতা হারাতে পারে।

এই সব অনিশ্চয়তা থেকে কোন কোন সৃষ্টিতত্ত্ববিদ এক ধরনের ভরসা খুঁজে পান। এমনও হতে পারে যে মহাবিশ্ব এক প্রকারের মহাজাগতিক 'বাউন্স' প্রত্যক্ষ করবে এবং পুনরায় প্রসারিত হতে শুরু করবে। ইয়ংগার এড্ডা গল্পে আমরা দেখেছি যে রাগনোরাকে (Ragnorak) দেবতা এবং দৈত্যের মধ্যে সংঘটিত চূড়ান্ত যুদ্ধের পর অগ্নি এবং পানি দ্বারা পৃথিবী বিলুপ্ত হয়। কিন্তু (আবার) পানি সরে যায়, স্বর্গ থেকে থরের (Thor) পুত্ররা তাদের পিতার হাতুড়ি নিয়ে আসে এবং আর একবার পুরো পৃথিবীর যাত্রা শুরু হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের যদি পুনরায় প্রসারণ ঘটে তাহলে এর প্রসারণ পুনরায় শ্লথ হয়ে একেবারে থেমে যাবে এবং পরবর্তীতে আবার সংকোচন ঘটবে এবং তার সমাপ্তি ঘটবে রাগনোরাকের যুদ্ধের মতো। তারপর? তারপর আবার অপর একটি বাউন্স বা বিস্ফোরণ। চিরকাল এমনটি ঘটতেই থাকবে।

এই যদি হয় আমাদের ভবিষ্যত তা হলে অনুমেয়ভাবে এটাই হলো আমাদের অতীত। বর্তমান প্রসারমান মহাবিশ্ব হলো সর্বশেষ সংকোচন ও বিস্ফোরণ বা বাউন্সের একটি পর্যায়। (বস্তুত ১৯৬৫ সালে ডিক, পিবল্‌স, রোল এবং উইলকিনসন মহাজাগতিক পটভূমি বিকিরণের উপর লিখিত প্রবন্ধে এই অনুমান ব্যক্ত করেন যে, মহাবিশ্ব অতীতে একটি মহাজাগতিক প্রসারণ এবং সংকোচনের সম্পূর্ণ পর্যায় সম্পন্ন করেছে এবং তারা এই যুক্তি দেখান যে, এর তাপমাত্রা কমপক্ষে দশ হাজার মিলিয়ন ডিগ্রীতে উঠেছিল। যার ফলে পূর্ববর্তী চক্রে সৃষ্ট ভারী কণিকাসমূহ ভেঙে গিয়েছিল।) কোন কোন সৃষ্টিতাত্ত্বিক দর্শনগত দৃষ্টিকোণ থেকে স্পন্দনশীল (Oscillating) মডেলকে অধিকতর পছন্দ করেন। এর বিশেষ কারণ হলো স্থিতাবস্থা মডেলের মতো এটাও 'প্রারম্ভিক বিন্দুর' (Genesis) সমস্যাকে সুন্দরভাবে এড়িয়ে চলে। তবু এটি একটি গুরুতর তত্ত্বগত সমস্যার সম্মুখীন হয়। মহাবিশ্ব যখন প্রসারিত ও সংকুচিত হয়, তখন এর প্রত্যেকটি চক্রে (Cycle) এক ধরনের ঘর্ষণ (বালক ভিসকোসিটি নামে পরিচিত) দ্বারা পারমাণবিক কণিকা প্রতি ফোটন সংখ্যা কিছুটা বৃদ্ধি পায়।

যতটুকু আমরা জানি সেক্ষেত্রে মহাবিশ্বের প্রত্যেকটি নতুন চক্রের শুরুতে পারমাণবিক কণিকা প্রতি ফোটন সংখ্যার অনুপাত সামান্য কিছুটা বেশি হয়ে থাকবে। ঠিক এ সময়ে এই অনুপাতটি বিরাট কিন্তু অসীম নহে। তাই এমনটি ভাবা কঠিন যে তাহলে কিভাবে মহাবিশ্ব অতীতে অসীম সংখ্যক চক্র অতিক্রম করে এসেছে।

তবু এই সব সমস্যার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যেতে পারে। তবে কোন সৃষ্টিতাত্ত্বিক মডেলটি সঠিক বলে প্রমাণিত হবে সেই বিষয়ে যথেষ্ট অস্বস্তি রয়েছে। আমাদের পক্ষে এমনটি বিশ্বাস করা কঠিন যে মহাবিশ্বের সঙ্গে মানুষের (বা আমাদের) বিশেষ কোন সম্পর্ক নেই। অথবা এটাও বিশ্বাস করা প্রায় অসম্ভব যে মানব জীবন হলো দূর অতীতের প্রথম তিন মিনিটের শৃঙ্খলাবদ্ধ দুর্ঘটনার মোটামুটি ও প্রহসনমূলক ফলাফল। বরং এটাই বিশ্বাস করা স্বাভাবিক যে শুরু থেকেই কোন না কোন ভাবে আমাদের সৃষ্টি হয়েছিল।

আমি অভ্যন্তরীণ ফ্লাইটে সানফ্রানসিসকো থেকে বোষ্টনে যাবার পথে এই নিবন্ধটি লিখছিলাম। প্লেনটি ত্রিশ হাজার ফুট উচ্চতায় উড়ে তখন ওয়েমিং এর উপর দিয়ে যাচ্ছিল। প্লেন থেকে নিচের পৃথিবীকে তখন অত্যন্ত কোমল ও আয়েশী দেখাচ্ছিল। এখানে সেখানে উড়ছিল তুলতুলে মেঘ। সূর্য অস্ত যাবার সঙ্গে সঙ্গে তুষার গোলাপী বর্ণ ধারণ করেছিল। সড়কগুলো দেশের এক শহর থেকে অন্য শহরে সোজাসুজি বিস্তৃত। অনুধাবন করা অত্যন্ত কঠিন যে বর্তমান মহাবিশ্ব এক অবর্ণনীয় ও অপরিচিত আদি অবস্থা থেকে বিবর্তনের মধ্য দিয়ে এসেছে এবং এই মহাবিশ্বকে ভবিষ্যতে সীমাহীন শৈত্য বা অসহ্য গরমের মধ্য দিয়ে বিলয়ের সম্মুখীন হতে হবে। মহাবিশ্বকে যতই অনুধাবন করার ক্ষমতাসম্পন্ন বলে মনে হচ্ছে, ততই একে অর্থহীন বলেও মনে হয়।'

কিন্তু আমাদের গবেষণার ফলাফলে যদি কোন সন্তুষ্টি নাও থাকে তাহলেও গবেষণার মধ্যেই ন্যূনপক্ষে কিছু শান্ত্বনা থাকে। শুধু দেবতা ও দৈত্যের গল্পই মানুষকে পরিতৃপ্ত করে না বা মানুষ তার ভাবনাকে নিজের জীবনের দৈনন্দিন ঘটনাবলীর মধ্যে সীমিত রাখে না। বরং মানুষ টেলিস্কোপ, স্যাটেলাইট বা এক্সিলারেটর তৈরি করে। তারা তাদের সংগৃহীত উপাত্তের অন্তর্নিহিত অর্থ বের করার জন্য ঘন্টার পর ঘন্টা তাদের টেবিলে বসে কাজ করে। স্বল্প সংখ্যক যে কয়টি বিষয় মানব জীবনকে হাস্যকর ঘটনাবলীর স্তর থেকে সামান্য উপরে উন্নীত করেছে তার মধ্যে একটি হলো মহাবিশ্বকে উপলব্ধি করার প্রচেষ্টা। তবে এই প্রচেষ্টায় কিছুটা বিষাদের ছোঁয়াও রয়েছে।

'এ অনুচ্ছেদে উইনবার্গের মনের আসল ভাবটি সঠিকভাবে প্রতিফলিত হয়েছে কিনা সে বিষয়ে আমার কিছুটা সংশয় ও অস্বস্তি ছিল। এই একটি আবেগপ্রবণ মন্তব্যের জন্য উইনবার্গকে যে কি বিড়ম্বনার মুখোমুখি হতে হয়েছে বা হচ্ছে তার বিবরণ পাই তার, 'ড্রিমস অফ এ ফাইনাল থিয়োরী' বইয়ে। এই বইয়ে (পৃষ্ঠা ২০৪) তিনি লিখেন, 'In my 1977 book, The First Three Minutes, I was rash enough to remark that ' the more the universe seems comprehensible, the more it seems pointless.' I did not mean that science teaches us that the universe is pointless, but rather that the universe itself suggests no point. I hastened to add that there were ways that we ourselves could invent a point for our lives, including trying to understand the universe. But the damage was done: that phrase has dogged me ever since. Recently Alan Lightman and Roberta Brawer published interviews with twenty-seven cosmologists and physicists, most of whom had been asked at the end of their interview what they thought of that remark. With various qualifications, ten of the interviewees agreed with me and thirteen did not.

but of those thirteen three disagreed because they did not see why anyone would expect the universe to have a point. The Harvard astronomer Margaret Geller asked,'.... Why should it have a point ? What point ? It's just a physical system, what point is there ? I've always been puzzled by that statement.' The Princeton astrophysicist Jim Peebles remarked, 'I'm willing to believe that we are flotsam and jetsam.' (Peebles also guessed that I had had a bad day.) Another Princeton astrophysicist Edwin Turner, agreed with me but suspected that I had intended the remark to annoy the reader. My favorite response was that of my colleague at the University of Texas, the astronomer Gerard de Vaucouleurs. He said that he thought my remark was 'nostalgic.' Indeed it was- nostalgic for a world in which the heavens declared the glory of God.

সৃষ্টি তত্ত্বের অগ্রগতি ঃ ১৯৭৭ সালের পর

After word : Cosmology since 1977

'The First Three Minutes' বইটি ষোল বছর আগে প্রথম প্রকাশিত হয়েছে। তারপর বিগত ষোল বছরে মহাবিশ্বের প্রসারণ শতকরা তের শত মিলিয়ন ভাগের এক ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। অথবা সম্ভবত শতকরা ছয় দশমিক পাঁচ মিলিয়ন ভাগের এক ভাগ মাত্র বৃদ্ধি পেয়েছে। এই দুটো সংখ্যার পার্থক্য মহাবিশ্বের প্রসারণের হার সম্পর্কে আমাদের অব্যাহত অনিশ্চয়তাকেই নির্দেশ করে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে ইতোমধ্যেই আলোচনা করা হয়েছে যে প্রসারণের এই হারকে মহাবিশ্ব সৃষ্টিতত্ত্বের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সংখ্যাসূচক বৈশিষ্ট্য বা ধ্রুবক (Parameter) দ্বারা প্রকাশ করা হয়। একে বলা হয় 'হাবল ধ্রুবক' (Hubble Constant)। আমরা যখন দূরবর্তী এবং অধিক দূরবর্তী গ্যালাক্সীসমূহের দিকে দৃষ্টিপাত করি তখন সেগুলোর (দূরবর্তী গ্যালাক্সীর) দূরাপসরণের গতির হার কতটুকু বৃদ্ধি পায় তা পর্যবেক্ষণ করে হাবল ধ্রুবকের মান নিরূপণ করতে পারি। নভোপদার্থবিদগণ তাদের পরিমাপকৃত হাবল ধ্রুবকের মানের যে শুদ্ধতা দাবী করেন সময়ের সাথে সাথে তার ধারাবাহিক (Steady) উন্নতি ঘটেছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে হাবল ধ্রুবকের মান দাবীকৃত অনিশ্চয়তা থেকে অব্যাহতভাবে বেশি থেকে যাচ্ছে। একটি গ্রুপের পরিমাপ অনুযায়ী প্রতি মেগাপারসেক দূরত্ব বৃদ্ধির ক্ষেত্রে প্রায় ৮০ কি.মি. / সেকেন্ড গতি বৃদ্ধি পায়। অপর একটি গ্রুপের পরিমাপ অনুযায়ী প্রতি মেগাপারসেক দূরত্ব বৃদ্ধির জন্য গতি বৃদ্ধি পায় প্রায় ৪০ কি.মি./ সেকেন্ড। তাহলে মহাবিশ্বের দূরাপসরণের যে দুটো মান আমরা পাই তার একটি অপরটির দ্বিগুণ। অর্থাৎ অনিশ্চয়তার উৎপাদক (Factor) হচ্ছে দুই।

দূরবর্তী গ্যালাক্সীসমূহের গতি নির্ধারণ করা কোন সমস্যা নয়। দূরবর্তী গ্যালাক্সী থেকে আগত আলো বর্ণালীর লাল প্রান্তে সরে যায়। আলোক রশ্মির এই সরণ পরিমাপ করে বেশ সহজেই এই গতি নির্ণয় করা যায়। গ্যালাক্সীসমূহের দূরত্ব নির্ণয় করা সব সময়েই একটি সমস্যা। অতীতে একই স্বকীয় প্রভা (Intrinsic Luminosity) সম্পন্ন কয়েক শ্রেণীর বস্তুর আপাত প্রভা (Apparent Luminosity) পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে গ্যালাক্সীর দূরত্ব নির্ণয় করা হতো। এসব বস্তুর মধ্যে রয়েছে উজ্জ্বলতম নক্ষত্র বা একটি নির্দিষ্ট শ্রেণীর গ্যালাক্সীর মধ্যে বটিকাকার (Globular) গুচ্ছ বা কোন ধরনের সুপারনোভা। যে গ্যালাক্সী যত বেশি অনুজ্জ্বল দেখায় , তার অবস্থান তত বেশি দূরে বলে মনে করা হয়। সাম্প্রতিক দিনগুলোতে এসব পদ্ধতির উৎকর্ষের জন্য ক্রমবর্ধমানভাবে আরো কিছু বিষয় এর সঙ্গে যুক্ত করা

হয়েছে। তাহলো পুরো গ্যালাক্সীর বৈশিষ্ট্য বা ধর্ম পর্যবেক্ষণ করা। এক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট গ্যালাক্সীর স্বকীয় প্রভার সঙ্গে তার পর্যবেক্ষণকৃত অভ্যন্তরীণ ধর্মের সমন্বয় করা হয়। অভ্যন্তরীণ ধর্মের মধ্যে রয়েছে গ্যালাক্সীর মধ্যকার নক্ষত্রসমূহের ও গ্যাসীয় মেঘের গতি। গ্যালাক্সীর মধ্যে সুপারনোভার বিস্ফোরণ ঘটে থাকে। সুপারনোভার আপাত আকার ব্যবহার করেও যে গ্যালাক্সীতে সুপারনোভার বিস্ফোরণ ঘটে, সেই গ্যালাক্সীর দূরত্ব নির্ণয় করা হচ্ছে। তবুও 'হাবল ধ্রুবকের' যে সব মান পাওয়া যাচ্ছে তার একটি অপরটি থেকে আলাদা হচ্ছে। আশা করা হয়েছিল যে হাবল স্পেস টেলিস্কোপের পর্যবেক্ষণ থেকে এই ধ্রুপদী সমস্যাটির সমাধান হবে। হাবল স্পেস টেলিস্কোপ হলো একটি বিরাট কৃত্রিম উপগ্রহ বা স্যাটেলাইট বাহিত যন্ত্র। অনেক মূল্যবান তথ্যই এই টেলিস্কোপের মাধ্যমে জানা গেছে। তবু দুর্ভাগ্যক্রমে টেলিস্কোপের অতিরিক্ত কম্পন ও আয়নার বিকৃতির কারণে গ্যালাক্সীসমূহের দূরত্ব নিখুত ভাবে পরিমাপ করা সম্ভব হয় নি।

এসব অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও আমাদের মহাবিশ্বের স্ট্যান্ডার্ড মডেলের 'মহাবিস্ফোরণ' চিত্র উত্তরোত্তর সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। একটি কারণে মহাজাগতিক তত্ত্ব সূত্রের স্বপক্ষে এখন তুলনামূলক অনেক ভাল প্রমাণ রয়েছে। মহাজাগতিক তত্ত্বের সূত্র হলো গুরুত্বপূর্ণ বা প্রধান অনুমান (Key-Assumption) - যা একটি স্বীকৃত (স্ট্যান্ডার্ড) মহাবিশ্ব সৃষ্টিতাত্ত্বিক তত্ত্বের (Cosmological Theory) রূপরেখা প্রদান করে। এই বিষয়টি দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এই অনুমান অনুযায়ী মহাবিশ্বের অনেক বিরাট দূরত্বের মধ্যে গড় করা হলে বস্তুর যে বণ্টন পাওয়া যাবে তা হবে সমরূপ (Uniform) অর্থাৎ সুসম ও দিক-নিরপেক্ষ। গ্যালাক্সীসমূহের বণ্টনের দিকে তাকালে কিছুক্ষণের জন্য মনে হয় যে অধিক এবং অধিকতর পরিমাণে অসমরূপতা রয়েছে। দেখা যাবে মস্ত দেয়াল, বিশাল শূন্যতা, বিরাট আকর্ষক এবং আরো কত কি। কিন্তু এখন এটা প্রতীয়মান হয় যে, মহাবিশ্বের যত বেশি বিশাল দূরত্বের উপর গড় করা হয় মহাবিশ্বে গ্যালাক্সীর বণ্টন তত বেশি সুসম মনে হয়। যেমন প্রায় ৪০,০০০ কি.মি. / সেকেন্ড আপেক্ষিক বেগের আনুষঙ্গিক দূরত্বের ক্ষেত্রে গড় করা হলে মহাবিশ্বে গ্যালাক্সীর সুসম বণ্টন লক্ষ্য করা যায়। (হাবল ধ্রুবক যদি প্রতি সেকেন্ডে প্রতি মেগাপারসেকে ৮০ কি.মি. দাঁড়ায় তাহলে এই দূরত্ব হয় ৫০০ মেগাপারসেক বা প্রায় ১.৫ বিলিয়ন আলোকবর্ষ)। মহাজাগতিক তত্ত্বের সূত্র- এর পক্ষে আরো একটি বড় প্রমাণ এই যে আমাদের নিকট বহুদূর থেকে আগত, এমনকি ৫০০ মেগাপারসেকের চেয়ে অধিক দূরত্ব থেকে আগত উচ্চ শক্তির মহাজাগতিক এক্স-রশ্মির তীব্রতা সবদিকে সমান বলে মনে হয়।

কিন্তু 'মহাবিস্ফোরণ' ভিত্তিক সৃষ্টিতত্ত্বের পক্ষে সবচেয়ে শক্তিশালী সমর্থন এলো ১৯৬৫ সালে আবিষ্কৃত মহাজাগতিক মাইক্রোওয়েভ পটভূমি বিকিরণের পরিমাপ থেকে। সম্প্রতি এসব পারিমাপের শুদ্ধতা নাটকীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই মহাজাগতিক বিকিরণ বাস্তবিকই যদি আদি মহাবিশ্ব থেকে অবশেষ হিসেবে টিকে থাকে, সে ক্ষেত্রে তরঙ্গদৈর্ঘ্যের উপর বিকিরণের নির্ভরতার বিষয়টি একটি সুপরিচিত বণ্টনসূত্র মেনে চলে। এই সূত্রটি তৃতীয় অধ্যায়ের সপ্তম চিত্রে দেখানো হয়েছে। একটি উত্তপ্ত কৃষ্ণবস্তু থেকে বিভিন্ন তরঙ্গদৈর্ঘ্যে নির্গত বিকিরণের তীব্রতা এই বিধি

মেনে চলে। ১৯৬৫ সালের পর থেকে সময়ে সময়ে এই মর্মে খবর পাওয়া যায় যে, উত্তপ্ত কৃষ্ণকায়া বস্তু থেকে বিভিন্ন তরঙ্গদৈর্ঘ্যে নির্গত বিকিরণের তীব্রতা (৭ নং চিত্রে প্রদর্শিত) কৃষ্ণকায়া বল্টনসূত্র কড়াকড়িভাবে মেনে চলে না। এই ব্যতিক্রমের আসল কারণ সৃষ্টিতাত্ত্বিক, না কি শুধু পৃথিবীর বায়ুমন্ডলের বিকিরণের প্রভাবজনিত, তা কেউ বলতে পারল না। পরে ১৯৮৯ সালের ১৮ নভেম্বর একটি ডেল্টা রকেটের মাধ্যমে পৃথিবীর বায়ুমন্ডলের উপরের স্তরে কসমিক ব্যাকগ্রাউন্ড এক্সপ্লোরার (COBE) উপগ্রহ উৎক্ষেপণ করা হয়। ('The First Three Minutes' বইটি প্রকাশনার জন্য ১৯৭৭ সালে যখন প্রেসে পাঠানো হচ্ছিল তখন আমি কসমিক ব্যাকগ্রাউন্ড এক্সপ্লোরার স্যাটেলাইট নিউজলেটারের প্রথম সংখ্যায় জানতে পারি যে, এই উপগ্রহটি উৎক্ষেপণের পরিকল্পনা হচ্ছে। এই প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত হতে বার বছরের বেশি সময় লাগে। তবে এই বেশি সময়টা কাজেই লেগেছিল।) উপগ্রহে স্থাপিত মাইক্রোওয়েভ রেডিও মিটার দ্বারা বিভিন্ন তরঙ্গদৈর্ঘ্যে মহাজাগতিক পটভূমি বিকিরণের তীব্রতা পরিমাপ করা হলো। উড্ডয়নের প্রথম আট মিনিটের পরিমাপের ফলাফলে দেখা গেল যে বিভিন্ন তরঙ্গদৈর্ঘ্যে মহাজাগতিক পটভূমি বিকিরণের তীব্রতা কৃষ্ণকায়া বল্টন বিধি বা প্লাংক বিভাজন বিধি আরো এক সহস্রাংশগুণ বেশি মেনে চলে। মহাজাগতিক পটভূমি বিকিরণের তাপমাত্রা পাওয়া গেল ২.৭৩৫° K (অর্থাৎ পরম শূন্যের উপর ২.৭৩৫° K)। বিকিরণের তীব্রতা কৃষ্ণকায়া বল্টন বিধি কড়াকড়ি ভাবে মেনে চলে না বলে বিগত দুই বছর যাবত যে খবর পাওয়া যাচ্ছিল - এই পরিমাপে তা ছিল সম্পূর্ণরূপে অনুপস্থিত। এখন তত্ত্ব ও পর্যবেক্ষণের এত সুন্দর মিল রয়েছে যে আমরা নিশ্চিত হতে পারি- বস্তুত মহাবিস্ফোরণের প্রায় এক মিলিয়ন বছর পর থেকে এই বিকিরণ অবশেষ হিসেবে টিকে রয়েছে। এক মিলিয়ন বছর পর মহাবিশ্ব প্রথমবারের মত বিকিরণের মধ্যে স্বচ্ছ হতে শুরু করে।

মাইক্রোওয়েভ পটভূমি বিকিরণ প্রথম আবিষ্কারের সময় হিলিয়ামকে 'কোল্ড লোড' হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছিল। অনুরূপভাবে কোবে উপগ্রহে স্থাপিত মাইক্রোওয়েভ রেডিও মিটার দ্বারা বিকিরণ তাপমাত্রা পরিমাপের জন্যও তরল হিলিয়াম ব্যবহার করা হয়েছিল। কোবে স্থাপিত উপগ্রহে তাপমান যন্ত্রের তরল হিলিয়াম সহসাই বাষ্পে পরিণত হয়ে উড়ে গেল। এমন কোন সম্ভাবনা নেই যে কোবে উপগ্রহে স্থাপিত তাপমান যন্ত্রের মাধ্যমে পরিমাপকৃত পটভূমি বিকিরণ তাপমাত্রা সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান আরো বৃদ্ধি পাবে। তবে আকাশের বিভিন্ন দিক থেকে আমাদের কাছে আগত বিকিরণের তাপমাত্রার পার্থক্য পরিমাপের জন্য তরল হিলিয়ামের প্রয়োজন হয় না। কারণ হিলিয়াম বাষ্পীভূত হওয়ার পরও কোবেতে স্থাপিত তাপমান যন্ত্রদ্বারা আকাশের বিভিন্ন দিক থেকে আগত বিকিরণের তাপমাত্রার পার্থক্য পরিমাপ অব্যাহত রাখা হয়।

বস্তুতপক্ষে আকাশের বিভিন্ন দিকে মাইক্রোওয়েভ পটভূমি বিকিরণের তাপমাত্রার বিভিন্নতা পরিমাপের বিষয়টি কেবলমাত্র তাপমাত্রা পরিমাপের চেয়েও বেশি উত্তেজনা সৃষ্টি করে। ষাটের দশকে ভূমিভিত্তিক প্রথম দিকের পরিমাপসমূহ একটি প্রায় সুসম বিকিরণ তাপমাত্রা প্রদর্শন করেছিল। এটা ছিল এমন একটি যোগসূত্র বা ধারণা যা এই ইঙ্গিত দিচ্ছিল যে এই বিকিরণ আসছে পুরো মহাবিশ্ব থেকে, আমাদের পৃথিবী বা আমাদের গ্যালাক্সী থেকে নয়। তারপর ১৯৭৭ সালে বার্কলের (Berkeley)

একটি দল U_2 বিমান ব্যবহার করে সামান্য দিক নির্ভরতা আবিষ্কার করেন। পটভূমি বিকিরণের তুলনায় আমাদের সৌরজগত প্রতি সেকেন্ডে কয়েকশত কিলোমিটার বেগে যদি ছুটতে থাকে তা হলে যে ধরনের দিক-নির্ভরতা আশা করা যায় আবিষ্কৃত দিক- নির্ভরতা ছিল ঠিক সেই ধরনের। অর্থাৎ যে দিকে আমরা যাচ্ছি সেদিকে বিকিরণের তাপমাত্রা কিছুটা উচ্চতর এবং যে দিক থেকে আমরা আসছি সেই দিকে বিকিরণ তাপমাত্রা কিছুটা নিম্নতর। কিন্তু বিকিরণের স্বকীয় কোন দিক- নির্ভরতা কেউ খুঁজে পেল না।

সময় অতিবাহিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এটা ক্লান্তিকর হতে শুরু করলো। মোটের উপর মহাবিশ্ব নিখুঁতভাবে বা পুরোপুরি মসৃণ ' ফ্লুইড' (Fluid) নয়, বরং পিন্ডাকার গ্যালাক্সীসমূহ এবং গ্যালাক্সী গুচ্ছসমূহ দ্বারা মহাবিশ্ব পূর্ণ। মহাবিশ্ব প্রথমে যখন স্বচ্ছ হতে শুরু করলো তখন তুলনামূলক কম মহাকর্ষ বলে মহাবিশ্বের উপাদানসমূহ আবদ্ধ ছিল। ঐ অবস্থা থেকে ধীরে ধীরে মহাকর্ষ বলের প্রভাবে ও মহাকর্ষ বল দ্বারা আবদ্ধ এসব কাঠামো (গ্যালাক্সীসমূহ ও গ্যালাক্সী গুচ্ছসমূহ) অবশ্যই গঠিত হয়ে থাকবে। এবং সদ্যজাত (Nascent) গ্যালাক্সী বা গ্যালাক্সী গুচ্ছসমূহের মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র মাইক্রোওয়েভ পটভূমি বিকিরণে অবশ্যই কিছুটা অস্থিরতা সৃষ্টি করে থাকবে।

শেষ পর্যন্ত ১৯৯২ সালের এপ্রিল মাসে 'কোবে' উপগ্রহের বিজ্ঞানীগণ ঘোষণা করেন যে, মাইক্রোওয়েভ পটভূমি বিকিরণে তাঁরা সামান্য অসমরূপতা (Non-uniformities) শনাক্ত করেছেন। ৭° এবং ১৮০° এর মধ্যে সকল কৌণিক স্কেলে আকাশের একবিন্দু থেকে অন্য বিন্দুতে এই বিকিরণের তাপমাত্রায় গড়ে প্রায় এক ডিগ্রীর ত্রিশ মিলিয়ন ভাগের এক ভাগ ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। পরবর্তীতে বেলুন বাহিত যন্ত্র দ্বারা বিকিরণের তাপমাত্রা পরিমাপ করা হয় এবং তাতেও একই ফলাফল পাওয়া যায়। মনে করা হয় যে, প্রসারণ শুরু হওয়ার এক মিলিয়ন বছর পরে মহাবিশ্ব ঠিক যখন বিকিরণের মধ্যে স্বচ্ছ হতে শুরু করলো তখনই মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রের প্রভাবে মাইক্রোওয়েভ পটভূমি বিকিরণে এসব তরঙ্গ বা ঢেউ সৃষ্টি হয়েছে। (যদিও কোন কোন তাত্ত্বিক এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে, এমন কি আরো আগে সৃষ্ট মহাকর্ষীয় তরঙ্গ দ্বারা বিকিরণ তাপমাত্রায় অন্তত কিছু বিভিন্নতা সৃষ্টি হয়েছিল।) সদ্য সৃষ্ট গ্যালাক্সী বা গ্যালাক্সী গুচ্ছসমূহ এসব তরঙ্গ সৃষ্টি করতে পারে নি। তরঙ্গ সৃষ্টিকারী এই গুচ্ছগুলো ছিল আরো অনেক অনেক বেশি বড়। গ্যালাক্সীসমূহের বা গ্যালাক্সী গুচ্ছসমূহের প্রারম্ভিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে হলে ৭°k এর চেয়ে অনেক কম কৌণিক স্কেলে মাইক্রোওয়েভ পটভূমি বিকিরণ তাপমাত্রার ভিন্নতা পরিমাপ করতে হবে। উচুতে বেলুন বাহিত এন্টেনা বা দক্ষিণ মেরুতে স্থাপিত এন্টেনা ব্যবহার করে পটভূমি বিকিরণ তাপমাত্রার অনেকগুলো পরিমাপ চলছে। এসব ক্ষেত্রে সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে অধিক উচ্চতায় এবং শুষ্ক বাতাসে ভূমিভিত্তিক পর্যবেক্ষণের মত প্রায় আদর্শ অবস্থা সৃষ্টি করে।

দুঃখজনকভাবে গ্যালাক্সী গঠন তত্ত্ব এখনও অস্পষ্ট রয়েছে। এতে বিস্ময়ের কিছু নেই- কেননা গ্যালাক্সীসমূহ কি দিয়ে তৈরি তা আমরা এখনও জানিনা। গ্যালাক্সীসমূহের ভর যদি প্রধানত উজ্জ্বল কেন্দ্রীয় অঞ্চলে থাকে, তাহলে এই

অঞ্চলের বাইরের নক্ষত্রগুলো যে মহাকর্ষ বল অনুভব করবে তা হবে গ্যালাক্সীর কেন্দ্র থেকে তাদের দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাত অনুযায়ী। সূর্যের চারদিকে কক্ষপথে 'ঘূর্ণ্যমান' গ্রহগুলো সূর্যের যে ধরনের বল অনুভব করে এটা হলো অনেকটা সে রকম। এক্ষেত্রে গ্যালাক্সীকেন্দ্রের চতুর্দিকে প্রদক্ষিণরত নক্ষত্র এবং গ্যাসসমূহের বেগ কেন্দ্র থেকে তাদের দূরত্বের বর্গমূলের ব্যস্তানুপাতে কমতে থাকবে। আমাদের সৌরজগতের কক্ষপথে ঘূর্ণ্যমান গ্রহগুলোর বেগের ক্ষেত্রে ঠিক এমনটি ঘটে। কিন্তু কুন্ডলিত গ্যালাক্সীসমূহ পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে নক্ষত্রসমূহের এই গতি প্রকৃতপক্ষে অনেক বিরাট দূরত্ব পর্যন্ত মোটামুটি অপরিবর্তিত থাকে। এতে বুঝা যায় যে, গ্যালাক্সীসমূহের ভর তাদের আলোকোজ্জ্বল কেন্দ্রীয় অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত বা পুঞ্জীভূত থাকে না, বরং তা অদৃশ্য কালো বস্তু হিসেবে (Dark Matter) বিশাল বেষ্টনীর মধ্যে আবদ্ধ থাকে।

মহাবিশ্বের বিভিন্ন প্রকার বস্তুর মোট পরিমাণকে ' ক্রান্তিক ভর '- এর ভগ্নাংশ হিসেবে প্রকাশ করা সুবিধাজনক। যে ভর থাকলে শেষ পর্যন্ত মহাবিশ্বের প্রসারণ বন্ধ হয়ে সংকোচন শুরু হয়, তাই হলো ক্রান্তিক ভর। হাবল ধ্রুবকের মান ৮০ কি. মি. / সেকেন্ড/ মেগাপারসেক হলে ক্রান্তিক ভরের মান হবে প্রতিঘন সেন্টিমিটার আয়তন স্থানে প্রায় ১০২৯ গ্রাম। কুন্ডলিত গ্যালাক্সীসমূহের ঘূর্ণন থেকে এই আভাস পাওয়া যায় যে গ্যালাক্সীসমূহে ক্রান্তিক ভরের ৩ থেকে ১০ শতাংশের বেশি ভর রয়েছে। অথচ বৃহৎ গ্যালাক্সীগুচ্ছে অবস্থিত গ্যালাক্সীসমূহের গতি পর্যবেক্ষণ থেকে জানা যায় যে, যদি সকল গ্যালাক্সীর উজ্জ্বলতা ও ভরের অনুপাত প্রতিনিধিত্বমূলক হয় তাহলে গ্যালাক্সীসমূহে ক্রান্তিক ভরের প্রায় ১০ থেকে ৩০ শতাংশ ভর রয়েছে। সম্প্রতি ইনফ্রারেড রেডিয়েশন এস্ট্রোনোমি স্যাটেলাইট দ্বারা নক্ষত্রের গতি পর্যবেক্ষণ করে জানা যায় যে সর্বমোট ভরঘনত্ব ক্রান্তিক মানের প্রায় ১০ শতাংশেরও বেশি। শুধু সাধারণ উজ্জ্বল নক্ষত্রগুলোতেই 'ডার্ক মেটার' থাকে না। কিছু প্রমাণ রয়েছে যে এমন কি প্রোটন, নিউট্রন এবং ইলেকট্রন এর মতো পারমাণবিক কণিকারূপেও (যা সাধারণ পরমাণু গঠন করে) 'ডার্ক মেটার' অবস্থান করে না। পঞ্চম অধ্যায়ে আমরা দেখেছি মহাবিস্ফোরণের প্রথম কয়েক মিনিটে যে সব পারমাণবিক বিক্রিয়ায় হালকা বস্তুসমূহ সৃষ্টি হয়েছিল, সেই সব বিক্রিয়াসমূহ ঐ সময়ে বিদ্যমান ফোটনসমূহের বিপরীতে পারমাণবিক কণিকা সংখ্যার অনুপাত দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছিল। ফোটন সংখ্যা প্রতি পারমাণবিক সংখ্যার অনুপাত যদি তুলনামূলকভাবে উচ্চ হয়, তাহলে হাইড্রোজেনকে হিলিয়ামে পরিণত করার পারমাণবিক বিক্রিয়া আরো প্রায় সমাপ্তির দিকে অগ্রসর হবে এবং অবশেষ বস্তু হিসেবে ডিউটেরিয়াম বা লিথিয়ামের মতো তুলনামূলক কম দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ হালকা কণিকার পরিমাণ হ্রাস পাবে। এসব হালকা কণিকা নক্ষত্রের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে বলে বিশ্বাস করা হয় না। তাই এসব কণিকার বর্তমান সংখ্যা বা পরিমাণ থেকে আমরা জানতে পারি যে , প্রথম কয়েক মিনিটে ফোটন কণিকা প্রতি পারমাণবিক কণিকার অনুপাত কি ছিল। কিন্তু প্রথম কয়েক মিনিটের পর থেকে এই অনুপাতের উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্তন ঘটেনি। তাই আমরা এর বর্তমান মান সম্পর্কে কোন একটি সিদ্ধান্তে পৌছতে পারি এবং আমরা বর্তমান মহাবিশ্বে বিদ্যমান পারমাণবিক কণিকা সংখ্যা কত তাও জানি। কেননা মহাজাগতিক মাইক্রোওয়েভ পটভূমি বিকিরণের প্রতি ঘন সেন্টিমিটারে ফোটন সংখ্যা

কত তা আমরা জানি। আশির দশকে এই পদ্ধতির গ্রহণযোগ্যতা আরো অনেক বৃদ্ধি পায়। কারণ হিলিয়াম ও ডিউটেরিয়াম-এর পরিমাণ সম্পর্কিত পূর্ববর্তী তথ্যের সংগে লিথিয়াম Li^7 আইসোটোপের পরিমাণ সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য যুক্ত হয়। এর ফলে আমরা এখন কিছুটা আস্থার সঙ্গেই বলতে পারি যে, হাবল ধ্রুবকের মান প্রতি সেকেন্ড প্রতি মেগাপারসেকে ৮০ কিলোমিটার ধরা হলে সাধারণ বস্তুর পরিমাণ হবে ক্রান্তিক ভরের ২.৩ এবং ৪ শতাংশের মধ্যে। আবার হাবল ধ্রুবকের মান ৩২.৬১৫ লক্ষ আলোকবর্ষ দূরত্বের জন্য প্রতি সেকেন্ডে ৪০ কিলোমিটার ধরা হলে বস্তুর পরিমাণ দাঁড়ায় ক্রান্তিক ভরের ৯ থেকে ১৬ শতাংশের মধ্যে।

আদি মহাবিশ্বে কি পরিমাণ আলোর উপাদান সৃষ্টি হয়েছিল,ঘটনাক্রমে তাও নিউট্রিনো প্রজাতি সংখ্যার (Number of Neutrino Species) উপর নির্ভরশীল। নিউট্রিনো যত বেশি প্রকারের হবে, প্রসারণ হবে তত ক্ষুদ্রতর এবং সে ক্ষেত্রে তত বেশি পরিমাণ আদি হাইড্রোজেন হিলিয়ামে রূপান্তরিত হয়ে থাকবে। সত্তরের দশকে কণিকা পদার্থবিদগণ অনুমান করেন যে তিন প্রজাতির নিউট্রিনো রয়েছে। এই অনুমানের উপর ভিত্তি করে মহাবিস্ফোরণের সময়ে সংঘঠিত পারমাণবিক সংশ্লেষণের গণনাসমূহ সফলভাবে সম্পন্ন করা হয় এবং এই অনুমান কিছুটা নিশ্চিত বলে ধরে নেওয়া যায়। পরে জেনেভাস্থ সার্ন (CERN) গবেষণাগারে Z^0 কণিকার ভাঙ্গনের উপর পরিচালিত পরীক্ষার মাধ্যমে চূড়ান্তভাবে জানা যায় যে বস্তুত ঠিক তিন প্রজাতির নিউট্রিনো রয়েছে।

মহাজাগতিক ভরঘনত্ব নিরূপণ করা ছাড়াও আলোর উপাদানের পরিমাণ গণনা ও পরিমাপের অন্য গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য রয়েছে। এটা সত্যিই আকর্ষণীয় যে ফোটন প্রতি পারমাণবিক কণিকা সংখ্যার অনুপাতকে একক ধ্রুবক হিসেবে যৌক্তিকভাবে বেছে নিতে পারলে শুধু পর্যবেক্ষণকৃত সাধারণ হাইড্রোজেন ও হিলিয়ামের পরিমাণ সম্পর্কে ব্যাখ্যা দেওয়া যে সম্ভব তাই নয় ; বরং আইসোটোপ ডিউটেরিয়াম (H^2),হিলিয়াম (He^3) এবং লিথিয়াম (Li^7) এর পরিমাণ সর্ম্পকেও ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব। এটা শুধু আধুনিক সৃষ্টিতাত্ত্বিক তত্ত্বের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ পরিমাণগত সাফল্য নয়, মহাবিশ্বের ইতিহাসে প্রথম কয়েক মিনিটের ঘটনাবলী সম্পর্কে আমরা যে সত্যিই কিছুটা বুঝতে পারি এটা হলো তার স্বপক্ষে সবচেয়ে শক্তিশালী প্রমাণ।

দীর্ঘদিন এই প্রত্যাশা ছিল যে মহাবিশ্বে পারমাণবিক কণিকা ও ফোটন কণিকা সংখ্যার অনুপাত প্রথম বিধি (First Rule) থেকে গণনা করা যায়। একেবারে আদি সময়ে মহাবিশ্ব ছিল অতি উচ্চমাত্রায় উত্তপ্ত এবং প্রত্যেক প্রজাতির কণিকা ছিল বিপুল এবং অনুমেয় যে, প্রত্যেক প্রজাতির কণিকা ও প্রতি কণিকার সংখ্যা ছিল সমান। পদার্থ ও প্রতিপদার্থের মধ্যে প্রকৃতির নিয়মগুলো যদি সম্পূর্ণ প্রতিসম হতো অথবা ব্যারিয়ন ও লেপটন সংখ্যার মতো রাশিগুলো যদি যথাযথভাবে সংরক্ষিত হতো-তাহলে আমরা আমাদের পর্যবেক্ষণের বিপরীত অবস্থা (অর্থাৎ এখনও সমান সংখ্যক কণিকা ও প্রতিকণিকা) দেখতে পেতাম। এছাড়া প্রকৃত পক্ষে সকল প্রোটন, নিউট্রন এবং ইলেকট্রন তাদের প্রতি-কণিকার (এন্টি প্রোটন, এন্টি নিউট্রন এবং এন্টি ইলেকট্রন) সঙ্গে সংঘর্ষে ইতিমধ্যেই বিনাশ প্রাপ্ত হতো এবং ফোটন এবং নিউট্রিনো ছাড়া প্রায় কিছুই অবশিষ্ট থাকতো না। কিন্তু ১৯৮৪ সালে মৌলিক কণিকার ভাঙ্গনের

উপর পরিচালিত গবেষণায় দেখা যায় যে, পদার্থ (Matter) ও প্রতিপদার্থের ক্ষেত্রে প্রকৃতির বিধিসমূহ নিখুঁতভাবে প্রতিসম নয়। উপরন্তু মৌলিক কণিকার মিথস্ক্রিয়ার আধুনিক তত্ত্বে বিভিন্ন প্রক্রিয়া বা কৌশল রয়েছে যা ব্যারিয়ন এবং লেপটন সংখ্যা কঠোরভাবে সংরক্ষণের নীতিকে অমান্য করে। এও সম্ভব যে আদি মহাবিশ্বে কণিকা ও প্রতি-কণিকার সংঘর্ষের পর প্রতিপদার্থের চেয়ে কিছু বেশি পদার্থ অবশেষ হিসেবে রয়ে গেছে এবং প্রয়োজনীয় পরিমাণ (সমপরিমাণ) প্রতিপদার্থের অভাবে তা সংঘর্ষে বিনাশিত হতে পারে নি। ফলে তা এখন পর্যন্ত পদার্থ হিসেবে টিকে রয়েছে। (আমাদের জ্ঞান এতটা পর্যাপ্ত নয় যে পদার্থের পরিবর্তে প্রতিপদার্থের টিকে থাকার সম্ভাবনাকে বাতিল করে দিতে পারি। তবে সেক্ষেত্রে প্রতিপদার্থ বিদ্যার বা প্রতি বিশ্বে স্বাভাবিকভাবেই এগুলো প্রতি পদার্থ হিসেবে চিহ্নিত না হয়ে পদার্থ হিসেবেই চিহ্নিত হতো।) যেহেতু প্রকৃতিতে পদার্থ এবং প্রতি পদার্থের মধ্যে প্রতিসাম্যবিধির লঙ্ঘন খুবই কম এবং যেহেতু ব্যারিয়ন এবং লেপটন সংখ্যাগুলো প্রায় সংরক্ষিত তাই ফোটন প্রতি অবশেষ পারমাণবিক কণিকার সংখ্যার প্রত্যাশিত অনুপাত হবে অত্যন্ত কম। আজকের মহাবিশ্বে প্রতি এক বিলিয়ন থেকে দশ বিলিয়ন ফোটনের বিপরীতে যে একটি করে পারমাণবিক কণিকা পর্যবেক্ষণ করা হয় তা উপর্যুক্ত প্রত্যাশার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

এটা দুঃখজনক যে এই অনুপাত কি হওয়া উচিত তা নিরূপণ করা তেমন সহজ নয়। সত্তরের দশকের শেষ দিকে এসব ধারণা প্রথম যখন সক্রিয় ভাবে পরীক্ষা করা হয় তখন অনুমান করা হয় যে একেবারে আদি মহাবিশ্বেই ব্যারিয়ন এবং লেপটন সংখ্যার সংরক্ষণ বিধি লঙ্ঘিত হয়েছিল। তখন মহাবিশ্বের তাপমাত্রা ছিল $১০^{১৯}$ (দশ বিলিয়ন বিলিয়ন বিলিয়ন) ডিগ্রী কেলভিন। আরো সাম্প্রতিক পরীক্ষায় জানা যায় যে মহাবিশ্বের তাপমাত্রা যদি মাত্র $১০^{১৯}$ (দশ মিলিয়ন বিলিয়ন) ডিগ্রী কেলভিনে নেমে আসে তখন দুর্বল নিউক্লীয় এবং তড়িৎ-চুম্বক বলের সূক্ষ্ম মিথস্ক্রিয়ায় প্রতি পদার্থের তুলনায় কিছু বেশি পদার্থ সৃষ্টি হতে পারে। দুর্বল নিউক্লীয় এবং তড়িৎ-চুম্বক বলের মিথস্ক্রিয়া সম্পর্কে আমাদের বর্তমান উপলব্ধির মধ্যে যে ফাঁক রয়েছে তা পূরণ না হওয়া পর্যন্ত এই বিষয়ে আমরা একটি সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারবো বলে মনে হয় না। আমরা আশা করি যে টেকসাসে নির্মাণাধীন সুপার কনডাক্টিং সুপার কলাইডার (SSC) বা সার্নের (CERN) জন্য পরিকল্পিত লার্জ হ্যাড্রন কলাইডার (Large Hadron Collider) -এর মতো নতুন কণিকা ত্বরক থেকে আমরা এই ধরনের তথ্য জানতে পারবো।

অনেক জ্যোতির্বিদ এবং পদার্থবিদ দশকের পর দশক এই সন্দেহ পোষণ করেছেন যে মহাবিশ্বের ভরঘনত্ব নির্ভুলভাবে ক্রান্তিক মানের। এই যুক্তিটি অনিবার্যভাবে নান্দনিক (Aesthetic)। মহাবিশ্ব যখন প্রসারিত হতে থাকে ক্রান্তিক মানের সাথে এর ভরঘনত্বের অনুপাত সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হতে থাকে। সকল ক্ষেত্রেই এই অনুপাত শুরু হয় ১০০% এর কাছাকাছি থেকে। ১০০% এর কম থেকে শুরু হলে অনুপাত কমতে থাকে। আবার ১০০% এর বেশি থেকে শুরু হলে এই অনুপাত বাড়তে থাকে। মহাবিস্ফোরণের কয়েক শত কোটি বছর পর পরিমাপ করা ভরঘনত্বের এখনকার মান হলো ক্রান্তিক মানের দশ শতাংশের মধ্যে। মহাবিশ্ব সৃষ্টির

আদি লগ্নে (যেমন প্রথম কয়েক সেকেন্ড) ভরঘনত্ব ক্রান্তিক মানের অবিশ্বাস্য রকম কাছাকাছি থাকলেই এমনটি সম্ভব। তবে মহাবিশ্বের ভরঘনত্ব সবসময়ই নিখুঁত ক্রান্তিক মানে না থাকলে শুধু কেন প্রথম কয়েক সেকেন্ডে ক্রান্তিক মানের থাকবে- তা অনুধাবন করতে পারা কঠিন বলে মনে হয়।

মহাবিশ্বের ভরঘনত্ব ক্রান্তিক মানের কিনা বলতে পারার একটি পদ্ধতি হলো মহাবিশ্বের প্রসারণ কি হারে কমছে তা পরিমাপ করা। যে ভাবে আমরা হাবল ধ্রুবক নির্ণয় করি নীতিগত ভাবে সেভাবেই তা পরিমাপ করতে পারি। অর্থাৎ দূরবর্তী গ্যালাক্সীসমূহের গতি দূরত্বের সঙ্গে সঙ্গে কিভাবে বৃদ্ধি পায় তা পর্যবেক্ষণ করে। এখানেও সেই একই প্রতিবন্ধকতা, যা বিগত অর্ধ শতাব্দী ধরে বিরাজমান রয়েছে। মহাজাগতিক প্রসারণের মন্দন ঘটেছে কিনা অর্থাৎ আমরা যে গ্যালাক্সীসমূহকে এখন দেখছি সেগুলো থেকে আলো নিঃসৃত হবার পর মহাজাগতিক প্রসারণের হার উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে কিনা, তা শুধু এতো দূরের গ্যালাক্সীসমূহ পর্যবেক্ষণ করে নিরূপণ করা যায়। তবে এসব অত্যন্ত দূরবর্তী গ্যালাক্সীসমূহের দূরত্ব নিরূপণ করার জন্য আমরা তাদের আপাত প্রভা ব্যবহার করতে পারি না। যা হোক এমন হতে পারে যে গ্যালাক্সীসমূহের প্রভা অপেক্ষা তাদের বিকশিত বাস্তব আকার ক্ষুদ্রতর। ফলে আপাত প্রভার বদলে আপাত আকার পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে আমরা অধিকতর নির্ভরযোগ্যতার সঙ্গে গ্যালাক্সীসমূহের দূরত্ব নিরূপণ করতে পারি। ১৯৯২ সালে এ ধরনের এক পর্যবেক্ষণে এই ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, মহাবিশ্বের ভরঘনত্ব ক্রান্তিক মানের হলে মহাবিশ্বের প্রসারণ যে হারে হ্রাস পাওয়া উচিত, সেই প্রত্যাশিত হারের খুব কাছাকাছি হারেই মহাবিশ্বের প্রসারণ হ্রাস পাচ্ছে।

প্রথম কয়েক মিনিটে উৎপন্ন হালকা কণিকসমূহের হিসাব এবং এসব হালকা কণিকার পর্যবেক্ষণকৃত পরিমাণের মধ্যে যে মিল রয়েছে তা যদি অস্বীকার করা হয়, তবেই বলা যায় যে মহাবিশ্বের ভর সত্যিই ক্রান্তিক মানের হলে তা সাধারণভাবে বস্তুরূপে (মহাবিশ্বে) বিদ্যমান রয়েছে। বস্তুত মহাবিশ্বের ভর ক্রান্তিক মানের সমান কিনা এই প্রশ্নের জবাবে বলা যায়, মহাবিস্ফোরণ তত্ত্বে পারমাণবিক সংশ্লেষণের গণনায় সাধারণভাবে বস্তুর যে মান পাওয়া যায় তার চেয়ে মহাবিশ্বের ভর সম্ভবত বেশি। তা হলে মহাবিশ্বের ভর (Mass) কি দিয়ে গঠিত? সত্তর এবং আশির দশকে ব্যাপকভাবে ধারণা করা হয়েছিল যে অত্যন্ত হালকা তবে একবারে ভরশূন্য নয় এমন কণিকা যেমন নিউট্রিনোর মধ্যেই রয়েছে মহাবিশ্বের হারানো ভর। চতুর্থ অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে যে নিউট্রিনোর পরিমাণ বর্তমানে প্রায় ফোটনের পরিমাণের সমান এবং নিউট্রিনোসমূহের যদি প্রায় ২০ ইলেকট্রন ভোল্ট শক্তির সমতুল্য ভর থাকে তবে গণনা থেকে সহজেই দেখা যায় যে তারা (নিউট্রিনোসমূহ) ক্রান্তিক ভরের পুরোটাই যোগান দিতে পারে। তবে পারমাণবিক বিটা ভাঙ্গনের সাম্প্রতিক গবেষণা থেকে জানা যায় যে নিউট্রিনোর ভর শূন্য না হলেও উক্তমানের (২০ ইলেকট্রন ভোল্ট শক্তির সমতুল্য ভরের চেয়ে) চেয়ে অনেক কম।

ধারণাকৃত এসব ২০ ইলেকট্রন ভোল্ট নিউট্রিনো কণিকার চেয়ে অনেক কম পরিমাণের ও বেশি ভরের এক শ্রেণীর কণিকার মধ্যে সম্ভবত এই হারানো ভর

রয়েছে। আদি মহাবিশ্বে অতি উচ্চ তাপমাত্রায় যে কোন শ্রেণীর কণিকা ও তার প্রতিকণিকার (তা যত ভারীই হোক না কেন) পরিমাণ ছিল বিপুল। মহাবিশ্ব যখন প্রসারিত ও শীতল হলো, সবচেয়ে ভারী কণিকা ও প্রতি কণিকাসমূহ মুখোমুখি সংঘর্ষে বিনাশিত হতে লাগলো। সংঘর্ষের জন্য পরস্পরকে মুখোমুখি পাওয়া পর্যন্ত এই প্রক্রিয়া চলতে লাগলো। অবস্থা স্থিতিশীল হলে বিনাশিত না হওয়া অবশিষ্ট কণিকা এবং প্রতিকণিকাসমূহ এখন পর্যন্ত টিকে রইল। যে কোন শ্রেণীর কণিকার ভর এবং প্রতিকণিকার সঙ্গে কণিকার বিলয়ের হার জেনে আমরা গণনা করতে পারি যে এই সব কণিকার এবং প্রতিকণিকার কতটি এখন বর্তমান রয়েছে এবং মহাবিশ্বের বর্তমান ভরের ক্ষেত্রে তাদের অবদান কতটুকু। সাম্প্রতিক কণা পদার্থবিদগণ (Particle Physicists) এই ধরনের বিভিন্ন প্রকার ভারী কণিকার অস্তিত্ব সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। বর্তমানে সর্বাধিক আকর্ষণীয় সম্ভাবনা হলো, মহাবিশ্বের হারানো ভর ফোটিনো (Photino) বা নিউট্রালিনো (Neutralino) নামক স্থায়ী কণিকায় বিদ্যমান রয়েছে। এসব কণিকার ভর হবে ১০ থেকে ১০০০০ প্রোটনের ভরের সমান। এছাড়া মৌলিক কণিকাসমূহের প্রস্তাবিত প্রতিসাম্যের (Symetry) চাহিদা অনুযায়ী তাদের (কণিকাসমূহের) একটি ধীর গতির অবলুপ্তির হার নির্ধারিত হবে। এই ধরনের প্রতিসাম্যকে বলা হয় অতি প্রতিসাম্য (Super Symetry)। অতিসংবেদী কণিকা ত্বরকে পরমাণুর সঙ্গে এসব কণিকার সংঘর্ষের ফলাফল পর্যবেক্ষণ করে তা (এসব কণিকা) শনাক্ত করার গবেষণা অব্যাহত রয়েছে। এসব বিচিত্র ভারী কণিকার অস্তিত্ব যদি বিদ্যমান থাকে, তবে এদেরকে এস,এস সি বা এল,এইচ,সি -এর মতো অত্যন্ত শক্তিশালী নতুন কণিকা ত্বরকে সৃষ্টি করা সম্ভব বলে মনে হয়। এস,এস,সি বা এল,এইচ,সি তে এই সব কণিকা সৃষ্টি করা গেলে তা মহাবিশ্ব সৃষ্টিতত্ত্ব ও মৌলিক কণিকার পদার্থ বিজ্ঞানে এক বিপ্লবের সূচনা করবে।

এখানে উল্লেখ্য যে, মহাবিশ্বের হারানো ভরের যোগান দিতে সক্ষম অপর জনপ্রিয় প্রার্থী হলো 'এক্সিয়ন' নামে পরিচিত একটি কণিকা। কণিকা পদার্থবিদ্যার কিছু সমস্যার সমাধান কল্পে ১৯৭৭ সালে 'এক্সিয়ন'- এর অস্তিত্ব প্রস্তাব করা হয়। মহাবিস্ফোরণের পর থেকে ফোটন বা নিউট্রিনো-এর সংখ্যার চেয়ে অনেক বেশি সংখ্যক 'এক্সিয়ন' হয়তো বা অবশেষ হিসেবে বিদ্যমান রয়েছে। এবং এদের ভর মোটামুটি যদি এক ইলেকট্রন ভোল্টের এক লক্ষ ভাগের এক ভাগ হয়, তাহলে তারা মহাবিশ্বের ক্রান্তিক ভরঘনত্ব যোগান দিতে পারে। গবেষকগণ মহাজাগতিক 'এক্সিয়ন' শনাক্ত করার পরিকল্পনা করেছেন। কিন্তু ' এক্সিয়নের' সত্যিকার অস্তিত্বের স্বপক্ষে এখন পর্যন্ত গবেষণা নির্ভর কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নি।

মহাবিশ্বের হারানো ভর (Missing Mass of Universe) বলতে এখানে মহাবিশ্বের ক্রান্তিক ভর ও গণনাকৃত ভরের পার্থক্যকে বুঝানো হয়েছে। হারানো ভরের আরো একজন প্রার্থী রয়েছে এবং তা হলো শূন্য স্থানের একটি বৈশিষ্ট্য বা ধর্ম সম্পর্কিত। যে কোন ধরনের কোয়ান্টাম ফিল্ড তত্ত্বে তড়িৎ-চুম্বক এবং অন্যান্য ক্ষেত্রসমূহে কোয়ান্টামের অবিরাম অস্থিতির কারণে শূন্যস্থান প্রচুর শক্তি পেতে থাকে। আপেক্ষিকতার সাধারণ তত্ত্ব (General Relativity) অনুযায়ী একটি ভরঘনত্বকে শূন্যস্থানের উপর সুসমভাবে ছড়িয়ে রাখলে তা যে পরিমাণ মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র সৃষ্টি করে, শূন্যস্থানের শক্তিও সে পরিমাণ মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র সৃষ্টি করে। বাস্তবে

আমরা এই শূন্যস্থানের ভরঘনত্ব নিরূপণ করতে পারি না। কেননা আমাদের গণনায় দেখা যায় যে ভীষণ ক্ষুদ্র পরিমাপের অস্থিরতা (Fluctuation) থেকে বিরাট শক্তি সৃষ্টি হয় এবং দূরত্বের এসব মানদন্ডে আমাদের বর্তমান মহাকর্ষ তত্ত্বের বিশ্বাসযোগ্যতা থাকে না। আমরা যদি শুধু যাদৃচ্ছিক বড় পরিমাণের অস্থিরতাকে জানা তত্ত্বের ভিত্তিতে বিবেচনা বা বিশ্লেষণ করি, তখন আমরা শূন্যস্থানের এমন একটি ভরঘনত্ব পাই- যা মহাবিশ্বের প্রসারণ পর্যবেক্ষণ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের দ্বারা অনুমোদিত সর্বোচ্চ ক্রান্তিক মানের চেয়েও বেশি। (মোটামুটিভবে এটা হলো ক্রান্তিক মানের দ্বিগুণ বা তিনগুণ)। এই ভরঘনত্ব প্রায় এক মিলিয়ন গুণ বেশি। এই গণনাকে আমরা যদি আন্তরিকভাবে গ্রহণ করি , তা হলে বিজ্ঞানের ইতিহাসে তত্ত্ব ও পরীক্ষার মধ্যে এটা হবে নি:সন্দেহে সবচেয়ে আকর্ষণীয় পরিমাণগত অনৈক্য!

১৯১৭ সালে আইনস্টাইন তাঁর ক্ষেত্র সমীকরণসমূহে যে বিবেচনায় সৃষ্টিতাত্ত্বিক ধ্রুবক প্রবর্তন করেছিলেন, ঠিক সেই বিবেচনায় কোয়ান্টাম অস্থিতির (Quantum Fluctuations) মাধ্যমে শূন্যস্থানে ভরঘনত্ব সৃষ্টি হয় বলে ভাবা চলে। আইনস্টাইন একটি স্থির মহাবিশ্বের সৃষ্টিতাত্ত্বিক মডেল গঠন করার চেষ্টা করেছিলেন এবং পরবর্তীতে এটা যখন স্পষ্ট হলো যে মহাবিশ্বের প্রসারণ ঘটছে, তখন তিনি (ক্ষেত্র সমীকরণসমূহে) সৃষ্টিতাত্ত্বিক ধ্রুবক প্রবর্তন করার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন। তবু এটা (সৃষ্টিতাত্ত্বিক ধ্রুবক) একটি যৌক্তিক সম্ভাবনা হিসেবেই টিকে রইলো। বস্তুতপক্ষে সৃষ্টিতাত্ত্বিক ধ্রুবক হলো একমাত্র পদ (Term) যা (বিশ্বতত্ত্ব বিষয়ক দূরত্বের ক্ষেত্রে যে সব পদ গুরুত্বহীন হয়ে গেছে সেগুলো ছাড়াও) সকল স্থানাংক ব্যবস্থার (Co-ordinate Systems) সমতা সম্পর্কিত আইনস্টাইনের অনুমানসমূহকে অগ্রাহ্য না করে মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র সমীকরণসমূহে যোগ করা যায়। সৃষ্টিতাত্ত্বিক ধ্রুবক (বিশ্বতত্ত্ব বিষয়ক পদ) অপ্রয়োজনীয়- এটুকু বলাই যথেষ্ট নয়। বিগত অর্ধ শতাব্দী ধরে কোয়ান্টাম ক্ষেত্র তত্ত্ব সম্পর্কে আমাদের অভিজ্ঞতা এই ইঙ্গিত দেয় যে মৌলিক তত্ত্ব দ্বারা নিষিদ্ধ না হলে ক্ষেত্র সমীকরণে যে কোন পদই থাকতে পারে।

শূন্যস্থানের বিশাল ভরঘনত্ব রয়েছে কিনা এবং ক্ষেত্র সমীকরণসমূহে সৃষ্টিতাত্ত্বিক ধ্রুবক অন্তর্ভুক্ত থাকা বাঞ্ছনীয় কি না এই দুটি প্রশ্ন একে অপরের উত্তর যোগাতে পারে। অর্থাৎ ক্ষেত্র সমীকরণসমূহে এমন সৃষ্টিতাত্ত্বিক ধ্রুবক অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে যার মান হবে কোয়ান্টাম অস্থিতির কারণে শূন্যস্থানে সৃষ্ট ভরঘনত্বকে বাতিল করার মতো মানের ঠিক সমান। তবে জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণসমূহের সঙ্গে সংঘাত এড়ানোর জন্য এই বাতিল করণের (Cancellation) নির্ভুলতা হতে হবে কমপক্ষে দশমিকের পর ১২০ ঘর পর্যন্ত। এখানে প্রশ্ন জাগে এই বিশ্বে সৃষ্টিতাত্ত্বিক ধ্রুবক কেন এত বেশি সূক্ষ্মমানে নির্ধারিত হবে।

তাত্ত্বিক পদার্থবিদগণ যুগ যুগ ধরে তেমন কোন সাফল্য ছাড়াই এই প্রশ্নের জবাব খুঁজছেন। প্রকৃতির কতগুলো ধ্রুবকের মান কিছু মৌলিক নীতিতে (fundamental Principle) আবদ্ধ অন্যান্য ধ্রুবকের মান দ্বারা নির্ধারিত। একটি উদাহরণ হলো,

রিডবার্গের (Rydberg) ধ্রুবক। হাইড্রোজেন পরমাণুর বিভিন্ন স্তরের শক্তি এই ধ্রুবক থেকে পাওয়া যায় এবং ইলেকট্রনের চার্জ ও ভর হিসেবে তা গণনা করা যায়। আরেকটি উদাহরণ হলো কণাবাদী বলবিদ্যায় প্লাংক ধ্রুবক। কিন্তু সৃষ্টিতাত্ত্বিক ধ্রুবক কোন মৌলিক নীতি দ্বারা নির্ধারিত হয় তা কেউ জানে না। ১৯৮৩ ও ১৯৮৪ সালে এমন সম্ভাবনা দেখা দেয় যে কণাবাদী সৃষ্টিতত্ত্বের পটভূমিতে 'সৃষ্টিতাত্ত্বিক ধ্রুবক' ও শূন্যস্থানের ভরঘনত্ব সমস্যার সমাধান হতে পারে এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে কিছুটা উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল। গণনা থেকে দেখা যায় যে মহাবিশ্বের ধ্রুবকসমূহ যেমন সম্ভবত সৃষ্টিতাত্ত্বিক ধ্রুবক কোন মৌলিক সূত্র দ্বারা নির্ধারিত হয় না, তাই সম্ভবত মহাবিশ্বের ধ্রুবকসমূহ একটি নির্দিষ্ট মানে অবস্থান করে না। বরং মনে হয় যে, মহাবিশ্বকে একটি কোয়ান্টাম বলবিদ্যার তরঙ্গ অপেক্ষক (Quantum Mechanical Wave Function) হিসেবে বর্ণনা করা যায়। আর এই কোয়ান্টাম বলবিদ্যার তরঙ্গ অপেক্ষকের থাকে অনেকগুলো পদ (term বা বিষয়); প্রত্যেক পদের বিপরীতে থাকে ধ্রুবকসমূহের বিভিন্ন সেট মান। যখনই কোন মানুষ (বা অন্য কেউ) পরিমাপ নিতে শুরু করে তখন তারা প্রকৃতির ধ্রুবকগুলোর নির্দিষ্ট মান পেতে থাকে। তবে ধ্রুবকগুলোর কি মান পাওয়া যাবে সে সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা অসম্ভব; শুধু সম্ভাব্য মান নিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব। প্রথম দিকের গণনা থেকে এই ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে মহাবিশ্ব পর্যাপ্ত বিশাল ও শীতল হয়ে সৃষ্টিতাত্ত্বিক ধ্রুবকের মান যখন এমন দাঁড়ায় যে এটা ঠিক শূন্যস্থানের শক্তি ঘনত্বকে বাতিল করতে পারে, তখন ধ্রুবকসমূহের মান সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করার সর্বোচ্চ সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়। এই ফলাফলকে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে, তবে সম্পূর্ণ মহাবিশ্বের ক্ষেত্রে কণাবাদী বলবিদ্যাকে কিভাবে প্রয়োগ করা যায় সে সম্পর্কে আমাদের একটি সুস্পষ্ট ধারণা অর্জন ব্যতিরেকে সম্ভবত এই বিষয়টির নিষ্পত্তি হবে না।

এই ঘটনা (Episode) আমাদের জন্য একটি প্রয়োজনীয় শিক্ষা (Lesson) রেখে যায়। এমন কি যদিও সৃষ্টিতাত্ত্বিক ধ্রুবকের মতো ধ্রুবকসমূহের সম্ভাব্যতা বণ্টন কোন তীক্ষ্ণ চূড়া বা শীর্ষ নেই, তবুও এটা অনুমান করা অযৌক্তিক নয় যে এমন কিছু সম্ভাব্যতা বণ্টন (Probability Distribution) রয়েছে, যা এসব ধ্রুবকের সুনির্দিষ্ট মান খুঁজে পাবার সম্ভাবনাকে নিয়ন্ত্রণ করে। এই বিভাজনের আকার যেমনই হোক না কেন, এসব ধ্রুবকের মান শুধু সীমিত পাল্লার মধ্যে রয়েছে এবং সম্ভবত তা যে কোন বুদ্ধিমান পর্যবেক্ষক বের করতে পারেন। কেননা ধ্রুবকসমূহের মান শুধু সীমিত পাল্লার মধ্যে থাকলেই জীবন ও বুদ্ধিমত্তার উদ্ভব ও বিবর্তন ঘটতে পারে। প্রকৃতির ধ্রুবকসমূহের মান অবশ্যই এমন হতে হবে যাতে জীবন এবং বুদ্ধিমত্তার অস্তিত্ব থাকবে - এমন তত্ত্ব নরস্তীয় তত্ত্ব (Anthropic Principle) হিসেবে পরিচিত। বিজ্ঞানীদের মধ্যে এই নীতি যদিও জনপ্রিয় নয় - তবু কণাবাদী সৃষ্টিতত্ত্ব এমন একটি প্রেক্ষাপটের যোগান দেয়, যাতে এ বিষয়টি একটি সহজ সাধারণ জ্ঞানের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। মহাবিশ্ব যদি কতগুলি দশা (Phases) অতিক্রম করে আসে অথবা মহাবিশ্বের দূরবর্তী অঞ্চলসমূহ যদি বিভিন্ন মান বিশিষ্ট প্রকৃতির ধ্রুবক ধারণ করে, তা হলেও নরস্তীয় নীতি যুক্তিগ্রাহ্য হতে পারে।

এরূপ নরস্তীয় যুক্তি শূন্যস্থানের ভরঘনত্ব বা সৃষ্টিতাত্ত্বিক ধ্রুবক নির্দেশ করে না। তবে এটা (নরস্তীয় যুক্তি) শূন্যস্থানের শুধু সর্বমোট ভরঘনত্বকে নির্দেশ করে এবং এই

ভরঘনত্বে সৃষ্টিতাত্ত্বিক ধ্রুবকের সমতুল্য সহায়ক উপাদান (Contribution) অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। শূন্যস্থানের সর্বমোট ভরঘনত্বই মহাজাগতিক মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রের একটি উৎস (যে কোন সাধারণ বস্তুসহ) হিসেবে কাজ করে। সুনির্দিষ্টভাবে মহাজাগতিক সর্বমোট ভরঘনত্ব যদি বর্তমান ক্রান্তিক ভরঘনত্বের চেয়ে খুব বেশি হয় এবং এর মান যদি ঋণাত্মক হয় তাহলে মহাবিশ্ব এমন দ্রুত এর প্রসারণ ও সংকোচনের চক্রে আবর্তিত হবে যে নক্ষত্র গঠনের সময় পাবে না। জীবন ও বুদ্ধিমত্তা সৃষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় সময়ের চেয়ে এই সময় হবে অনেক কম। শূন্যস্থানের সর্বমোট ভরঘনত্ব যদি বর্তমান ক্রান্তিক ভর ঘনত্বের চেয়ে অনেক বেশি হয় এবং এর মান যদি ধনাত্মক হয়, তাহলে মহাবিশ্বের প্রসারণ অনন্তকাল ধরে চলতেই থাকবে। আদি মহাবিশ্বে সৃষ্ট বস্তুর পিন্ডসমূহ দীর্ঘ পাল্লার বিকর্ষণ বল দ্বারা একে অপরের থেকে অনেক দূরে সরে যাবে এবং গ্যালাক্সী বা নক্ষত্র গঠিত হতে না পারার কারণে কোথাও জীবন সৃষ্টি হবে না। এভাবে নরস্তীয় নীতি ব্যাখ্যা করতে পারে- কেন শূন্যস্থানের সর্বমোট ভরঘনত্ব বর্তমান ক্রান্তিক ঘনত্বের চেয়ে অনেক বেশি নয়।

এই ধরনের যুক্তিতর্কে সত্যিকার কৌতূহল উদ্দীপক বিষয় হলো, নরস্তীয় তত্ত্ব যদি সঠিক হয় তাহলে শূন্যস্থানের ভরঘনত্ব শূন্য হওয়ার প্রয়োজন পড়বে না অথবা এমন কি বর্তমান ক্রান্তিক ভরঘনত্বের চেয়ে কম হওয়ারও প্রয়োজন হবে না। দূরবর্তী কোয়াসারসমূহের লাল সরণ থেকে আমরা জানি যে মহাবিশ্বের আকার যখন বর্তমানের চেয়ে ৬ গুণ ছোট ছিল তখন থেকে মহাকর্ষীয় পিন্ডসমূহ গঠিত হতে শুরু করে। সে সময়ে সাধারণ বস্তুর ঘনত্ব বর্তমানের চেয়ে ৬^3 বা ২১৬ গুণ বেশি ছিল। শূন্যস্থানের সর্বমোট ভরঘনত্ব যদি সাধারণ বস্তুর বর্তমান মহাজাগতিক ঘনত্ব থেকে কমপক্ষে প্রায় ১০০ গুণ বেশি না হয়, তাহলে এটা (শূন্যস্থানের সর্বমোট ভরঘনত্ব) মহাকর্ষীয় পিন্ড গঠনে কোন প্রভাব রাখবে না। শূন্যস্থানের ভরঘনত্ব ক্ষুদ্রতর হলে পরবর্তী সময়ে গ্যালাক্সী গঠনে হয়তো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারতো। তবে শূন্যস্থানের সর্বমোট ভরঘনত্ব সাধারণ বস্তুর বর্তমান ঘনত্ব থেকে প্রায় ১০-২০ গুণ বেশি হলে গ্যালাক্সী গঠনের জন্য পর্যাপ্ত সময় পাওয়া যেতো। শূন্যস্থানের ধনাত্মক সর্বমোট ভরঘনত্ব কেন বস্তুর বর্তমান ভরঘনত্বের (গ্যালাক্সী এবং গ্যালাক্সী গুচ্ছসমূহের মধ্যকার কৃষ্ণ বস্তুসমূহ) চেয়ে প্রায় দশ থেকে বার গুণ কম হবে সে সম্পর্কে নরস্তীয় তত্ত্ব কোন ব্যাখ্যা প্রদান করে না। একি সম্ভব যে ক্রান্তিক ভরের ৮০% থেকে ৯০% আসবে শূন্যস্থান থেকে এবং অবশিষ্ট ক্রান্তিক ভর আসবে যে কোন এক প্রকার বা অন্য কোন প্রকার সাধারণ বস্তু (প্রধানত: কৃষ্ণবস্তু) থেকে।

সৌভাগ্যক্রমে এটা হলো এমন একটি প্রশ্ন যা জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ দ্বারা নিষ্পত্তি করা যায়। এক দিকে সাধারণ বস্তুর ভরঘনত্ব এবং অপর দিকে কণাবাদী অস্থিতির কারণে শূন্যস্থানে সৃষ্ট ভরঘনত্ব অথবা সৃষ্টিতাত্ত্বিক ধ্রুবকের কারণে সৃষ্ট ভরঘনত্ব - এই দুটোর মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য রয়েছে। অর্থাৎ মহাবিশ্বের প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ বস্তুর ভরঘনত্ব ক্রমাগত কমতে থাকতে, অথচ শূন্যস্থানের ভরঘনত্ব অপরিবর্তিত (Constant) থেকে যায়। আমরা যখন খুব বিরাট দূরত্ব বিবেচনা করি তখন এটা বিরাট ব্যবধান সৃষ্টি করে। এই ব্যবধান থেকে বুঝা যায় যে ক্রান্তিক ঘনত্বের মান সাধারণ বস্তু থেকে এসেছে নাকি তা শূন্যস্থানের সর্বমোট ভরঘনত্ব থেকে এসেছে।

শূন্যস্থানের ভরঘনত্ব বিরাট- এই বক্তব্যের স্বপক্ষে একটি যুক্তি হলো এই যে, এটা পরিমাপকৃত হাবল ধ্রুবক এবং নক্ষত্রসমূহের বয়সের মধ্যে সম্ভাব্য সংঘাত নিষ্পত্তিতে সহায়তা করবে। যদি বিবেচনা করা হয় যে মহাবিশ্বের ক্রান্তিক ঘনত্ব সাধারণ বস্তুর (Ordinary Matter) সমন্বয়ে গঠিত তাহলে মহাবিশ্বের বয়স হবে হাবল ধ্রুবকের ব্যস্তানুপাতিক। সেক্ষেত্রে হাবল ধ্রুবকের মান প্রতি সেকেন্ডে প্রতি মেগাপারসেকে ৮০ কিলোমিটার হলে পৃথিবীর বয়স দাঁড়ায় ৮০০ কোটি বছর এবং হাবল ধ্রুবকের মান প্রতি সেকেন্ডে প্রতি মেগাপারসেকে ৪০ কিলোমিটার হলে পৃথিবীর বয়স হয় ১৬০০ কোটি বছর। তবে বটিকাকার (Globular) গুচ্ছসমূহের নক্ষত্রগুলোর পর্যবেক্ষণকৃত রং ও প্রভার তুলনামূলক পরীক্ষা এবং কম্পিউটারের মাধ্যমে নক্ষত্রের বিবর্তন গণনা থেকে জানা যায় যে এই নক্ষত্রগুলোর বয়স ১২০০ কোটি থেকে ১৮০০ কোটি বছরের মধ্যে। আবার বিভিন্ন তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের প্রাপ্ত পরিমাণ পরীক্ষা করে জানা যায় যে আমাদের গ্যালাক্সীর বয়স কমপক্ষে ১০০০ কোটি বছর। যদি বিবেচনা করা হয় যে হাবল ধ্রুবকের মান বর্তমানে উল্লিখিত পাল্লার উপরের দিকে তাহলে আমরা যে ধাঁধার সম্মুখীন হই তা হলো মহাবিশ্বের বয়স এর প্রবীণতম নক্ষত্রগুলোর বয়সের চেয়ে কম। তবে এর পরিবর্তে আমরা যদি এই অনুমান করি যে, মহাবিশ্বের ভরঘনত্ব প্রধানত শূন্যস্থানের ভরঘনত্ব থেকেই আসে তাহলে মেনে নিতে হয় যে অতীতে মহাবিশ্বের ঘনত্ব ছিল নিম্নতর। ফলত মহাবিশ্বের প্রসারণ হ্রাস পেতে থাকবে এবং হাবল ধ্রুবকের প্রদত্ত যে কোন মানের জন্য মহাবিশ্ব হবে নক্ষত্রের চেয়ে বয়সে প্রবীণতর। এর ফলে মহাবিশ্বের বয়স এতটা বেশি হবে যে, প্রবীণ নক্ষত্রসমূহের সঙ্গে মহাবিশ্বের বয়সের সংঘাত থাকবে না।

শূন্যস্থানের ভরঘনত্ব বিরাট হলে, তা বিভিন্ন লালসরণ বা আপাত প্রভায় গ্যালাক্সীসমূহের গণনার ক্ষেত্রে মহাকর্ষীয় লেন্স (যে সকল গ্যালাক্সীর মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রে অধিক দূরবর্তী বস্তুসমূহের আলো একই দৃষ্টিরেখা বরাবর ফোকাস করে) হিসেবে ক্রিয়াশীল গ্যালাক্সীসমূহের গণনায় এবং লালসরণ -এর সংগে গ্যালাক্সীসমূহের আপাত আকার পরিবর্তনে প্রভাব ফেলে। এই পর্যন্ত প্রাপ্ত প্রমাণ অনুযায়ী মহাজাগতিক ভরঘনত্বে শূন্যস্থানের অবদান বিরাট নয় বলেই মনে হয়। তবে এই বিষয়ে এখনই নিশ্চিত হওয়া যায় না। সাধারণ বস্তুর বর্তমান ঘনত্বের চেয়ে শূন্যস্থানের সর্বমোট ভরঘনত্ব সত্যিকারে বেশ কম হওয়ার বিষয়টি যদি নিশ্চিত হয়, তাহলে সৃষ্টিতাত্ত্বিক ধ্রুবকের মানের নরতীয় ব্যাখ্যা অগ্রহণযোগ্য হয়ে পড়ে। শূন্যস্থানের সর্বমোট ভরঘনত্ব কেন এত কম হবে তার কোন নরতীয় ব্যাখ্যা নেই।

আমাদের প্রসারমাণ মহাবিশ্বের শূন্যস্থানের সর্বমোট ভরঘনত্ব বর্তমানে যাই হোকনা কেন, বিশ্বাস করার প্রবল কারণ রয়েছে যে পূর্ববর্তী বা আদি সময়ে শূন্যস্থানের সর্বমোট ভরঘনত্ব অত্যন্ত বেশি ছিল। পানির তাপমাত্রা $0^{\circ}C$ এর নীচে নামলে তা যেমন বরফে পরিণত হয়, তেমনি মহাবিশ্ব কতগুলো মহাজাগতিক দশারূপান্তর পর্যায় অতিক্রম করে প্রসারিত ও শীতল হয়েছে। এই সব ক্রান্তিকালে শূন্যস্থানে প্রবাহমান বিভিন্ন ক্ষেত্রসমূহ আকস্মিকভাবে তাদের মান বদল করে। এর ফলে শূন্যস্থানের শক্তিঘনত্ব এবং সমতুল্য ভরঘনত্বেরও পরিবর্তন ঘটে। যদি ক্ষেত্রসমূহ দ্রুত তাদের ভারসাম্য মানে না পৌছে তা হলে শূন্যস্থান একটি অতিরিক্ত শক্তিঘনত্ব আহরণ করবে এবং তা মহাবিশ্বের দ্রুত প্রসারণ ঘটাবে।

আশির দশকের প্রথম দিকে যখন জানা গেল যে অতিস্ফীতি (Inflation) নামে পরিচিত এই দ্রুত প্রসারণ অনেকগুলো বিদ্যমান সৃষ্টিতাত্ত্বিক সমস্যার সমাধান করবে, তখন এই ধরনের দশা পরিবৃত্তি (Phase transition) সম্পর্কে তাত্ত্বিকগণ প্রচন্ডভাবে আগ্রহী হয়ে পড়েন। সত্তরের দশকের শেষের দিকে এটা জানা ছিল যে প্রথম দিকের দশা পরিবৃত্তিসমূহ বহু সংখ্যক বিচ্ছিন্ন চুম্বক মেরু সৃষ্টি করেছিল। আর তা হলো বর্তমান মহাবিশ্বে বিদ্যমান ও পর্যবেক্ষণকৃত একক মেরুবিশিষ্ট চুম্বক সংখ্যার উচ্চসীমার সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ। অতিস্ফীতি তত্ত্ব একক মেরুর চুম্বক সংখ্যাকে নির্বিঘ্নে পর্যবেক্ষণকৃত সীমার নিচে নিয়ে আসবে। অধিক গুরুত্বপূর্ণ হলো, অতিস্ফীতিমূলক সৃষ্টিতত্ত্ব মহাজাগতিক পটভূমি বিকিরণের পর্যবেক্ষণকৃত সুসমতা (Uniformity) থেকে উদ্ভূত একটি 'ধাঁধা' সমাধান করতে পারে। আকাশের যে কোন দুটি বিন্দু থেকে আগত যে কোন দুটি আলোক রশ্মি আমাদের কাছে যদি প্রায় ২ ডিগ্রীর বেশি কোণ সৃষ্টি করে তাহলে মহাবিশ্বের বয়স যখন দশ লক্ষ বছর ছিল সেই সময়ে অবশ্যই ঐ আলোক রশ্মি দুটো তাদের উৎস থেকে নির্গত হতে হবে এবং এই দুটো আলোক রশ্মি সংকেতকেই আলোর বেগে ভ্রমণ করতে হবে। তাহলে মাইক্রোওয়েভ পটভূমি বিকিরণের তীব্রতা সকল দিকে আমরা যে প্রায় সমানরূপে পর্যবেক্ষণ করি , তা কোন বাস্তব কৌশলের (Mechanism) কারণে সৃষ্টি হয়? তা হলে ৭ ডিগ্রীর বেশি কৌণিক স্কেলে মাইক্রোওয়েভ পটভূমি বিকিরণ তাপমাত্রা প্রায় সুসম - এই ঘটনাকে আমরা কিভাবে ব্যাখ্যা করতে পারি। বিশেষত অতি সম্প্রতি কোবে উপগ্রহের পর্যবেক্ষণ থেকে আমরা কি উক্ত সুসমতা থেকে কোন বিচ্যুতি দেখতে পেয়েছি ? অতিস্ফীতি সৃষ্টিতত্ত্বে আদি অতিস্ফীতি পর্বে বাস্তব প্রক্রিয়াগুলোর জন্য প্রচুর সময় রয়েছে, যাতে বস্তু ও শক্তির বণ্টন মসৃণ হতে পারে এবং মহাজাগতিক মাইক্রোওয়েভ পটভূমি বিকিরণ তাপমাত্রায় পর্যবেক্ষণকৃত উচ্চমাত্রার সুসমতা সৃষ্টি হতে পারে।

এখন পর্যন্ত বিভিন্ন ধরনের কয়েকটি অতিস্ফীতি সৃষ্টিতত্ত্ব রয়েছে। একটি তত্ত্ব অনুযায়ী অতিস্ফীতির কারণ বিলম্বিত দশা পরিবৃত্তি (Delayed Phase Transition) নয় ; বরং অতিস্ফীতি তখনই ঘটে যখন কোন ক্ষেত্রে অস্থায়ীভাবে সৃষ্ট স্থানীয় কোয়ান্টাম অস্থিতি একটি ক্ষুদ্র অঞ্চলে শূন্যস্থানের শক্তিকে তার স্বাভাবিক মানের উপরে নিয়ে যায় এবং তারপর তা বিশাল আকারে স্ফীত হয়। এই তত্ত্ব অনুযায়ী বহু বিলিয়ন আলোকবর্ষ বিস্তৃত গ্যালাক্সীসমূহের প্রসারমাণ মেঘরূপে পৃথিবী থেকে আমরা যে মহাবিশ্ব দেখতে পাই, তা হলো শুধু একটি উপ-মহাবিশ্ব। এই উপ-মহাবিশ্ব হলো এমন এক বিশাল মহাবিশ্বের অংশ, যাতে অনন্তকাল ধরে নতুন নতুন উপ (সাব) মহাবিশ্ব জন্ম নিচ্ছে।

অতিস্ফীতি সৃষ্টিতত্ত্ব বৈশিষ্ট্যসূচক দুটো ভবিষ্যদ্বাণী করে। একটি হলো ভরঘনত্ব অবশ্যই ক্রান্তিক মানের খুব নিকটবর্তী হবে। অপরটি হলো অতিস্ফীতি সৃষ্টিতত্ত্বে মাইক্রোওয়েভ পটভূমি বিকিরণের অসমরূপতাসমূহকে কোয়ান্টাম অস্থিতি হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয় এবং মনে করা হয় যে অতিস্ফীতির কারণে এগুলো বিবর্ধিত হয়েছে। এছাড়া অতিস্ফীতি সৃষ্টিতত্ত্বে এই মর্মে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে যে উল্লিখিত অসমরূপতাসমূহের বণ্টন ২ ডিগ্রীর বেশি কৌণিক স্কেলে বৈশিষ্ট্যসূচক মসৃনতা প্রাপ্ত হয়েছে। এই দুটো ভবিষ্যদ্বাণীই গবেষণালব্ধ ফলাফলের সঙ্গে যথেষ্ট সঙ্গতিপূর্ণ।

মহাজাগতিক ভরঘনত্ব ক্রান্তিক মানের এত নিকটবর্তী যে যুক্তিসঙ্গতভাবে এই দুটো মানকে সমান ধরা যায়। উপরন্তু কোবে উপগ্রহের পর্যবেক্ষণকৃত ফলাফল থেকে মনে হয় যে মহাজাগতিক মাইক্রোওয়েভ পটভূমি বিকিরণের অসমরূপতাসমূহ একটি মসৃন বণ্টন বিধি (Flat Distribution Law) মেনে চলে। দুর্ভাগ্যক্রমে এই ভবিষ্যদ্বাণীগুলোর কোনটিই অতিস্ফীতি সৃষ্টিতত্ত্বের একক কৃতিত্ব নয়। বস্তুতপক্ষে অতিস্ফীতি সৃষ্টিতত্ত্ব উদ্ভাবনের আগেই এই দুটো ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল। এটা সুস্পষ্ট নয় যে, কি ধরনের জ্যোতির্শাস্ত্রীয় পর্যবেক্ষণ অতিস্ফীতি তত্ত্বকে কখনও নিশ্চিত করতে সক্ষম হবে। ১৯৭৭ সাল থেকে পর্যবেক্ষণমূলক সৃষ্টিতত্ত্বের আকর্ষণীয় অগ্রগতি স্ট্যান্ডার্ড মডেলের 'মহাবিস্ফোরণ তত্ত্ব' ভিত্তিক সৃষ্টিতত্ত্বকে যথেষ্ট শক্তিশালী করেছে। তবে এই অগ্রগতির ফলে তাত্ত্বিকগণ যে ভবিষ্যদ্বাণী করেন এবং জ্যোতির্বিদগণ যা পর্যবেক্ষণ করতে সক্ষম হন- এই দুইয়ের মধ্যে ফাঁক বা ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছে।

মৌলিক কণিকার পদার্থবিদ্যার সাম্প্রতিক ইতিহাস সম্পর্কেও একই রকম অনেক কিছু বলা চলে। ১৯৭৭ সালের পরের বছরগুলোতে গবেষণার চমৎকার পরম্পরা (Sequence) লক্ষ্য করা যায়। সবচেয়ে নাটকীয় হলো ১৯৮৩ থেকে ১৯৮৪ সালের মধ্যে W এবং Z কণিকার আবিষ্কার। W এবং Z কণিকা দুর্বল নিউক্লীয় বল বহন করে। এই কারণে তড়িৎ-চুম্বক বল, দুর্বল ও প্রবল নিউক্লীয় বলের সমন্বয়ে গঠিত আমাদের স্ট্যান্ডার্ড মডেলের শুদ্ধতা নিয়ে এখন আর গুরুতর সন্দেহ নেই। বিশেষত প্রবল নিউক্লীয় বলের 'Asymptotically Free' বা দূরত্ব হ্রাসের সঙ্গে অসীমতটীরূপ দুর্বল হয়ে পড়ার তত্ত্বের অব্যাহত সাফল্যের কারণে প্রায় সর্বোচ্চ ১০^{৩২} K তাপমাত্রা সম্পর্কে সপ্তম অধ্যায়ে যে ভবিষদ্বাণী করা হয়েছিল- তা এখন অচল হয়ে পড়েছে। উচ্চ তাপমাত্রায় পারমাণবিক কণিকাসমূহ যে কোয়ার্ক দ্বারা গঠিত সেই কোয়ার্কে গলে যায় এবং মহাবিশ্বের বস্তুসমূহ পুরোপুরি কোয়ার্ক, লেপটন এবং ফোটনসমূহের গ্যাস হিসেবে আচরণ করে। ১০^{৩২} K তাপমাত্রার মতো অনেক উচ্চ তাপমাত্রায় ' বস্তুর' বর্ণনা ভীষণ কঠিন হয়ে দাড়ায়। এই তাপমাত্রায় মহাকর্ষ বল অন্যান্য বলের মতই শক্তিশালী হয়ে উঠে। এই সব উচ্চ তাপমাত্রায় যে তত্ত্ব বস্তুকে নিয়ন্ত্রণ করে সে সম্পর্কে তাত্ত্বিকগণ ভবিষ্যদ্বাণী করে চলেছেন। তবে এই সব ভবিষ্যদ্বাণী প্রত্যক্ষভাবে পরীক্ষা করতে পারার সুযোগ থেকে আমাদের অবস্থান অনেক দূরে।

১৯৭৭ সাল থেকে সর্বাধিক আকর্ষণীয় ও অনুমানমূলক যে তত্ত্ব নিয়ে গবেষণা করা হয়েছে তা হলো ষ্ট্রিং তত্ত্ব (String Theory)। 'বস্তু কণিকার সমন্বয়ে গঠিত' এই বর্ণনার পরিবর্তে এই তত্ত্বে বস্তুকে তন্তুর সমন্বয়ে গঠিত হিসেবে বর্ণনা করা হয়। এই তন্তুসমূহ হলো সরু, একমাত্রিক এবং স্থানকালে বিচ্ছিন্ন (Discontinous)। এই তন্তুসমূহ অসংখ্য সম্ভাব্য স্পন্দন ধারার (Modes of Vibration) যে কোন একটিতে অবস্থান করতে পারে, যার প্রতিটি আমাদের কাছে এর একটি ভিন্ন প্রজাতির মৌলিক কণিকা রূপে প্রতীয়মান হয়। ষ্ট্রিং তত্ত্বে মহাকর্ষ শুধু যে সহজাতভাবে আসে তা-ই নয়, বরং অনিবার্যভাবেই আসে। একটি আবদ্ধ তন্তুতে মহাকর্ষীয় বিকিরণের পরিমাণ হলো এক ধরনের স্পন্দন। আধুনিক ষ্ট্রিং তত্ত্বসমূহে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ১০^{৩০} K এর কাছাকাছি হতে পারে, ১০^{৩২} K নয়।

দুর্ভাগ্যজনকভাবে 'স্ট্রিং তত্ত্বের' হাজার হাজার ভাষ্য (Version) রয়েছে। আমরা জানি না কিভাবে তাদের ফলাফল মূল্যায়ন করতে হয় অথবা একটি স্ট্রিং তত্ত্ব কেন অপরটি থেকে ভালভাবে আমাদের মহাবিশ্বকে বর্ণনা করবে তাও আমাদের জানা নেই। তবে স্ট্রিং তত্ত্বসমূহের এমন একটি দিক আছে-মহাবিশ্ব সৃষ্টিতত্ত্বের সঙ্গে যার রয়েছে সম্ভাব্য বিরাট গুরুত্ব। আমাদের সুপরিচিত চতুর্মাত্রিক স্থানকাল সন্ততি স্ট্রিং তত্ত্বের সত্যিকার মৌলিক উপকরণ নয়। তবে প্রায় $১০^{৩২}$ K তাপমাত্রার নীচে প্রকৃতিকে প্রায় সঠিক বর্ণনার ক্ষেত্রে শুধু তা কার্যকরী। এমন হতে পারে যে মহাবিশ্বের শুরুটা বুঝতে পারা বা এমন কি সত্যিকারে কোন সূচনা ছিল কি না তা নির্ণয় করা আমাদের আসল সমস্যা হবে না। তবে যে অবস্থায় প্রকৃতিতে স্থান ও কাল অর্থহীন হয়ে পড়ে সেই অবস্থার প্রকৃতিকে অনুধাবন করতে পারাই হবে আমাদের মূল সমস্যা।

ছক-১

TABLES

I. Properties of Some Elementary Particles

	Particle	Symbol	Rest energy (million electron volts)	Threshold temperature (thousand million degrees K)	Effective number of species	Mean life (seconds)
	Photon	γ	0	0	1 x 2 x 1 = 2	stable
Leptons	Neutrinos	$\nu_e, \bar{\nu}_e$	0	0	2 x 1 x 7/8=7/4	stable
Leptons		$\nu_\mu, \bar{\nu}_\mu$	0	0	2 x 1 x 7/8=7/4	stable
Leptons	Electron	e^-, e^+	0.5110	5.930	2 x 2 x 7/8=7/2	stable
Leptons	Muon	μ^-, μ^+	105.66	1226.2	2 x 2 x 7/8=7/2	2.197×10^{-6}
Hadrons	Pimesons	π^0	134.96	1566.2	1 x 1 x 1=1	0.8×10^{-16}
Hadrons		π^+, π^-	139.57	1619.7	2 x 1 x 1= 2	$260. \times 10^{-8}$
Hadrons	Proton	$p, \bar{p}$	938.26	10,888	2 x 2 x 7/8=7/2	stable
Hadrons	Neutron	$n, \bar{n}$	939.55	10,903	2 x 2 x 7/8=7/2	920

কয়েকটি মৌলিক কণিকার ধর্ম ঃ একটি কণিকার সম্পূর্ণ ভরকে শক্তিতে রূপান্তর করা হলে যে শক্তি পাওয়া যায়, তাকে স্থির শক্তি (Rest Energy) বলে। স্থিরশক্তিকে বোলত্জম্যান ধ্রুবক দিয়ে ভাগ করে সূচন তাপমাত্রা পাওয়া যায়। সূচন তাপমাত্রা হলো এমন এক তাপমাত্রা যার চাইতে বেশি তাপমাত্রায় একটি কণিকা তাপীয় বিকিরণ থেকে মুক্তভাবে সৃষ্টি হতে পারে। তাপমাত্রা যখন সূচন তাপমাত্রার অনেক উপরে থাকে তখন মোট শক্তি, চাপ ও এনট্রপি সৃষ্টিতে প্রত্যেক রকম কণিকার যে আপেক্ষিক অবদান তা কার্যকর প্রজাতির সংখ্যা (Effective Number of Species) দ্বারা নির্ধারিত। এই সংখ্যাটি (কার্যকরী সংখ্যক প্রজাতির সংখ্যা) তিনটি উৎপাদকের গুণফল হিসেবে প্রকাশ হয়। কণিকার একটি সুনির্দিষ্ট প্রতিকণিকা রয়েছে কি বা নেই তার উপর নির্ভর করে প্রথম উৎপাদকটি হবে ২ অথবা ১। কণিকার স্পিনের সম্ভাব্য সংখ্যক অবস্থানকে (Orientation) দ্বিতীয় উৎপাদক দ্বারা নির্দেশ করা হয়। তৃতীয় ও সর্বশেষ উৎপাদকের মান হবে ৭/৮ অথবা ১, যা নির্ভর করবে কণিকাটি পাউলির বর্জন নীতি অনুসরণ করে কি করে না তার উপর। তেজস্ক্রিয় ভাঙ্গনের মাধ্যমে একটি কণিকা অপর একটি কণিকায় রূপান্তরিত হতে গড়ে যে সময় লাগে সেই সময়কে বলা হয় কণিকার গড় আয়ুষ্কাল (Mean Life)।

2. *Properties of Some Kinds of Radiation*

	Wavelength (centimetres)	Photon energy (electron volts)	Black-body temperature (degrees Kelvin)
Radio (up to VHF)	> 10	<0.00001	<0.03
Microwave	0.01 to 10	0.00001 to 0.01	0.03 to 30
Infrared	0.0001 to 0.01	0.01 to 1	30 to 3000
Visible	2×10^{-5} to 10^{-4}	1 to 6	3000 to 15,000
Ultraviolet	10^{-7} to 2×10^{-5}	6 to 1000	15,000 to 3,000,000
X ray	10^{-9} to 10^{-7}	1000 to 100,000	3×10^{6} to 3×10^{8}
γray	$< 10^{-9}$	> 100,000	$> 3 \times 10^{8}$

কয়েক প্রকার বিকিরণের বৈশিষ্ট্য ঃ প্রত্যেক প্রকার বিকিরণের বৈশিষ্ট্য যে কোন একটি নির্দিষ্ট পাল্লার তরঙ্গদৈর্ঘ্য দ্বারা সজ্ঞায়িত করা হয়। প্রত্যেকটি পাল্লার তরঙ্গদৈর্ঘ্যের একটি যথোপযুক্ত পাল্লার ফোটন শক্তি থাকে। উপরের ছকে এই ফোটনের শক্তিকে ইলেকট্রন ভোল্ট হিসেবে দেওয়া হয়েছে। যে তাপমাত্রায় কৃষ্ণকায়া বিকিরণের অধিকাংশ শক্তি প্রদত্ত তরঙ্গদৈর্ঘ্যের কাছাকাছি স্থানে কেন্দ্রীভূত থাকে তাকে বলা হয় কৃষ্ণকায়া তাপমাত্রা। (উহাদরণ হিসেবে বলা যায়, পেনজিয়াস এবং উইলসন ৭.৩৫ সে.মি. তরঙ্গদৈর্ঘ্যে তাদের গ্রাহক যন্ত্রকে বিন্যস্ত করে মহাজাগতিক পটভূমি বিকিরণ আবিষ্কার করেছিলেন। এটা হলো মাইক্রোওয়েভ বিকিরণ। একটি নিউক্লিয়াসের যখন তেজস্ক্রিয় রূপান্তর ঘটে, তখন প্রতিনিধিত্বমূলকভাবে প্রায় এক মিলিয়ন ইলেকট্রন ভোল্ট ফোটন শক্তি মুক্ত হয়। তাই এটা হলো গামা রশ্মি। সূর্য পৃষ্ঠের তাপমাত্রা হলো ৫৮০০°K, এর ফলে সূর্য থেকে দৃশ্যমান আলো নির্গত হয়।) তবে বিভিন্ন প্রকার বিকিরণের এই যে শ্রেণী বিভাগ তার তীক্ষ্ণতা অবশ্যই নিখুঁত নহে এবং বিভিন্ন প্রকার তরঙ্গদৈর্ঘ্যের পাল্লার ক্ষেত্রে কোন সর্বজনীন ঐকমত্য নেই।

পরম প্রভা (ABSOLUTE LUMINOSITY) : কোন নভোবস্তু থেকে প্রতি একক সময়ে বিকীর্ণ সর্বমোট শক্তি।

এন্ড্রোমিডা নেবুলা (ANDROMEDA NEBULA) : আমাদের গ্যালাক্সীর সবচেয়ে নিকটবর্তী বিশাল গ্যালাক্সী। এটা কুন্ডলাকৃতির এবং এর ভর ৩ X ১০^{১১} টি সূর্যের ভরের সমান। এন্ড্রোমিডা ম্যাসিয়ার ক্যাটালগে M_{31} হিসেবে এবং নিউ জেনারেল ক্যাটালগে, NGC_{224} হিসেবে নির্দেশিত।

অ্যাঙ্গস্ট্রম ইউনিট (ANGSTROM UNIT) : এক সেন্টিমিটারের দশ কোটি ভাগের এক ভাগ (১০$^{-৮}$ সে.মি.)। এর প্রতীক হলো Å। প্রতিনিধিত্বমূলক কোন পরমাণুর আকার মাত্র কয়েক অ্যাঙ্গস্ট্রম। দৃশ্যমান আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য কয়েক হাজার অ্যাঙ্গস্ট্রম হয়ে থাকে।

প্রতিকণিকা (ANTI PARTICLE) : কোন কণিকা যার ভর এবং স্পিন অন্য একটি কণিকার ভর ও স্পিনের সমান অথচ যার বৈদ্যুতিক আধান, ব্যারিয়ন নম্বর, লেপটন নম্বর ইত্যাদি বিপরীত। সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ কয়েকটি কণিকা যেমন ফোটন ও পাইমেসন ইত্যাদি ছাড়া প্রত্যেকটি কণিকারই একটি যথোপযুক্ত (Corresponding) প্রতিকণিকা রয়েছে। ফোটনকেই ফোটনের এবং পাইমেসনকেই পাইমেসনের প্রতিকণিকা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এন্টিনিউট্রনো হলো নিউট্রনোর প্রতিকণিকা এবং এন্টিপ্রোটন হলো প্রোটনের প্রতিকণিকা এবং এমনি আরো রয়েছে। এন্টিপ্রোটন, এন্টিনিউট্রনো এবং এন্টিইলেকট্রন বা পজিট্রন দিয়ে প্রতিপদার্থ (Anti-matter) গঠিত।

আপাত প্রভা (APPARENT LUMINOSITY) : কোন নভোবস্তু থেকে গ্রাহক পৃষ্ঠের প্রতি একক ক্ষেত্র ফলে প্রতি সেকেন্ডে প্রাপ্ত মোট শক্তি।

অসীমতটী স্বাধীনতা (ASYMPTOTIC FREEDOM) : প্রবল মিথস্ক্রিয়ার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য ক্ষেত্র তত্ত্বের, যার ফলে কণিকাসমূহের মধ্যে দূরত্ব কমতে থাকার প্রেক্ষিতে এদের মধ্যকার বল উত্তরোত্তর হ্রাস পায়।

ব্যারিয়ন (BARYONS) : এক শ্রেণীর কণিকা যা প্রবল মিথস্ক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করে। নিউট্রন, প্রোটন ও হাইপেরন নামে পরিচিত অস্থায়ী হ্যাড্রন, কণিকাসমূহ এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। একটি সিস্টেমে বিদ্যমান সর্বমোট ব্যারিয়ন সংখ্যা থেকে সর্বমোট এন্টি

ব্যারিয়ন সংখ্যা বিয়োগ করলে যে বিয়োগফল পাওয়া যায়, তাই হলো ব্যারিয়ন সংখ্যা।

মহাবিস্ফোরণ সৃষ্টিতত্ত্ব (BIG BANG COSMOLOGY) : এই তত্ত্ব অনুযায়ী অতীতের কোন এক সসীম সময়ে প্রচন্ড তাপ ও চাপের ঘনীভূত অবস্থা থেকে একটি বিস্ফোরণের মাধ্যমে মহাবিশ্বের প্রসারণ শুরু হয়েছে।

কৃষ্ণকায়া বিকিরণ (BLACKBODY RADIATION) : সকল তরঙ্গদৈর্ঘ্যের বিকিরণ সম্পূর্ণরূপে শোষণ করতে সক্ষম, এমন উত্তপ্ত বস্তু থেকে বিকিরণের শক্তিঘনত্ব যে কোন পাল্লার তরঙ্গদৈর্ঘ্যের ক্ষেত্রে অভিন্ন। যে কোন স্তরের তাপীয় স্থিতাবস্থার বিকিরণকে কৃষ্ণকায়া বিকিরণ বলে।

বোলতজম্যান ধ্রুবক (BOLTZMANN'S CONSTANT) : পরিসংখ্যানগত বলবিদ্যার একটি মৌলিক ধ্রুবক যা তাপমাত্রার স্কেল ও শক্তির এককের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করে। সাধারণত K বা K_B দ্বারা প্রকাশ করা হয়। এর মান হলো প্রতি ডিগ্রী কেলভিনে ১.৩৮০৬ X $১০^{-১৬}$ আর্গ অথবা ০.০০০০৮৬১৭ ইলেকট্রন ভোল্ট।

নীল সরণ (BLUE SHIFT) : ডপলার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আমাদের (বা পৃথিবীর) দিকে আগত বস্তু থেকে নি:সৃত আলোকরশ্মি ক্ষুদ্রতর তরঙ্গদৈর্ঘ্যের দিকে সরে যাওয়া।

শেফালী বিষম (CEPHEID VARIABLES) : পরিবর্তনশীল উজ্জ্বল নক্ষত্রসমূহ যাদের পরম প্রভা, পরিবর্তনশীলতার সময়কাল এবং রঙের মধ্যে সুনির্দিষ্ট সম্পর্ক রয়েছে। সিফিয়াস নক্ষত্রমন্ডলে সিরিয়া নক্ষত্রের নামে এই নাম রাখা হয়েছে। অপেক্ষাকৃত নিকটবর্তী নক্ষত্রসমূহের দূরত্বের নির্দেশক হিসেবে এটি ব্যবহৃত হয়।

বৈশিষ্ট্যসূচক প্রসারণ সময় (CHARACTERISTIC EXPANSION TIME) : বৈশিষ্ট্যসূচক প্রসারণ সময়ের সঙ্গে হাবল ধ্রুবকের সম্পর্ক হলো ব্যস্তানুপাতিক। যে সময়ে মহাবিশ্বের আকার মোটামুটি শতকরা একভাগ বৃদ্ধি পায় সেই সময়ের একশত গুণ সময়কে বৈশিষ্ট্যসূচক প্রসারণ সময় বলে।

সংরক্ষণশীলতার বিধি (CONSERVATION LAW) : যে বিধি অনুসারে যে কোন বিক্রিয়ায় বিশেষ কয়েকটি সংখ্যার সর্বমোট মান কখনো পরিবর্তিত হয় না।

মহাজাগতিক রশ্মি (COSMIC RAYS) : বর্হিবিশ্ব থেকে আমাদের পৃথিবীর বায়ুমন্ডলে আগত উচ্চশক্তি সম্পন্ন চার্জযুক্ত কণিকাসমূহ।

মহাজাগতিক ধ্রুবক (COSMOLOGICAL CONSTANT) : যে পদটি আইনস্টাইন ১৯১৭ সালে তার মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র সমীকরণসমূহে অন্তর্ভুক্ত করেন। এই পদ অত্যন্ত বিশাল দূরত্বের বস্তুসমূহের মধ্যে বিকর্ষণ সৃষ্টি করে, যা মহাকর্ষ বলের কারণে সৃষ্ট আকর্ষণের ভারসাম্য রক্ষা করে একটি স্থির মহাবিশ্বের মডেল উপস্থাপন করে। বর্তমানে মহাজাগতিক ধ্রুবকের অস্তিত্ব নিয়ে সন্দেহ পোষণ করার কোনো কারণ নেই।

মহাজাগতিক তত্ত্বের সূত্র (COSMOLOGICAL PRINCIPLE) : যে প্রকল্প বা অনুমান অনুযায়ী মহাবিশ্ব দিক-নিরপেক্ষ এবং সমসত্ত্ব।

ক্রান্তিক ঘনত্ব (CRITICAL DENSITY) : মহাবিশ্বের প্রসারণ প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে শেষ পর্যন্ত সংকোচন প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার জন্য মহাজাগতিক ভরঘনত্বের বর্তমানে যে ন্যূনতম মানের প্রয়োজন। মহাজাগতিক ঘনত্ব যদি ক্রান্তিক ঘনত্বের চেয়ে বেশি হয়, তাহলে মহাবিশ্ব স্থানিকভাবে সসীম হবে।

ক্রান্তিক তাপমাত্রা (CRITICAL TEMPERATURE) : যে তাপমাত্রায় দশা পরিবৃত্তি ঘটে।

সাইনোজেন (CYNOGEN) : এমন একটি রাসায়নিক যৌগ, যা কার্বন ও নাইট্রোজেন দ্বারা গঠিত। দৃশ্যমান আলো শোষণের ফলে আন্তনাক্ষত্রিক স্থানে এদের অস্তিত্ব ধরা পড়ে।

মন্দন প্যারামিটার (DECELERATION PARAMETER) : দূরবর্তী গ্যালাক্সীসমূহের দূরাপসরণের গতি যে হারে হ্রাস পেতে থাকে তার হার পরিমাপক সংখ্যা।

ঘনত্ব (DENSITY) : প্রতি একক আয়তনে বস্তুর পরিমাণ। ভরঘনত্ব হচ্ছে প্রতি একক আয়তনে বিদ্যমান ভর। তেমনি শক্তিঘনত্ব হলো প্রতি একক আয়তন স্থানে বিদ্যমান শক্তির পরিমাণ। প্রতি একক আয়তন স্থানে বিদ্যমান কণিকার সংখ্যা হলো সংখ্যা ঘনত্ব বা কণিকা ঘনত্ব।

ডিউটেরিয়াম (DEUTERIUM) : হাইড্রোজেনের একটি ভারী আইসোটোপ, H^2। ডিউটেরিয়ামের নিউক্লিয়াসকে 'ডিউট্রন' বলা হয় এবং ডিউট্রনে থাকে একটি প্রোটন ও একটি নিউট্রন।

ডপলার প্রক্রিয়া (DOPPLER EFFECT) : তরঙ্গের উৎস ও পর্যবেক্ষকের আপেক্ষিক গতির জন্য উদ্ভূত কোন সংকেতের কম্পাংকে যে পরিবর্তন ঘটে।

ইলেকট্রন (ELECTRON) : সবচেয়ে হালকা স্থায়ী মূল কণিকা। ইলেকট্রনসমূহের পরস্পরের সঙ্গে ও পরমাণুর নিউক্লিয়াস- এর সঙ্গে মিথস্ক্রিয়ার কারণে অণু ও পরমাণুর মধ্যকার সকল রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য নির্ধারিত হয়।

ইলেকট্রন ভোল্ট (ELECTRON VOLT) : পারমাণবিক পদার্থবিদ্যায় ব্যবহৃত শক্তির একক। এক ভোল্ট বিভব ব্যবধানের জন্য একটি ইলেকট্রন যে পরিমাণ শক্তি আহরণ করে তা হলো এক ইলেকট্রন ভোল্ট। এই শক্তির পরিমাণ ১.৬০২১৯×১০^{-১২} আর্গ।

এন্ট্রপি (ENTROPY) : পরিসংখ্যানগত পদার্থবিদ্যার একটি মৌলিক সংখ্যা, যা একটি ভৌততন্ত্রের বিশৃংখলার মানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। অবিরাম তাপীয় ভারসাম্যাবস্থায় রয়েছে, এমন যে কোন প্রক্রিয়ায় এন্ট্রপি সংরক্ষিত থাকে। তাপ বলবিদ্যার দ্বিতীয় বিধি অনুযায়ী যে কোন বিক্রিয়ায় এন্ট্রপি কখনো হ্রাস পায় না।

আর্গ (ERG) : সি.জি.এস. (সেন্টিমিটার গ্রাম সেকেন্ড) পদ্ধতিতে শক্তির একক। একগ্রাম ভরের কোন বস্তু প্রতি সেকেন্ডে যদি এক সেন্টিমিটার বেগে চলে, তবে বস্তুর গতিশক্তি হবে অর্ধ আর্গ।

ফাইনম্যান ডায়াগ্রাম (FEYNMAN DIAGRAMS) : এমন কতগুলো ডায়াগ্রাম বা চিত্র যা একটি মৌলিক কণিকার বিক্রিয়ার হারে বিভিন্ন সহায়ক বলের প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

ফাইন ষ্ট্রাকচার ধ্রুবক (FINE STRUCTURE CONSTANT) : পারমাণবিক পদার্থবিদ্যা এবং কোয়ান্টাম তড়িৎ বলবিদ্যার সংখ্যাসূচক মৌলিক ধ্রুবক। এই ধ্রুবককে সজ্ঞায়িত করা হয় ইলেকট্রনের আধানের বর্গ এবং প্লাংক ধ্রুবক ও আলোর বেগের গুণফলের অনুপাত রূপে। এর প্রতীক হলো α এবং মান ১/১৩৭.০৩৬।

কম্পাংক (FREQUENCY) : তরঙ্গ সঞ্চারণকারী কোন কণা এক সেকেন্ডে যতগুলো স্পন্দন সম্পন্ন করে। তরঙ্গের গতিকে তরঙ্গদৈর্ঘ্য দিয়ে ভাগ করলে কম্পাংক পাওয়া যায়। প্রতি সেকেন্ডে যতটি স্পন্দন অতিক্রম করে তা দ্বারা কম্পাংক পরিমাপ করা হয়। এর একক হলো হার্জ।

ফ্রিডম্যান মডেল (FRIEDMANN MODEL) : আপেক্ষিকতার সাধারণ তত্ত্ব (মহাজাগতিক ধ্রুবক শূন্য ধরে) এবং মহাজাগতিক তত্ত্বের সূত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত গাণিতিক মডেলে মহাবিশ্বের স্থান-কাল কাঠামো।

গ্যালাক্সী (GALAXY) : মহাকর্ষ বলে আবদ্ধ নক্ষত্রসমূহের বিরাট স্তবক বা সমাবেশ। একটি গ্যালাক্সীতে $১০^{১১}$ সংখ্যক নক্ষত্র থাকতে পারে। গ্যালাক্সীগুলোকে সাধারণত এদের আকার অনুযায়ী শ্রেণী বিন্যাস করা হয়। যেমন উপবৃত্তাকার,কুন্ডলিত, দন্ডাকার কুন্ডলিত, অনিয়মিত।

গেজ তত্ত্ব (GAUGE THEORIES) : এক প্রকারের ক্ষেত্র তত্ত্ব। দুর্বল কেন্দ্রকীয়, প্রবল কেন্দ্রকীয় ও তড়িৎ চুম্বক বলের মিথষ্ক্রিয়ার সম্ভাব্য তত্ত্ব হিসেবে এগুলো নিয়ে বর্তমানে ব্যাপক গবেষণা চলছে। 'গেজ' শব্দটি এসেছে একটি সাধারণ ইংরেজী শব্দ থেকে যার অর্থ হলো পরিমাপ করা। তবে ঐতিহাসিক কারণেই প্রধানত: এই শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

আপেক্ষিকতার সাধারণ তত্ত্ব (GENERAL RELATIVITY) : ১৯০৬ থেকে ১৯১৬ সালের মধ্যে আলবার্ট আইনস্টাইন মহাকর্ষ বলের নতুন তত্ত্ব উদ্ভাবন করেন। আইনস্টাইনের উদ্ভাবিত আপেক্ষিকতার সাধারণ তত্ত্বের মূল ধারণা অনুসারে মহাকর্ষ হচ্ছে স্থান-কাল সন্ততির বক্রতার ফসল।

মহাকর্ষীয় তরঙ্গ (GRAVITATIONAL WAVES) : তড়িৎ চুম্বক ক্ষেত্রে সৃষ্ট আলোর তরঙ্গসমূহের সঙ্গে মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রে সৃষ্ট তরঙ্গসমূহ তুলনীয়। মহাকর্ষীয় তরঙ্গও আলোক তরঙ্গের বেগে অর্থাৎ প্রতি সেকেন্ডে ২৯৯,৭৯২ কিলোমিটার বেগে ভ্রমণ করে। মহাকর্ষীয় তরঙ্গের পক্ষে সাধারণভাবে গৃহীত কোন পরীক্ষালব্ধ সাক্ষ্য নেই। তবে আপেক্ষিকতার সাধারণ তত্ত্বে মহাকর্ষীয় তরঙ্গের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়েছে এবং মহাকর্ষীয় তরঙ্গের অস্তিত্ব সম্পর্কে গুরুতর কোন সন্দেহ নেই। বিকীর্ণ আলোর কোয়ান্টামকে যেমন বলা হয় ফোটন, তেমনি মহাকর্ষীয় বিকিরণের কোয়ান্টামকে বলা হয় গ্রাভিটন।

হ্যাড্রন (HADRON) : প্রবল মিথষ্ক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করে এমন যে কোন কণিকা। হ্যাড্রনকে ব্যারিয়ন ও মেসন এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। ব্যারিয়ন শ্রেণীর কণিকাগুলো (যেমন নিউট্রন ও প্রোটন) পাউলির বর্জন নীতি মেনে চলে। তবে মেসন শ্রেণীর কণিকাগুলো পাউলির বর্জন নীতি মেনে চলে না।

হিলিয়াম (HELIUM) : রাসায়নিক মৌলের মধ্যে মহাবিশ্বে প্রাচুর্য্যের দিক থেকে এবং

হালকা কর্নিকার মধ্যে হিলিয়ামের অবস্থান দ্বিতীয়। হিলিয়ামের দুটো স্থায়ী আইসোটোপ রয়েছে, H^3 এবং H^4। এর নিউক্লিয়াসে রয়েছে দুটো প্রোটন ও দুটো নিউট্রন। H_3 এর নিউক্লিয়াসে থাকে দুটো প্রোটন ও একটি নিউট্রন। হিলিয়ামের পরমাণুতে নিউক্লিয়াসের বাইরে দুটো ইলেকট্রন থাকে।

সমসত্ত্বতা (HOMOGENEITY) : মহাবিশ্বের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে এই অনুমান রয়েছে যে একটি নির্দিষ্ট সময়ে প্রতিনিধিত্বমূলক বিভিন্ন পর্যবেক্ষককে মহাবিশ্বের যে কোন স্থানেই নিয়ে যাওয়া হোক না কেন বিভিন্ন পর্যবেক্ষক সকল স্থান থেকে মহাবিশ্বকে একই রকম অর্থাৎ সমসত্ত্ব দেখতে পাবেন।

দিগন্ত (HORIZON) : মহাবিশ্ব সৃষ্টিতত্ত্বে সেই দূরত্ব যেখান থেকে বাইরের কোন আলোক সংকেত আমাদের নিকট এসে পৌছতে পারে না। মহাবিশ্বের যদি কোন একটি সুনির্দিষ্ট বয়স থাকে তবে সেই সময়কে আলোর বেগ দিয়ে গুণকরে আমরা দিগন্তের দূরত্ব নির্ণয় করতে পারি।

হাবলের বিধি (HUBBLE'S LAW) : দূরবর্তী গ্যালাক্টীসমূহের দূর অপসারণ বেগ এবং এদের দূরত্বের অনুপাতিকতার সম্পর্ক। হাবল ধ্রুবক হলো উল্লিখিত বেগ ও দূরত্বের সম্পর্কের অনুপাত যা H বা H_0 দ্বারা নির্দেশ করা হয়।

হাইড্রোজেন (HYDROGEN) : সবচেয়ে হালকা এবং মহাবিশ্বে প্রাচুর্যের দিক থেকে সর্বাধিক পরিমাণের রাসায়নিক পদার্থ। সাধারণ হাইড্রোজেনের নিউক্লিয়াসে একটি মাত্র প্রোটন থাকে। হাইড্রোজেনের দুটো ভারী আইসোটোপ হলো ডিউটেরিয়াম এবং ট্রিটিয়াম। হাইড্রোজেনের যে কোন পরমাণু হাইড্রোজেন নিউক্লিয়াস এবং একটি ইলেকট্রন সমন্বয়ে গঠিত। ধনাত্বক হাইড্রোজেন নিউক্লিয়াস এবং একটি ইলেকট্রন সমন্বয়ে গঠিত। ধনাত্বক হাইড্রোজেন আয়নে ইলেকট্রন থাকে না।

হাইড্রোক্সিল আয়ন (HYDROXYL ION) : OH, একটি অক্সিজেন পরমাণু, একটি হাইড্রোজেন পরমাণু ও একটি অতিরিক্ত নিয়ে ইলেকট্রন গঠিত।

অবলোহিত বিকিরণ (INFRARED RADIATION) : ০.০০০১ সে.মি. থেকে ০.০১ সে.মি. পর্যন্ত তরঙ্গদৈর্ঘ্যের তড়িৎ-চুম্বক বিকিরণ। দৃশ্যমান আলো এবং মাইক্রোওয়েভ বিকিরণের তরঙ্গদৈর্ঘ্যের মাঝামাঝি এর অবস্থান। কক্ষ তাপমাত্রায় বস্তু থেকে প্রধানত এই অবলোহিত পাল্লার বিকিরণ ঘটে।

দিক-নিরপেক্ষতা (ISOTROPY) : মহাবিশ্বের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে এই অনুমান যে, কোন একজন প্রতিনিধিত্বমূলক পর্যবেক্ষক মহাবিশ্বের যে কোন দিকেই তাকান না কেন, তিনি একই রকম অবস্থা দেখতে পাবেন।

জিনস ভর (JEANS MASS) : ন্যূনতম যে ভর থাকলে মহাকর্ষীয় আকর্ষণ বল অভ্যন্তরীণ চাপকে অতিক্রম করে, মহাকর্ষীয় বলে আবদ্ধ একটি পিণ্ড গঠন করতে পারে।

কেলভিন (KELVIN) : সেন্টিগ্রেড স্কেলের মতোই তাপমাত্রার একটি স্কেল। তবে এই স্কেলে পরমশূন্য তাপমাত্রাকে শূন্য তাপমাত্রা হিসেবে গণ্য করা হয় ; বরফের গলনাংককে নয়। কেলভিন স্কেলে এক বায়ুমন্ডলীয় চাপে বরফের গলনাংক

লেপটন (LEPTON) : প্রবল মিথস্ক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করে না এমন এক শ্রেণীর কণিকা। এর মধ্যে রয়েছে ইলেকট্রন, মিউয়ন এবং নিউট্রিনো। কোন একটি ব্যবস্থায় (SYSTEM) বিদ্যমান সর্বমোট লেপটন সংখ্যা থেকে সর্বমোট এন্টি লেপটন সংখ্যা বিয়োগ করলে যে বিয়োগফল পাওয়া যায়, তাই হলো লেপটন সংখ্যা।

আলোকবর্ষ (LIGHT YEAR) : একটি আলোকরশ্মি এক বছরে যে দূরত্ব অতিক্রম করে তাকে এক আলোকবর্ষ বলে। এর মান ৯.৪৬০৫ মিলিয়ন মিলিয়ন কিলোমিটার।

সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (MAXIMUM TEMPERATURE) : প্রবল মিথস্ক্রিয়ার কতিপয় তত্ত্ব দ্বারা নির্ধারিত তাপমাত্রার উচ্চতম সীমা। তরঙ্গ তত্ত্ব অনুযায়ী প্রাক্কলিত এই তাপমাত্রার উচ্চতম সীমা হলো দুই মিলিয়ন মিলিয়ন ডিগ্রী কেলভিন।

গড় মুক্ত পথ (MEAN FREE PATH) : গ্যাসের গতি তত্ত্ব অনুসারে গ্যাসের অণুগুলো সব সময় পরস্পরের সঙ্গে এবং পাত্রের দেয়ালের সাথে ধাক্কা খায়। পরপর দুটি ধাক্কার মধ্যে যে কোন অণু বা কণিকা যে গড় দূরত্ব অতিক্রম করে তাকে ঐ অণু বা কণিকার গড় মুক্ত পথ বলা হয়। পরপর দুটি সংঘর্ষের মধ্যে যে গড় সময়ের প্রয়োজন হয়,তাকে গড় মুক্ত সময় বলে।

মেসন (MESONS) : প্রবল মিথস্ক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করে এমন এক শ্রেণীর কণিকা। পাইমেসন, কে মেসন, রো মেসন এবং এরকম আরো কিছু কণিকা এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এদের ব্যারিয়ন সংখ্যা শূন্য।

মেসিয়ার সংখ্যা (MESSIER NUMBERS) : চার্লস মেসিয়ার কর্তৃক প্রণীত তালিকায় বিভিন্ন নীহারিকা এবং নক্ষত্রের স্তবক বা সমাবেশকে যে সংখ্যা দিয়ে নির্দেশ করা হয়েছে। যেমন এন্ড্রোমিডা নীহারিকা হলো, M_{31}।

মাইক্রোওয়েভ বিকিরণ (MICROWAVE RADIATION) : ০.০১ সে.মি. থেকে ১০ সে.মি. তরঙ্গদৈর্ঘ্যের তড়িৎ-চুম্বক বিকিরণ। অতি উচ্চ কম্পাংকের বেতার তরঙ্গের তরঙ্গদৈর্ঘ্য এবং অবলোহিত বিকিরণের তরঙ্গদৈর্ঘ্যের মধ্যবর্তী স্থানে এর অবস্থান। মাইক্রোওয়েভ বিকিরণ প্রধানত কয়েক ডিগ্রী কেলভিন তাপমাত্রায় ঘটে থাকে।

ছায়াপথ বা আকাশ গঙ্গা (MILKY WAY) : নক্ষত্রসমূহের বন্ধনী যা আমাদের নিজস্ব গ্যালাক্সীর তল নির্দেশ করে। এটি একটি প্রাচীন নাম। কখনো কখনো আমাদের নিজস্ব গ্যালাক্সীকেই আকাশ গঙ্গা বা ছায়াপথ নামে অভিহিত করা হয়।

মিউয়ন (MUON) : ইলেকট্রনের মতো ঋনাত্মক আধান বিশিষ্ট এক শ্রেণীর অস্থায়ী মৌলিক কণিকা, তবে ইলেকট্রনের তুলনায় ২০৭ গুণ ভারী। মিউয়নের প্রতীক হলো μ। মিউয়নকে কখন কখনো মিউমেসন নামে অভিহিত করা হয়। তবে সত্যিকার মেসন কণিকার মতো প্রবল মিথস্ক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করে না।

নীহারিকা (NEBULAE) : গ্যাসীয় মেঘের মতো বর্ধিত জ্যোতিঃশাস্ত্রীয় বস্তু। কিছু কিছু নীহারিকা হলো গ্যালাক্সী। অন্যান্যগুলো আমাদের নিজস্ব গ্যালাক্সীতে অবস্থিত সত্যিকার ধুলো ও গ্যাসের মেঘ।

নিউট্রিনো (NEUTRINO) : বৈদ্যুতিক আধান নিরপেক্ষ ভরহীন এক প্রকারের কণিকা। শুধু দুর্বল এবং মহাকর্ষীয় বলে মিথস্ক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে। নিউট্রিনোর প্রতীক হলো ν। কমপক্ষে ইলেকট্রন টাইপ ও মিউয়ন টাইপ এই দুই প্রকারের নিউট্রিনো রয়েছে।

নিউট্রন (NEUTRON) : সাধারণ পরমাণুর নিউক্লিয়াসে প্রোটনের সঙ্গে আধান শূন্য যে কণিকা থাকে, তাকে নিউট্রন বলে। নিউট্রনের প্রতীক হলো n।

নিউটনের ধ্রুবক (NEWTON'S CONSTANT) : নিউটন ও আইনস্টাইনের মহাকর্ষ বলের সূত্রসমূহের মৌলিক ধ্রুবক। G দ্বারা নির্দেশ করা হয়। নিউটনের সূত্র অনুযায়ী দুটো বস্তুর মধ্যকার আকর্ষণ বল হলো এ এবং বস্তুদ্বয়ের ভরের গুণফলের সমানুপাতিক এবং বস্তুদ্বয়ের মধ্যকার দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক। মেট্রিক পদ্ধতিতে G এর মান হলো ৬.৬৭ X $১০^{-৮}$ সে.মি.^{৩} / গ্রাম সেকেন্ড।

পারমাণবিক গণতন্ত্র (NUCLEAR DEMOCRACY) : এই মতবাদ অনুযায়ী সকল হ্যাড্রনই সমানভাবে মৌলিক।

পারমাণবিক কণিকা (NUCLEAR PARTICLES) : সাধারণ পরমাণুর নিউক্লিয়াসে বিদ্যমান প্রোটন ও নিউট্রন কণিকা। সচরাচর সংক্ষিপ্ত রূপ হলো নিউক্লিয়নস।

পারসেক (PARSEC) : দূরত্বের জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ক একক। এটি সজ্ঞায়িত করা হয় বস্তুর দূরত্ব রূপে যার প্যারালাক্স (সূর্যের চারদিকে পৃথিবীর আবতর্নের কারণে বার্ষিক সরণ) বৃত্তের পরিধির অথবা চাপের এক সেকেন্ড হয়। সংক্ষেপে একে বলা হয় Pc। এই দূরত্ব হলো ৩.০৮৫৬ X $১০^{১৩}$ কিলোমিটার, বা ৩.২৬১৫ আলোকবর্ষ। জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ক রচনায় আলোকবর্ষের চেয়ে পারসেককে অধিক গুরুত্ব সহকারে ব্যবহার করা হয়। মহাবিশ্ব সৃষ্টিতত্ত্বের প্রচলিত একক হলো এক মিলিয়ন পারসেক বা মেগাপারসেক, সংক্ষেপে Mpc। হাবল ধ্রুবকের মান সাধারণত প্রতি সেকেন্ডে প্রতি মেগাপারসেক কিলোমিটার হিসেবে প্রকাশ করা হয়।

পাউলির বর্জন নীতি (PAULI EXCLUSION PRINCIPLE) : এই নীতি অনুযায়ী এক ধরনের কোন দুটো কণিকা একই কোয়ান্টাম অবস্থায় থাকতে পারে না। ব্যারিয়ন ও লেপটন শ্রেণীর কণিকা এই নীতি মেনে চলে, তবে ফোটন বা মেসন এই নীতি মেনে চলে না।

দশা পরিবৃত্তি/পর্যায় ক্রান্তিকাল (PHASE TRANSITION) : প্রতিসাম্য পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে একটি ব্যবস্থা এক দশা থেকে হঠাৎ অন্য এক দশায় পরিবৃত্তির নীতি। গলন, স্ফুটন এবং সাধারণ পরিবাহকতা থেকে অতি পরিবাহকতায় পরিবৃত্তি- সব কিছুই এর উদাহরণ।

ফোটন (PHOTON) : কোয়ান্টাম তত্ত্ব অনুযায়ী আলো বা যে কোন বিকিরণ সর্বদা গুচ্ছ গুচ্ছভাবে বা প্যাকেটরূপে নির্গত, শোষিত বা সঞ্চালিত হয়। এই প্যাকেটগুলোকে 'বিকিরণ কোয়ান্টা' বা ফোটন বলে। ফোটন কণিকা ভরহীন বা আধানহীন। γ দ্বারা এটি নির্দেশ করা হয়।

পাইমেসন (PI MESON) : হ্যাড্রন শ্রেণীর মধ্যে সবচেয়ে কম ভরের কণিকা। এরা তিন প্রকার, ধনাত্মক আধান বিশিষ্ট কণিকা π^{+}, ঋনাত্মক আধান বিশিষ্ট এর

প্রতিকণিকা π^- এবং সামান্য কিছুটা হালকা নিরপেক্ষ কণিকা π^0, পাইমেসন কে কখনো কখনো পাইয়ন বলা হয়।

প্লাংক ধ্রুবক (PLANCK'S CONSTANT) : কোয়ান্টাম বলবিদ্যার মৌলিক ধ্রুবক। h প্রতীকে এটি নির্দেশ করা হয়। এর মান হলো ৬.৬২৫ X $১০^{-২৭}$ আর্গ সেকেন্ড। প্লাংকের কৃষ্ণকায়া বিকিরণ তত্ত্বে ১৯০০ সালে সর্বপ্রথম এই ধ্রুবক অন্তর্ভুক্ত করা হয়। পরবর্তীতে ১৯০৫ সালে আইনস্টাইনের ফোটন তত্ত্বে একে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। একটি ফোটনের শক্তি হলো প্লাংকের ধ্রুবক ও আলোর গতির গুণফলকে তরঙ্গদৈর্ঘ্য দিয়ে ভাগ করলে যে মান পাওয়া যায় তার সমান।

প্লাংক বণ্টন (PLANCK DISTRIBUTION) : তাপীয় স্থিতাবস্থায় বিভিন্ন তরঙ্গদৈর্ঘ্যের বিকিরণে শক্তির বণ্টন। অর্থাৎ কৃষ্ণকায়া বিকিরণের বিভাজন।

পজিট্রন (POSITRON) : ধনাত্মক আধান বিশিষ্ট ইলেকট্রনের প্রতিকণিকা। e^+ দ্বারা এটি নির্দেশ করা হয়।

সঠিক গতি (PROPER MOTION) : আড়াআড়ি গতির কারণে আমাদের দৃষ্টিরেখায় নক্ষত্র বা নভো বস্তুর আকাশে অবস্থান পরিবর্তনকে সঠিক গতি বলে। সাধারণত প্রতি বছরে চাপের বা বৃত্তের পরিধির সেকেন্ড হিসেবে এটি পরিমাপ করা হয়।

প্রোটন (PROTON) : সাধারণ পরমাণুর নিউক্লিয়াসে নিউট্রনের সঙ্গে বিদ্যমান ধনাত্মক আধান বিশিষ্ট কণিকা। P দ্বারা এটি নির্দেশ করা হয়। হাইড্রোজেনের নিউক্লিয়াস একটি মাত্র প্রোটন দ্বারা গঠিত।

কোয়ান্টাম বলবিদ্যা (QUANTUM MECHANICS) : পদার্থবিদ্যার মৌলিক তত্ত্ব যা চিরায়ত বলবিদ্যাকে প্রতিস্থাপন করার লক্ষ্যে ১৯২০ সালে উদ্ভাবন করা হয়। কোয়ান্টাম বলবিদ্যায় তরঙ্গ এবং কণা হলো এক অভিন্ন সত্তার দুটো রূপ। একটি আলোক তরঙ্গের মধ্যে যে কণাগুলো সঞ্চারিত হয় সেগুলো এর কোয়ান্টাম। পরমাণু বা অণুর মতো একটি আবদ্ধ ব্যবস্থায় দশাগুলো মাত্র নির্দিষ্ট কয়েকটি স্বতন্ত্র শক্তিস্তরে বিদ্যমান থাকে, শক্তিকে কোয়ান্টায়িত বলা হয়।

কোয়ার্ক (QUARKS) : কল্পিত মৌলিক কণিকা যা দিয়ে সকল হ্যাড্রন গঠিত হয়েছে বলে অনুমান করা হয়। কোন স্বতন্ত্র কোয়ার্ক কখনো দেখা যায় নি এবং তত্ত্বগত কারণে সন্দেহ করা হয় যে, যদিও কোন কোন অর্থে বাস্তব, তবু কোয়ার্ককে কখনও স্বতন্ত্র কণিকা হিসেবে দেখতে পাওয়া যাবে না।

আধা নাক্ষত্রিক বস্তু (QUASI STELLAR OBJECTS) : নক্ষত্র সদৃশ অত্যন্ত ক্ষুদ্র ও মৌলিক আকৃতির এক শ্রেণীর আধা নাক্ষত্রিক বস্তু, তবে এদের রয়েছে অতি উচ্চ মানের লালসরণ। কখনো কখনো এদেরকে কোয়েসার বলা হয়। এদের মধ্যে যেগুলো শক্তিশালী বেতার তরঙ্গের উৎস হিসেবে ক্রিয়াশীল থাকে, সেগুলোকে বলা হয় আধানাক্ষত্রিক উৎস। এদের সত্যিকার বৈশিষ্ট্য বা প্রকৃতি জানা যায় নি।

রেলি জিনস সূত্র (RAYLEIGH JEANS LAW) : শক্তিঘনত্ব এবং তরঙ্গদৈর্ঘ্যের মধ্যকার সরল সম্পর্ক যা প্লাংক বিভাজনের দীর্ঘ তরঙ্গদৈর্ঘ্য সীমার জন্য প্রযোজ্য। এই সীমার মধ্যে শক্তিঘনত্ব হলো তরঙ্গদৈর্ঘ্যের চতুর্থ ঘাতের ব্যস্তানুপাতিক।

রিকম্বিনেশন (RECOMBINATION) : পরমাণুর নিউক্লিয়াস ও ইলেকট্রন একত্রিত হয়ে সাধারণ পরমাণু গঠন প্রক্রিয়া। মহাবিশ্ব সৃষ্টিতত্ত্বে রি-কম্বিনেশন শব্দ দ্বারা কখনো কখনো ৩০০০° K-এর কাছাকাছি তাপমাত্রায় হিলিয়াম এবং হাইড্রোজেন পরমাণুর সুনির্দিষ্ট গঠন প্রক্রিয়াকে বুঝানো হয়।

লালসরণ (RED SHIFT) : ডপলার প্রক্রিয়ার ফলে নক্ষত্র বা অন্য কোন আলোর উৎস আমাদের কাছ থেকে যদি দূরে সরে যেতে থাকে, তবে তার বর্ণালীর রেখা দীর্ঘতর তরঙ্গদৈর্ঘ্যের দিকে সরে যায়। মহাবিশ্ব সৃষ্টিতত্ত্বে লালসরণ দ্বারা জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ক দূরবর্তী বস্তুসমূহের বর্ণালী রেখার দীর্ঘতর তরঙ্গদৈর্ঘ্যের দিকে যে সরণ পর্যবেক্ষণ করা হয় তাকে বুঝায়। তরঙ্গদৈর্ঘ্যের বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ভগ্নাংশ দ্বারা একে প্রকাশ করা হয় এবং এর প্রতীক হলো 'z'।

স্থিরশক্তি (REST ENERGY) : যে কোন বিনাশী প্রক্রিয়ায় একটি কণিকার ভরের সবটুকু শক্তি যদি মুক্ত হয়, তবে ঐ শক্তিকে কণিকার স্থির শক্তি বলে। আইনস্টাইনের সূত্র অনুযায়ী স্থির শক্তি, $E=mc^2$।

রো মেসন (RHO MESON) : খুবই অস্থায়ী অনেক হ্যাড্রন কণিকার একটি হলো 'রো' মেসন। ভাঙ্গন প্রক্রিয়ায় রো মেসন ভেঙে দুটো পাই মেসনে পরিণত হয় এবং এর গড় আয়ু ৪.৪ X $১০^{-২৩}$ সেকেন্ড।

আপেক্ষিকতার বিশেষ তত্ত্ব (SPECIAL RELATIVITY) : স্থানকাল সম্পর্কে আলবার্ট আইনস্টাইন কর্তৃক ১৯০৫ সালে উপস্থাপিত নতুন তত্ত্ব। নিউটোনিয়ান বলবিদ্যায় একসেট গাণিতিক রূপান্তর রয়েছে যা বিভিন্ন পর্যবেক্ষক কর্তৃক ব্যবহৃত স্থান কাল স্থানাংকের মধ্যে এমনভাবে সম্পর্ক স্থাপন করে যে, প্রকৃতির বিধিগুলো সকল পর্যবেক্ষকের জন্যই সমান বলে প্রতিভাত হয়। তবে আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতার বিশেষ তত্ত্বে স্থানকাল রূপান্তরের এই অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য রয়েছে যে পর্যবেক্ষকের গতি যাই হোক না কেন আলোর গতি ধ্রুব অর্থাৎ অপরিবর্তিত থাকে। যে কোন একটি তন্ত্রে বস্তু বা কণিকার গতি যদি আলোর গতির কাছাকাছি হয়, তাহলে তাকে 'রিলেটিভিষ্টিক' গণ্য করে নিউটনীয় বলবিদ্যা তত্ত্বের আলোকে ব্যাখ্যা না করে অবশ্যই আপেক্ষিকতার বিশেষ তত্ত্বের আলোকে ব্যাখ্যা করতে হবে।

আলোর গতি (SPEED OF LIGHT) : আপেক্ষিকতার বিশেষ তত্ত্বের একটি মৌলিক ধ্রুবক। এর মান হলো প্রতি সেকেন্ডে ২,৯৯,৭২৯ কিলোমিটার, ভরহীন যে কোন কণিকা আলোর গতিতে ভ্রমণ করে। বস্তু কণিকার শক্তি যখন স্থির শক্তি mc^2 -এর ভরের মধ্যে নিহিত শক্তির তুলনায় অত্যন্ত বেশি, তখন বস্তু কণিকার গতি আলোর গতির কাছাকাছি পৌঁছে।

স্পিন (SPIN) : মৌলিক কণিকার একটি ভিত্তিগত ধর্ম, যা কণিকার ঘূর্ণনের অবস্থা বর্ণনা করে। কোয়ান্টাম বলবিদ্যার সূত্র অনুযায়ী একটি কণিকার স্পিনের শুধু কয়েকটি বিশেষ মান থাকতে পারে এবং এই মান একটি পূর্ণ সংখ্যা বা একটি পূর্ণ সংখ্যার অর্ধেক ও প্লাংক ধ্রুবকের গুণফল।

স্থিতাবস্থার তত্ত্ব (STEADY STATE THEORY) : বন্ডি, গোল্ড ও হয়েল কর্তৃক

উদ্ভাবিত মহাবিশ্ব সৃষ্টিতত্ত্ব বিষয়ক তত্ত্ব। এই তত্ত্ব অনুযায়ী সময়ের সঙ্গে মহাবিশ্বের গড় ঘনত্বের কোন পরিবর্তন ঘটে না। মহাবিশ্বের প্রসারণ ঘটতে থাকার প্রেক্ষিতে অবিরাম নতুন বস্তু সৃষ্টি হতে থাকে, যাতে মহাবিশ্বের ঘনত্ব ধ্রুব বা অপরিবর্তিত থাকে।

স্টিফেন বোলত্জম্যান সূত্র (STEFAN BOLTZMANN LAW) : এই সূত্র কৃষ্ণকায় বিকিরণে শক্তি ঘনত্বের সঙ্গে তাপমাত্রার চতুর্থ ঘাত আনুপাতিকতার সম্পর্ক ব্যাখ্যা করে।

প্রবল মিথষ্ক্রিয়ায় (STRONG INTERACTIONS) : মৌলিক কণিকার মিথষ্ক্রিয়ার যে চারটি সাধারণ শ্রেণী রয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী। এই মিথষ্ক্রিয় বলই পরমাণুর নিউক্লিয়াসে প্রোটন ও নিউট্রনকে একত্রে বেঁধে রাখে। কেবল হ্যাড্রন শ্রেণীর কণিকার মধ্যে এই মিথষ্ক্রিয় বল ক্রিয়াশীল, লেপটন বা প্রোটনের ক্ষেত্রে নয়।

সুপারনোভা (SUPERNOVAS) : প্রবল নাক্ষত্রিক বিস্ফোরণ, যার ফলে একটি নক্ষত্রের ভিতরের কেন্দ্রীয় অংশ ছাড়া অবশিষ্ট সকল অংশ মহাশূন্যে প্রবল বেগে নিষ্ক্রান্ত হয়। একটি সুপারনোভা থেকে মাত্র কয়েক দিনে যে পরিমাণ শক্তি নির্গত হয়, আমাদের সূর্য থেকে ঐ পরিমাণ শক্তি নির্গত হতে এক হাজার মিলিয়ন বছর সময় লাগে। কেপলার (এবং কোরিয়ান ও চীনা জ্যোতির্বিদগণ) ১৬০৪ সালে আমাদের গ্যালাক্সীর অফিউসাস নক্ষত্রমন্ডলীতে সর্বশেষ সুপারনোভার বিস্ফোরণ পর্যবেক্ষণ করেন। তবে 'Cas A' থেকে আগত বেতার উৎসকে আরো সাম্প্রতিক সুপারনোভার বিস্ফোরণ বলে মনে করা হয়।

তাপীয় স্থিতাবস্থা (THERMAL EQUILIBRIUM) : তাপীয় স্থিতাবস্থা বলতে এমন একটি অবস্থা বুঝায় যে অবস্থায় নানা প্রদত্ত পাল্লার দ্রুতি, স্পিন ইত্যাদি সম্পন্ন যতগুলো কণিকা একটি ব্যবস্থায় যে হারে প্রবেশ করে ঠিক সেই হারে ঐ ব্যবস্থা থেকে ততগুলো কণিকা বের হয়ে যায়। পর্যাপ্ত ও দীর্ঘ সময়ের জন্য যদি এই ব্যবস্থাটিকে বিঘ্নিত না করা হলে যে কোন ভৌত ব্যবস্থা শেষ পর্যন্ত একটি তাপীয় স্থিতাবস্থায় উপনীত হয়।

সূচন তাপমাত্রা (THRESHOLD TEMPERATURE): সূচন তাপমাত্রা হলো এমন একটি তাপমাত্রা যে তাপমাত্রার উপরে কৃষ্ণকায়া বিকিরণ (বা তাপীয় বিকিরণ) থেকে একটি নির্দিষ্ট শ্রেণীর কণিকা বিপুল পরিমাণে মুক্তভাবে সৃষ্টি হতে পারে। কণিকার ভর ও আলোক বেগের বর্গ এই দুটোর গুণফলকে বোলত্জম্যান ধ্রুবক দ্বারা ভাগ করে সূচন তাপমাত্রার মান পাওয়া যায়।

ট্রিটিয়াম (TRITIUM) : হাইড্রোজেনের অস্থায়ী ভারী আইসোটোপ, প্রতীক H^3। ট্রিটিয়ামের নিউক্লিয়াসে একটি প্রোটন ও দুটো নিউট্রন থাকে।

প্রতিনিধিত্বমূলক গ্যালাক্সী (TYPICAL GALAXIES): প্রতিনিধিত্বমূলক গ্যালাক্সী বলতে এখানে সেসব গ্যালাক্সীকে বুঝানো হয়, যেগুলোর কোন স্বতন্ত্র গতি নেই এবং সে কারণে তারা মহাবিশ্বের প্রসারণের ফলে সৃষ্ট বস্তুর সাধারণ প্রবাহের গতিতে চলতে থাকে।

অতিবেগুনী বিকিরণ (ULTRAVIOLET RADIATION) : যে সব তড়িৎ চুম্বক তরঙ্গের তরঙ্গদৈর্ঘ্য $১০^{-৭}$ সে.মি. থেকে ২ X $১০^{-৫}$ সে.মি. পাল্লার মধ্যে সেগুলোকে অতিবেগুনী বিকিরণ বলা হয়। দৃশ্যমান আলো এবং এক্সরের মধ্যে এর অবস্থান।

ভার্গো স্তবক (VIRGO CLUSTER): ভার্গো মন্ডলে রয়েছে এক হাজারের বেশি গ্যালাক্সীর এক বিরাট স্তবক বা সমাবেশ। এই স্তবক আমাদের কাছ থেকে প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ১০০০ কি.মি. বেগে দূরে সরে যায় এবং মনে করা হয় যে এর অবস্থান ৬ কোটি আলোকবর্ষ দূরে।

তরঙ্গদৈর্ঘ্য (WAVE LENGTH) : যে কোন প্রকার তরঙ্গের ক্ষেত্রে দুটো তরঙ্গ শীর্ষ বা চুড়ার মধ্যবর্তী দূরত্ব। তড়িৎ চুম্বক তরঙ্গের ক্ষেত্রে তরঙ্গদৈর্ঘ্যকে এভাবে সজ্ঞায়িত করা যায় যে, বৈদ্যুতিক অথবা চুম্বক ক্ষেত্রের ভেকটরের অংশ যে দুটো বিন্দুতে সর্বোচ্চ মানে পৌঁছে, সেই দুটো বিন্দুর মধ্যকার দূরত্বই তরঙ্গদৈর্ঘ্য।

দুর্বল মিথস্ক্রিয়া (WEAK INTERACTIONS) : মৌলিক কণিকার প্রবল মিথস্ক্রিয়ায় যে চারটি সাধারণ শ্রেণী রয়েছে তার একটি হলো দুর্বল মিথস্ক্রিয়া। সাধারণ শক্তিতে তড়িৎ-চুম্বক বা প্রবল নিউক্লীয় বলের তুলনায় দুর্বল নিউক্লীয় বল খুবই মৃদু, তবে মহাকর্ষ বলের তুলনায় অনেক বেশি শক্তিশালী। দুর্বল মিথস্ক্রিয়ার ফলে নিউট্রন ও মিউয়ন কণিকার তুলনামূলক ধীর গতিতে ভাঙ্গন ঘটে থাকে। নিউট্রিনো কণিকাকে ঘিরে যত বিক্রিয়া ঘটে, তার কারণও দুর্বল মিথস্ক্রিয়া। এখন এটা ব্যাপকভাবে বিশ্বাস করা হয় যে সম্ভবত এখন দুর্বল নিউক্লীয়, প্রবল নিউক্লীয় ও তড়িৎ-চুম্বক বলকে একটি সহজ ও একীভূত গেজ ক্ষেত্র তত্ত্বের ভিত্তিতে বিভিন্ন রূপ হিসেবে ব্যাখা করা সম্ভব।

CONVERTED TO PDF

BY

--- RoNy

E-mail: tanvir_ahmad_rony@yahoo.com

(c) **Tanvir Ahmad rony**

Mechanical Engineering , Batch -2004

KUET